নরদেব
শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্ম্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য

NARODEB
SHIBCHANDRA DEB O TATSAHADHARMINIR ADARSHA JIBANALEKHYA

A biography of Shibchandra Deb (1811-1890 AD)
and his wife
written by Abinashchandra Ghosh

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৮
আকাদেমি সংস্করণ :
২০ জুলাই ২০১০, ৩ শ্রাবণ ১৪১৭

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

মুদ্রক
লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

নিবেদন

উনিশ শতকের অন্যতম কৃতী বাঙালি শিবচন্দ্র দেব-এর জীবনীগ্রন্থের আকাদেমি সংস্করণ তাঁর দ্বি-শততম জন্মদিবসেই প্রকাশিত হল। নিশ্চয়ই মুহূর্তটি ঐতিহাসিকরূপে গণ্য হবার যোগ্য। যাঁর জীবনী প্রকাশিত হল সেই শিবচন্দ্র দেব এবং জীবনীকার *বেঙ্গলি* পত্রিকার প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (১৮৫৩-১৯২৮) উভয়েই উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থটি স্বতন্ত্র মর্যাদা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করে।

হিন্দু কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র, অন্যতম উজ্জ্বল 'ডিরোজিয়ান' শিবচন্দ্র দেব কৃতিত্বের সঙ্গে সরকারি চাকুরিতে উচ্চপদে আসীন থেকেছেন, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন এবং স্ব-জনপদে শিক্ষা, নগরোন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উদ্যমী ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত যেমন উনিশ শতকের বাঙালির সমাজেতিহাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তেমনই তাঁকে বাদ দিয়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী এক বর্ধিষ্ণু জনপদের স্থানিক ইতিহাস প্রকটভাবে অপূর্ণ হয়ে থাকবে। কোন্নগরবাসীগণ আসলে তাঁদের জনপদ ও মানবকৌমেরই এক উজ্জ্বল আত্মপরিচয় খুঁজে পাবেন এই জীবনালেখ্যতে।

বর্তমান জীবনীগ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে শিবচন্দ্র দেবের ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি আত্মচরিত। এই আত্মচরিতখানি তাঁর পুত্র সত্যপ্রিয়কে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছিল। বস্তুত শিবচন্দ্র-দৌহিত্র অবিনাশচন্দ্র লিখিত মূল জীবনীগ্রন্থের বাংলাভাষার তুলনায় শিবচন্দ্র-লিখিত ইংরেজি ভাষার গদ্যকে চলনের দিক থেকে অনেক আধুনিক বলে প্রতীত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকাভাগেই, যা সত্যপ্রিয়কে সম্বোধন করেই লিখিত, শিবচন্দ্র লিখছেন যে পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং লক্ষ্যে অবিচলতা ছাড়া তিনি অন্য কোনো গুণের অধিকারী নন। এই ঘোষণের মধ্যে নিশ্চয়ই বিনয়ের স্বর আছে, তথাপি উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের কৃতী মানুষদের চরিত্রে এই অবিশ্রাম উদ্যমের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এই জীবনীগ্রন্থের সঙ্গে একালের বাঙালি পাঠক সর্বাংশে মানসিক ভাবে বিজড়িত হবেন, এমনটা হয়তো আশা করা যায় না। তবে বাংলার নবজাগরণের

প্রভাতপাখিদের অন্যতম শিবচন্দ্র দেবের এই জীবনীগ্রন্থ একালের পাঠকের প্রাপ্তি কিছু কম হবে না। রেনেশাঁসের আলো যে কলকাতার সীমানার বাইরেও অকাতরে বিচ্ছুরিত হয়েছিল তার সাক্ষ্য শিবচন্দ্রের নগরোন্নয়ন, শিক্ষাপ্রসার, বিশেষত নারীশিক্ষা প্রসার, সমাজসংস্কার সংক্রান্ত নিরন্তর কর্মকাণ্ড ও এই জীবনীগ্রন্থ।

আমরা পূর্বেই বলেছি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের বিচারে এবং বাংলা সাহিত্যে জীবনীরচনার ধারার প্রেক্ষিতে এই গ্রন্থের গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই গ্রন্থ থেকে শুধু শিবচন্দ্রের নয়, তাঁর সহধর্মিণীর জীবনকথাও জানতে পারবেন একালের পাঠক। এক সমাজপ্রাণ মানুষের জীবনে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা যেমন তাঁর আধুনিকতার অন্যতম অভিজ্ঞান, তেমনই শিবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর জীবনকথার সহাবস্থান জীবনীকারেরও মানস-অবস্থানের প্রগতিশীলতা পরিস্ফুট করে। অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা এই গ্রন্থ (যা দুটি ভাষায় একটি জীবনী ও আত্মজীবনীর সমন্বয়)-কে অবলম্বন করে শিবচন্দ্র দেবের একটি আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক জীবনী রচনার উপাদান পেয়ে যাবেন। সেই প্রয়াস ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হলে এই গ্রন্থের প্রকাশ অধিকতর সার্থকতা পাবে।

মূল গ্রন্থে সবকটি শিরোনামে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এই সংস্করণে সেই রীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে প্রথম প্রকাশকালের বানান যথাযথ রাখা হয়েছে, তবে মুদ্রণপ্রমাদগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে। এই সংস্করণ ছাপার ক্ষেত্রে অবশ্য আকাদেমির লিপিছাঁদ ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রকাশে কোন্নগরের নাগরিক সমাজের আগ্রহ আমাদের উৎসাহিত করেছে। মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন ও নানাবিধ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অন্যতম সদস্য অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহে সহায়তা করেছেন আকাদেমির আর এক সদস্য বিশিষ্ট সাহিত্যসমালোচক অলোক রায়। গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে ভূমিকা লিখেছেন গঙ্গার পশ্চিমকূলের আর এক কৃতী মানুষ অধ্যাপক সুদর্শন রায়চৌধুরী। তাঁর নানাবিধ ব্যস্ততা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যে ভূমিকাটুকু লিখে দিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

ভূমিকা

> আমরা সকলেই যে মহাজ্ঞানী হইব তাহা কদাচ আশা করা যাইতে পারে না, কিন্তু আমরা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিব ইহা অবশ্যই প্রত্যাশা করা যায়। অতএব তাহার প্রধান লক্ষণ এই যে 'অল্প আশা কর এবং তদপেক্ষা অল্প লাভে পরিতুষ্ট হও'।

পাঠক, 'তদপেক্ষা অল্প' শব্দদুটি স্মরণে রাখবেন।
আবার,

> You will perceive that, without possessing any talent, how I have got on in the world. My regular and diligent habits, my patience and perseverance, my honesty and integrity of purpose, are under God's providence the causes of my success.

প্রথম উদ্ধৃতিটি শিবচন্দ্র দেবের ১৮৬২ সালে লেখা *শিশুপালন*-দ্বিতীয়ভাগ থেকে নেওয়া। এই বইয়ে ছিল শিশুপালনের আদর্শ সম্পর্কে নিবন্ধমালা। আর দ্বিতীয় ইংরাজি উদ্বৃতিটি নেওয়া হয়েছে ১৮৮৯ সালে পুত্র সত্যপ্রিয় দেবকে লেখা শিবচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি থেকে। এই চিঠি শিবচন্দ্রের ইংরাজিতে লেখা অতিসংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী-র উপস্থাপনাগোছের। প্রথমটি লেখা শিবচন্দ্র যখন প্রৌঢ়। আর দ্বিতীয়টি বার্ধক্যে। স্পষ্টতই এই দুইয়ের ভেতর থেকে শিবচন্দ্রের জীবনদর্শন এবং অনেকটা যেন তারই ভিত্তিতে রচিত আত্মমূল্যায়ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অল্প আশা করতে হবে, কিন্তু তদপেক্ষা অল্প লাভে তৃপ্ত হতে হবে—এই জীবনবোধের থেকে 'অল্পে সুখ নেই, ভূমায় সুখ' ধারণাটি কত আলোকবর্ষ দূরে? এই জীবনবোধের মানুষ যিনি, তাঁরই সাজে নিজের পুত্রের কাছে তুলে ধরা জীবনসায়াহ্নের এই পরিতৃপ্ত আত্মমূল্যায়ন—আমি talent নিয়ে আসিনি। কিন্তু নিয়মিত এবং পরিশ্রমী অভ্যাস, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়, সততা আর লক্ষ্যের অটলতা—এই আমার সাফল্যের উৎস। আর এসবেরও ওপরে ছিল ঈশ্বরের বিধান। এই আত্মমূল্যায়নের মধ্যে কোথাও 'দীনতার অভিমান' বা 'বিনীত গর্ব-'এর মতো বিরোধালংকার নেই। যা আছে, তারই ভিত্তিতে নারায়ণ চৌধুরী বলেছিলেন,

> সংসারে তিন শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন। কেউ জ্ঞানকে অবলম্বন করে তাঁর জীবনের ধারাকে বিকশিত করে তোলেন, কেউ ভক্তির পথ আশ্রয় করে ভক্তিতেই চিত্ত সমর্পিত করবার চেষ্টা করেন, কেউ বা একান্তরূপে কর্মকেই অবলম্বনপূর্বক কর্মের

> মধ্যে জীবনের সার্থকতা খোঁজেন।...মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব ছিলেন এই ত্রিবিধ মানুষের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর বীর। তিনি ছিলেন কর্মবীর ও কর্মযোগী। কর্মের সাধনাতেই তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং তারই চরিতার্থতা বিধানে তিনি তাঁর জীবনপাত করেছিলেন।

তবে কি শিবচন্দ্র ছিলেন, অশোক মিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিসরে সম্পূর্ণ ভিন্নতর বৃত্তের এক চরিত্রের সম্পর্কে যেমন বলেছিলেন, 'সাধারণের মধ্যে অসাধারণ'? সম্ভবত নয়। নইলে শিবচন্দ্রকে 'মহাত্মা' বলা হবে কেন? কেন জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র বলবেন 'নরদেব'? শিবচন্দ্র দেব ছিলেন আসলে অসাধারণের মধ্যে সাধারণ। নইলে পূর্বোল্লিখিত আত্মজীবনীতে এমন সব তথ্য কেউ দেন? শিবচন্দ্র জানাচ্ছেন, ঋতু-নির্বিশেষে ভোর ৫টায় উঠি....৬১/২ টা-৭টায় এক পোয়া দুধ খাই একটা অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে...১০টায় গায়ে উষ্ণ আর মাথার ঠান্ডা জল দিয়ে বুরুশে গা ঘষে চান করি...ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই নিতান্ত সাদামাটা রোজতামামির একটু আগেই হালকা লেখা দু-চার বাক্যে অসাধারণত্বের আভাস মেলে।

> আমার ধর্মবিশ্বাস এবং বিশেষত ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে আমার ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর কোন্নগরের গোঁড়া হিন্দুরা আমাকে সমাজচ্যুত করেছিলেন। আর শুধু তাই নয়। সুযোগ পেলেই আমাকে অপমান ও নির্যাতন করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু আমি এ সব ব্যাপারে একেবারেই দুঃখিত নই। আমি এমন আন্দাজ করেছিলাম এবং এর জন্য তৈরিও ছিলাম। ঈশ্বর যেন ওদের আলো দেন যাতে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে আর আচরণ শুধরে নেয়।

এসব ঘটছে কোন্ আমলে? খাপ পঞ্চায়েতের মধ্যযুগীয় তাণ্ডবের সামনে আজ কত মান্যগণ্যের দোলাচল ও আত্মসমর্পণের সময়কাল থেকে দেড়শো-দুশো বছর আগে। এবং এসব ঘটেছে কোথায়? সেই কোন্নগরে—যে আধুনিক কোন্নগরের স্রষ্টা ছিলেন শিবচন্দ্র স্বয়ং। এই মানুষটি অসাধারণ নন? তাঁর 'মহাত্মা' অভিধান নিতান্ত এক আলংকারিক অতিভাষ?

কিন্তু আত্মজীবনীর এই দুটি সামান্য অংশ থেকে আরেকটি বিষয়ও ফুটে ওঠে—শিবচন্দ্র দেবের মানবতাবাদের দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল—এক, তাঁর শৃঙ্খলাবোধ এবং দুই, যুক্তিনির্ভরতা। অবিনাশচন্দ্রের এই জীবনীগ্রন্থে শিবচন্দ্রের তিনটি জীবন-অধ্যায় চিহ্নিত করা আছে—পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মজীবন। এই তিন অধ্যায়ের কোথাও শিবচন্দ্র বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেননি, আবেগের বুদ্‌বুদ্‌কে মূল্য না দিয়ে যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ হিসেবে এক ধরনের দায়িত্ববোধই যেন তাঁকে মানবতাবাদে দীক্ষিত করেছে।

এই মানবতাবাদী দায়িত্ববোধ তাঁকে আপন জন্মভূমি হুগলি জেলার তদানীন্তন

এক গণ্ডগ্রাম কোন্নগরকে আধুনিক করে তুলতে প্রণোদিত করেছে। কোন্ অর্থে আধুনিক? সর্বার্থে। শিক্ষার সুযোগ, বুনিয়াদি স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবার সুযোগ, যোগাযোগের সুযোগ—আজকের পরিভাষায় এই তিন মানব-উন্নয়ন সূচকের অগ্রগতির জন্য শিবচন্দ্র উদ্যোগী হয়েছিলেন—এই ছিল তাঁর আধুনিকায়নের ধারণা। অবিনাশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখেছেন 'স্বগ্রামের শ্রীবৃদ্ধিসাধন'-এ শিবচন্দ্রের প্রয়াসের কথা। কখনও হিতৈষিণী সভা-র মাধ্যমে কখনও পৌরসভার মাধ্যমে, কিন্তু মুখ্যত একেবারেই একক ভাবে রাস্তাঘাট, নিকাশি, সাঁকো তৈরি, ন্যূনতম আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান নাগরিক পরিষেবা জোগানের ব্যবস্থা করেছেন। বাংলা ও ইংরাজি বিদ্যালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার, অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসালয়, ডাকঘর, রেলস্টেশন স্থাপন—এত বিচিত্র কাজে হাত দিয়েছেন এবং নানান প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও সফল হয়েছেন। আর এক-আধটি সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে নাছোড় ধৈর্যের সাক্ষ্য রেখে সব ক্ষেত্রেই তিনি পথিকৃৎ। তিনিই স্রষ্টা। এমনকি মাদক দ্রব্যের প্রসাররোধেও তাঁর ভূমিকা ছিল। তখনও আসেনি পিকেটিংয়ের কাল।

কিন্তু এই সামূহিক জনহিতৈষিতার কর্মযজ্ঞে শিবচন্দ্রের একটি কাজ তাঁকে চিরপ্রণম্য করে রেখেছে। তা হল নারীশিক্ষার প্রসার। নারীশিক্ষার পথ সেকালে কেমন বিঘ্নসংকুল ছিল অবিনাশচন্দ্র তা রীতিমতো ব্যাখ্যা করেছেন। আজও তা বিঘ্নসংকুল নয়, এমন দাবি করা যাবে না। কিন্তু আরও অনেক বুনিয়াদি বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষাও যে নারীর প্রাপ্য একটি বিশেষ স্বত্বাধিকার সেই বোধটি না থাকার পেছনে অবিনাশচন্দ্র যে কারণ দর্শিয়েছেন তা থেকেই শিবচন্দ্রের তখনকার উদ্যোগের মহত্ত্ব বোঝা যায়। অবিনাশচন্দ্র লিখছেন, সে সময়ে

> ...এই রূপ ধারণা ছিল যে, লেখাপড়ার চর্চ্চা সীমন্তিনীদের সীমার বাহিরের ব্যাপার ; সিঁতার সিন্দুর বা হাতের খাড়ু বজায় রাখিতে হইলে, বিদ্যাশিক্ষার ত্রিসীমানায় পদার্পণ চিন্তা স্বপ্নে ও কল্পনাতেও নিষিদ্ধ কার্য্য। লোকের এই বিশ্বাস ছিল যে, যে কেহ এই নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম করিবে, অচিরে তাহার বৈধব্যদশা সংঘটিত হইবে।

এমন ক্ষেত্রে শিবচন্দ্র নিজের বালিকাবধূকেই শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিলেন। নিজের মেয়েদেরও সযত্নে শিক্ষার বন্দোবস্ত করালেন। কলকাতায় বেথুন সাহেবের মেয়েদের স্কুল তৈরি হলে নানান প্রতিকূলতা পেরিয়ে নিজের এক মেয়েকে সেখানে ভর্তি করালেন। আর সর্বোপরি ইংরাজ সরকারকে অনুরোধ উপরোধ করেও যখন সাড়া পেলেন না, তখন ১৮৬০ সালে নিজের বাড়িতেই গড়ে তুললেন বালিকা বিদ্যালয়। কোন্নগরে আজ সেই বিদ্যালয় দেড়শো বছর অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মিটারের মধ্যে শিবচন্দ্র স্থাপিত ছেলেদের স্কুল এবং সাধারণ গ্রন্থাগার। হুগলি নদীর তীরে কোন্নগরের আধুনিকতার মিনার।

কিন্তু এই দায়িত্ববোধে শিবচন্দ্র উজ্জীবিত হলেন কী করে? এই দায়িত্ববোধ এসেছিল তাঁর হিন্দু কলেজে সাড়ে ছয় বছরের মতো শিক্ষাকালে। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ শিক্ষক স্বয়ং ডিরোজিও। শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ কৃতবিদ্য মানুষ। এঁদের প্রত্যেকেই নব্যবঙ্গ গড়ে তোলার অগ্রপথিক। কিন্তু দিলীপকুমার বিশ্বাস লিখছেন,

> মৃদুস্বভাব, বিনয়ী, মিষ্টপ্রকৃতি অথচ দৃঢ়চরিত্র শিবচন্দ্র দেব ডিরোজিওর অতিপ্রিয় এবং সম্ভবত সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং 'নীতির উৎপত্তি' শীর্ষক তাঁর রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের জন্য ডিরোজিও তাঁকে স্বয়ং বিশেষ পুরস্কার দিয়েছিলেন (১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৯)।

হিন্দু কলেজের শিক্ষা শিবচন্দ্রকে নারীশিক্ষার মহৎ কাজে দীক্ষিত করেছিল। তেমনই আবার প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল বদ্ধ হিন্দুসমাজ থেকে মুক্তির পথেও নিয়ে গিয়েছিল এই শিক্ষা। হুল্লোড়পন্থী নব্যবঙ্গীয়দের মতো 'আমরা গরু খাই গো' বলে শহরের রাজপথে চিৎকারের বদলে শিবচন্দ্র প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য উভয় অনাচারের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছিলেন এবং ডিরোজিওর প্রদর্শিত পথে অদম্য মুক্তমতি অনুসন্ধিৎসায় যা সত্য বলে জেনেছেন তার প্রতিষ্ঠায় অবিচল থেকেছিলেন।

এই অবিচলতার সাক্ষ্য মেলে শিবচন্দ্রের জীবনে বহু ক্ষেত্রে, বিশেষত তাঁর ব্রাহ্মসমাজপর্বে। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন এই তিনজনের সঙ্গেই শিবচন্দ্রের পরিচয় ছিল। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তো রীতিমতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আবার শিবচন্দ্রই সেই প্রধানতম পুরুষ যিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং তারপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই তিন পর্বেই শামিল ছিলেন। শিবচন্দ্র লিখেছেন, ডিরোজিওর কাছে তাঁর পাঠ এবং আলোচনার পরিণতিতে হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাস চলে গিয়ে তিনি একেশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিচালিত আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মগ্রহণের বিষয়টি তাঁর আদপেই আকস্মিক কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার মাধ্যমে একেশ্বরবাদের প্রতি তাঁর অনুরক্তি ক্রমশ পরিণত হয় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আনুগত্যে। বস্তুত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের আগেই শিবচন্দ্র মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে কোন্নগরে স্থাপিত হয় ব্রাহ্মসমাজ। সেই সমাজভবন আজও বর্তমান।

কিন্তু এই আদি ব্রাহ্মসমাজ তিনি একসময় ত্যাগ করেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। এ যে কেশবচন্দ্রের তারুণ্য বা বাগ্মিতার প্রতি আকর্ষণে তা নয়। এই বর্জন-গ্রহণ ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে

নৈতিক অবস্থান গ্রহণের তাগিদে। আবার শিবচন্দ্রের চরিত্রের চমৎকারিত্ব এইখানে যে, অবিনাশচন্দ্র লিখছেন, "মহর্ষির প্রতি তাঁহার চিরদিন প্রগাঢ়তম ভক্তি ছিল ; এজন্য কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন...।" মতান্তরকে কখনই তিনি মনান্তরে ঠেলে দেননি।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও শেষ পর্যন্ত ছিন্ন হয়। সেই ছেদের কারণগুলি অবিনাশচন্দ্র তথ্য দিয়ে বিশদ বিবৃত করেছেন। সেখানে স্পষ্ট যে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে দৃঢ় সত্যনিষ্ঠ অবস্থানই শিবচন্দ্রকে কেশবচন্দ্রের বিরোধী করে তুলেছিল। সর্বোপরি ডিরোজিওর কাছ থেকে যে মুক্তমতির দীক্ষা, তা-ই 'পূর্ণ গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে' নতুন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে উদ্‌বুদ্ধ করে। এই সময়পর্বকে ঘিরে শিবচন্দ্রের বিবিধ পত্রাবলির বেশ কিছু অবিনাশচন্দ্র উদ্‌বৃত করেছেন। সেখানে শিবচন্দ্রের তীক্ষ্ণ নিরাবেগ যুক্তিবোধ এবং আদর্শনিষ্ঠার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এ-ও সত্য যে ব্রাহ্মসমাজের উত্থান-বিকাশ-বিবর্তনের তিনটি ঐতিহাসিক পর্বেই শিবচন্দ্রের সাবলীল সঞ্চরণ তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যকে কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী যেমন লিখেছেন, "সত্য সত্যই ডিরোজিও-বৃক্ষের এই ফলটি অতি মধুর হইয়াছিল।"

শুধু ব্রাহ্মসমাজেই নয়, শিবচন্দ্রের সংস্কারমুক্ত সত্যান্বেষী চারিত্র্যের ছাপ রয়েছে তাঁর জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শিবচন্দ্র দেবের যোগাযোগ ছিল। বিদ্যাসাগর "যখন এ দেশে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত করার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন তাঁহার বন্ধু শিবচন্দ্রের নিকট এ বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" আবার "স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যখন ১৮৭০ সালে, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (Indian Association for the Cultivation of Science) স্থাপনের সংকল্প প্রথম প্রচার করেন, তখন হইতেই শিবচন্দ্র ঐ মহদানুষ্ঠানের একজন আন্তরিক সমর্থক হইয়াছিলেন।" কলকাতা শহর থেকে সে আমলের যোগাযোগ ব্যবস্থার পটভূমিতে বেশ দূরে অবস্থিত কোন্নগরে বাসকালেই শিবচন্দ্রের এই আধুনিক মনন। তাঁর বিত্ত বা প্রতিপত্তি অতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে কলকাতার পাকাপাকি অধিবাসী করে অনুকূল নাগরিক পরিবেশে জীবনযাপন করাতে পারত। শিবচন্দ্রের তা প্রয়োজন হয়নি। বরং কোন্নগরকেই তিনি আধুনিক করে তুলেছেন। মহত্ত্বের এই সহজিয়া সাধন শিবচন্দ্রকে সাধারণ বৃত্তে থাকতে শিখিয়েছিল। কিন্তু সাধারণের মধ্যেই অসাধারণ।

শিবচন্দ্র দেবের জন্মদ্বিশতবর্ষে তাই এই মহান পুরুষের জীবনালেখ্যের প্রকাশনা আমাদের কর্তব্য ছিল। এর রচয়িতা অবিনাশচন্দ্র ছিলেন শিবচন্দ্রের দৌহিত্র। কোন্নগরেই তাঁর জন্ম। বাল্যশিক্ষা কোন্নগর হাইস্কুলে। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সাহিত্যরচনার অন্য

নিদর্শনও অবিনাশচন্দ্রের রয়েছে। তবে তা অধুনা দুষ্প্রাপ্য। আপন প্রণম্য মাতামহের জীবনীকার হওয়ায় বিলক্ষণ ঝুঁকি থাকে। জীবনীকার এবং প্রশস্তিগায়কের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যরেখা সর্বদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। কিন্তু অবিনাশচন্দ্রের তথ্যনিষ্ঠা তাঁকে কখনই প্রগল্‌ভ প্রশস্তিকার হতে দেয়নি—এ ভারি দুর্লভ গুণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই গ্রন্থে অবিনাশচন্দ্র পরিশিষ্টসহযোগে শিবচন্দ্রের কিছু রচনাও যুক্ত করেছিলেন। এগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। তা ছাড়া শিবচন্দ্রের রচনা কিছু সহজলভ্য নয়। কোন্নগরে শিবচন্দ্র দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি তাই যথোচিতভাবেই ১৯১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত অবিনাশচন্দ্রের এই বিরল গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কমিটির পক্ষ থেকে কোন্নগরের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন অধ্যাপক রথিন চক্রবর্তী এবং অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধমাত্রেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এই প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। তবে এ ব্যাপারে আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগ স্বতন্ত্র ভাবে ধন্যবাদার্হ। সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্তও এই প্রকাশনার কাজে তৎপরতা দেখিয়েছেন। তাঁকেও ধন্যবাদ।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দিলীপকুমার বিশ্বাস শিবচন্দ্রের মধ্যে দেখেছিলেন "সর্বাঙ্গীণ মনোমুক্তিসাধনার এক সার্থক প্রয়াস"। এই প্রয়াসের পরিচিতি নতুন করে আবারও তুলে ধরুক এই প্রকাশনা। নমস্কার।

২০ জুলাই ২০১০
কোন্নগর, হুগলি

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা		১
প্রথম পরিচ্ছেদ	পূর্ব্বপুরুষ	১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	জন্ম ও বাল্যজীবন	১৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	হিন্দু-কলেজ	২১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বিবাহ ও পত্নীর শিক্ষাসম্পাদন	৪৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	রাজসেবা—প্রবাসে	৫১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	রাজসেবা—স্বদেশে	৬৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ	স্বগ্রামের শ্রীবৃদ্ধিসাধন	৭৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ	সাহিত্যচর্চ্চা ও সভাসমিতিতে যোগদান	১০৫
নবম পরিচ্ছেদ	পারিবারিক ও সামাজিক জীবন	১১৯
দশম পরিচ্ছেদ	ধর্ম্মজীবন	১৫৯
শেষ		১৯৯
Autobiography		২০৯
আত্ম-শিক্ষা		২২১
জীবনের লক্ষ্য কি?		২৩৯
থিওডোর পার্কারের ধর্ম্মবিষয়ক মত		২৪৩
মহাপুরুষ		২৪৯
পবিশিষ্ট		২৫৫

সাহায্য-স্বীকার

৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে মহাত্মা শিবচন্দ্রের জীবনী লিখিবার ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি শিবচন্দ্রের শিক্ষা-শেষের পর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত অসমাপ্ত জীবনীর কিয়দংশ এই গ্রন্থের প্রথম চারি পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবচন্দ্রের পুত্রবধূ শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবের, ও দৌহিত্রী শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষের, এবং একস্থানে পৌত্রের, লিখিত বিবরণের কোনও কোনও অংশও এই জীবনীর প্রধানতঃ নবম পরিচ্ছেদে গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, মহাত্মা শিবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় দেব মহাশয় বহুসংখ্যক আবশ্যক কাগজপত্র আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া এবং অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়া এই জীবনী-সঙ্কলনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। যাঁহারা যাঁহারা আমাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

কলিকাতা
১ জুলাই ১৯১৮ সাল।

গ্রন্থকার

উপক্রমণিকা

এই নশ্বর দেহধারী মানবকে যদি কেবল স্বোপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে চরিত্র সংগঠন ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত, তাহা হইলে এই সীমাবদ্ধ মনুষ্য-জীবনের উৎকর্ষসাধনের কোনও সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে আমরা জন্ম পরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত অভিজ্ঞতার বীজ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হই এবং বয়োবৃদ্ধিসহকারে আমাদের আত্মীয় ও অনাত্মীয় বহুসংখ্যক নরনারীর অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎ শিক্ষা-সূত্রে বা অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করি। জীবনচরিত-পাঠে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্যই জীবনী-সাহিত্যের এত আদর ও আবশ্যকতা। মানুষ নিজের সুখ-দুঃখ-বিমিশ্রিত জীবনের সহিত অন্য জীবনের তুলনা করিবার জন্য সহজেই সমুৎসুক। অন্যের দুঃখের কথা পড়িতে পড়িতে লোকে সহানুভূতিবশতঃ নিজের দুঃখ ভুলিয়া যায় এবং পরের সুখে ভাগ বসাইয়া আপনার আনন্দভাণ্ডার বাড়াইয়া লয়। পরের ভ্রম প্রমাদ বা কদাচারের বিষময় ফল দেখিয়া লোকে নিজের দোষ সংশোধনে সচেষ্ট হয়; পক্ষান্তরে, সদাচারের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দর্শনে সৎকর্ম্মের প্রতি মনের যেরূপ আস্থা ও প্রবণতা জন্মে, শত সদুপদেশ শুনিলেও সেরূপ হয় না। দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে অশেষবিধ জীবন-বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এরূপ বৈচিত্র্য কোনও ব্যক্তি বিশেষের জীবনে ঘটা অসম্ভব। কিন্তু সুরচিত চরিতাবলী পাঠ করিয়া ব্যক্তি মাত্রেই সেই বিশ্বজনীন বৈচিত্র্য কিয়ৎ পরিমাণে নিজ জীবনে আরোপ ও অনুভব করিতে পারেন; এই উপায়ে একটি সঙ্কীর্ণ জীবন-নির্ঝরিণীকে সুবিশাল মহানদীতে পরিণত করা যায়।

কিন্তু প্রায় দেখা যায়, যে সকল মহাশক্তিশালী ব্যক্তি জগতের রঙ্গভূমিতে অত্যদ্ভুত ভূমিকার অভিনয় করিয়া জন-সাধারণকে বিস্ময়-বিমোহিত করেন, লোকে তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিবার জন্যই সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। ভুবনবিজয়ী বীরের চরিত্রে শত কলঙ্ক থাকিলেও তাহা পূজিত হয়, কিন্তু আড়ম্বরশূন্য ধর্ম্মপ্রাণ সাধু জীবনের নীরব প্রবাহ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না ও উপেক্ষিত হয়। নায়াগারার

ভৈরবনিনাদী জলপ্রপাত দেখিবার জন্য শত শত পর্য্যটক ধাবমান হয়, কিন্তু যে ক্ষুদ্র কল্লোলিনী নীল নভোমণ্ডলের চিরবিচিত্র প্রতিবিম্ব তাহার নির্ম্মল বক্ষে বহন করিয়া কতিপয় গ্রামপরম্পরাকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করে, কয় জন লোকে তাহার সন্ধান লয়? যে মহাবীর নরশোণিত পাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই, সেই বীরপুঙ্গব নেপোলিয়নের কীর্ত্তিকাহিনী পড়িবার জন্য কত লোক ব্যগ্র, কিন্তু কারা-বন্ধু হাউয়ার্ডের জীবনী কয় জন পাঠ করে? রংমশালের আলোকে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায় এবং আমরা তাহার ক্ষণস্থায়ী বর্ণবৈচিত্র্য দর্শনে মুগ্ধ হই, কিন্তু যে বর্ণহীন সৌরকিরণের গুণে আমরা বিশ্ব জগৎ প্রত্যক্ষ করি তজ্জন্য কে বিস্ময় বোধ করে?

আমরা যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার সাধু-চরিত লোকবিশ্রুত নহে। দিগ্বিজয়ী বীর, অসাধারণ বাগ্মী, প্রতিভাশালী কবি, সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিৎ, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য বা লোকহিতের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—তিনি এ সকলের মধ্যে কেহ ছিলেন না। সচরাচর বড়লোক বলিলে যে খ্যাতি প্রতিপত্তি সূচিত হয়, তাহাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি যে প্রকৃত প্রস্তাবে একজন মহাপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাঁহার জীবন যেরূপ শিক্ষাপ্রদ সেরূপ শিক্ষাভূয়িষ্ঠ জীবন অতীব বিরল। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ড্য বিধানে যে সমস্ত দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিনিচয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন, ন্যস্ত ধনের ন্যায় তাহার এক কপর্দ্দকও অপব্যয় করেন নাই এবং আজীবন সেই বৃত্তিগুলির সংরক্ষণে ও পরিস্ফুটনে যত্নশীল ছিলেন।

সুধীপ্রবর হম্বোল্ট বলেন যে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে গেলে প্রত্যেক মনুষ্যের এই লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখা উচিত যে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া যেন প্রত্যেকটির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। মহাত্মা শিবচন্দ্র এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তিনি কৈশোরে এই লক্ষ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে একটি দিনের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। আমরা অনেক সাধু মহাত্মার গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়াছি, যাঁহাদের জীবনের কোনও না কোনও সময়ে পদস্খলন হইয়াছিল; কিন্তু আমরা বিস্তর বিশ্বাসযোগ্য ও অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি, যাহা উপর নির্ভর করিয়া নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে মহাত্মা শিবচন্দ্রের জীবনে কখনও ঘুণাক্ষরেও কলঙ্করেখার ছায়াপাত হয় নাই। আমরা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠা সত্যবাদিনী সহোদরার নিজমুখে শুনিয়াছি যে চিরশান্ত-প্রকৃতি শিবচন্দ্র শৈশবেও কখনও কোনও রূপ শিশুস্বভাব-সুলভ চাপল্য প্রদর্শন করেন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে কৈশোরে, যৌবনে বা পূর্ণ বয়সে বিশেষরূপে জানিতেন, তাঁহার সেই সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গ তাঁহার তত্তৎকালীন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সম্বন্ধে একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়া

গিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই এখন আর ইহলোকে নাই, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সের মধুময় ও পবিত্র চরিত্র স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। আমরা যখন সেই আশৈশব-পূতচরিত্র অশীতিবর্ষবয়স্ক স্থবিরের কথা ভাবি তখন আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল এক অপূর্ব্ব বিস্ময়-বিমিশ্রিত ভক্তিরসে আপ্লুত হয় এবং এক জন পাশ্চাত্য কবির নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি সহজেই স্মৃতিপথে উদয় হয়—

"So his life has flowed
From its mysterous urn a sacred stream,
In whose calm depth the beautiful and pure
Alone are mirror'd."

অলক্ষ্য ঝারিটি হ'তে নিরন্তর ঝরে
জীবনের পূতধারা—সে শান্তি-মুকুরে,
যাহা কিছু সুশোভন, বিশুদ্ধ, বিমল,
প্রতিবিম্ব পড়ে শুধু তাহারি কেবল।

শিবচন্দ্রের জীবন-নদী উৎপত্তি হইতে শেষ পর্য্যন্ত পবিত্রতা, শান্তি ও নৈতিক সৌন্দর্য্যের চির-নিলয় ছিল। ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় তাঁহার জীবন-যষ্টির প্রত্যেক গ্রন্থিই সরস ও মধুময় ছিল। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার দৈনন্দিন জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত যে ধর্ম্মসাধন নিতান্ত স্বভাবসিদ্ধ ও অনায়াস-সাধ্য; স্নানাহারাদি শারীরিক ক্রিয়া যেরূপ আদৌ কৃচ্ছ্র-সাধ্য নহে, ধর্ম্মজীবনও তদ্রূপ। কিন্তু আমাদের নিজের পদে পদে পদস্খলন হওয়াতে ধর্ম্ম-সাধনের দুরূহত্ব পরে হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিয়াছি।

একজন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলেন যে মনুষ্য-জীবন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। অভ্যাসের দাস ত আমরা সকলেই বটে, কিন্তু শিবচন্দ্রের ন্যায় কয় জন লোক প্রথম বয়স হইতেই সর্ব্বপ্রকার সদভ্যাসের অনুষ্ঠান করিয়া চিরজীবন তাহা পালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? চিরাভ্যস্ত কর্ত্তব্যপালনে কখনও তাঁহাকে এক নিমেষের জন্যও ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। সামরিক অশ্ব যেমন তূরীধ্বনি শুনিলেই নাচিয়া উঠে, কর্ত্তব্যের ডাক শুনিবার জন্য শিবচন্দ্রও সেইরূপ অনুক্ষণ সজাগ থাকিতেন। মনুষ্য-জীবনের দায়িত্ব তিনি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিয়াছিলেন এবং এই দায়িত্ব-বোধ তাঁহার অন্তরে নিরন্তর জাগরূক থাকিত।

যাঁহারা কোনও উচ্চ ভূধরের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে নীচে পর্ব্বতের সানুদেশে মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও ঝঞ্ঝাবাতের তুমুল সংগ্রম চলিতেছে, কিন্তু উপরে তাহার কিছুই নাই—তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ সুনীল অম্বরতলে সৌরকিরণে হাসিতেছে। নৈতিক জগতেও এইরূপ দৃশ্য কদাচিৎ দেখা যায়।

মামরা কুপ্রবৃত্তির সহিত অনবরত সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ি ও অনেক সময় ারাভূত হই, কিন্তু যে সাধক নৈতিক মালভূমিতে পদস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তনি বিনাযুদ্ধে সুনির্ম্মলা শান্তি সম্ভোগ করেন। মহাত্মা শিবচন্দ্র এই শ্রেণীর সাধক ছলেন; তাঁহাকে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় নাই; যুদ্ধের কোনও লক্ষণই তাঁহাতে দেখি নাই। তিনি কখনও গৈরিকবসনের বর্ম্ম পরিধান করেন নাই, জটাভারের শরস্ত্রাণও কখনও মস্তকে ধারণ করেন নাই। তিনি কোনও রূপ আড়ম্বর মোটেই পছন্দ করিতেন না। বসন্তের পুষ্পরাজি যেমন নিঃশব্দে ও অতর্কিতভাবে ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া ধরণীকে নানাবর্ণে রঞ্জিত করে এবং চারিদিকে মুক্তহস্তে সুস্নিগ্ধ সৌরভ বিতরণ করে, শিবচন্দ্রও সেইরূপ নীরবে ও অতি সহজে তাঁহার সকল কর্ত্তব্য সাধন করিতেন। কেহ তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিলে তিনি নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইতেন এবং নিজে কাহারও নিন্দা করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহার সমক্ষে অপরের নিন্দাবাদ করিলেও অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। নৈসর্গিক ঔদার্য্যগুণে তিনি সকলের দোষক্ষালনের চেষ্টা করিতেন। কেহ তাঁহার অপকার করিলে তাহা ভুলিয়া যাইতেন, কিন্তু সামান্য উপকারের জন্যও চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিতেন। অসার জল্পনা ও অনর্থক কল্পনা তিনি মোটেই ভাল বাসিতেন না। অনেকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের কেবল কল্পনা করিয়াই চরিতার্থ হন; যখন তাঁহারা এইরূপ অলীক স্বপ্নসুখ সম্ভোগ করেন তখন তাঁহারা মনে ভাবেন না যে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে এরূপ কল্পনা বিড়ম্বনামাত্র। শিবচন্দ্র এপ্রকার স্বপ্নবিলাসে বৃথা কালক্ষেপ করিতেন না; তাঁহার সচ্চিন্তা ও সদনুষ্ঠান পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া উন্নতির পথে অবিরাম অগ্রসর হইত। এমন অনেকে আছেন যাঁহাদের সহৃদয়তা কেবল ভাবুকতায় পর্য্যবসিত হয়, শিবচন্দ্রের গভীর সহৃদয়তা কার্য্যে প্রকাশ পাইত—ভাবোচ্ছাসে বা অশ্রুধারায় নহে। তাঁহার হৃদয়খানি কোমলতার অনন্ত ভাণ্ডার ছিল, কিন্তু ধন্য তাঁহার সংযম! আমরা কখনও তাঁহাকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। এই মর-জগতে শোকতাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া কোনও গৃহীব্যক্তির সাধ্য নহে, কিন্তু আমরা মহাত্মা শিবচন্দ্রকে অতি দুর্ব্বিষহ শোকেও বিচলিত হইতে দেখি নাই। ভগবানের মঙ্গলবিধানে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিবচন্দ্র নিদারুণ শোকের সময়েও নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির থাকিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করেন নাই। তাঁহার ন্যায় প্রকৃত সংযমী গৃহী অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি সংযম ও মিতাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সত্যবাদী ও মিতভাষী ছিলেন; অসার বাক্য প্রয়োগ করিতে তিনি আদৌ ভাল বাসিতেন না, কিন্তু বড় মিষ্টভাষী ছিলেন এবং কথা কহিবার সময় তাঁহার মৃদুস্মিতোজ্জ্বল সৌম্য মুখমণ্ডল যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি তাহা ইহ জন্মে ভুলিবেন না। তিনি আজীবন মিতাহারী ছিলেন; কিন্তু স্বল্পাহারী হইয়াও তিনি যেরূপ পরিশ্রমী ও কার্য্যক্ষম ছিলেন, তাহা ভাবিলে

অবাক হইতে হয়। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন; তাদৃশ ধনশালী না হইয়াও তিনি যে বিবিধ সৎকার্য্যে অনেক ধনাঢ্যের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার মূল কারণ এই যে, শিবচন্দ্র সদ্ব্যয়ে যেরূপ মুক্তহস্ত, অপব্যয়ের প্রতি তদ্রূপ খড়্গহস্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার সকল প্রকার আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বহস্তে লিখিতেন এবং একটি পয়সাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন না। সাত্ত্বিক দাতা শিবচন্দ্র দক্ষিণ হস্তে যাহা দান করিতেন, তাঁহার বাম হস্তকে তাহা জানিতে দিতেন না। তিনি সহজেই পরদুঃখে কাতর হইতেন, কিন্তু বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক দানের পাত্রাপাত্র নির্ব্বাচন ও মাত্রা নিরূপণ করিতেন। অর্থের সদ্ব্যবহারে তাঁহার যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, সময়ের সদ্ব্যবহারেও ঠিক তদ্রূপ। তাঁহার ন্যায় সময়ের মূল্যজ্ঞ ব্যক্তি এদেশে একান্ত দুর্লভ। দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কাজ তিনি ঘড়ি ধরিয়া নিষ্পন্ন করিতেন এবং পারতপক্ষে কোনও কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় কখনও অতিক্রম করিতেন না। এইরূপ সুবন্দোবস্তের গুণে তিনি বিবিধ দেশ-হিতকর ও সাংসারিক প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার যথেষ্ট অবসর পাইতেন।

মহাকবি সেক্ষপীয়র বলেন যে, তাল কাটিলে অতি মধুর সঙ্গীতও যেমন শ্রুতিসুখকর হয় না, জীবন-সঙ্গীতেও সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিলে ঠিক সেইরূপ ফল হয়। শিবচন্দ্রের জীবন-সঙ্গীতে কখনও তাল কাটে নাই। যে বয়সের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তিনি সেই বয়সেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে বহু বিঘ্ন-বাধা সত্ত্বেও অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিয়া তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের আদি-গৌরবকালের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ বৃত্তিভোগী ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন; এবং পঠদ্দশাতেই স্বয়ং তাঁহার মেধাবিনী ও অশেষ-গুণবতী সহধর্ম্মিণীকে অনুরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া কলেজ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই বিনা আবেদনে একটি রাজকীয় কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। এই কর্ম্মে কয়েক বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ডেপুটি কালেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন ও উড়িষ্যায় গমন করেন। সে সময়ে ডেপুটি কালেক্টারের পদ সামান্য সম্মানের ছিল না। তিনি পঁচিশ বৎসর এই সম্মানাস্পদ কর্ম্ম পরম যোগ্যতা ও অসাধারণ ন্যায়পরতার সহিত নির্ব্বাহ করেন। শিবচন্দ্র যে সকল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার আদর্শ চরিত্রের ও কার্য্যকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা বাৎসরিক মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র ডেপুটি কালেক্টারেরা অনেকেই রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে অযথা দৃষ্টি রাখিয়া জনসাধারণের বিরাগভাজন হন; কিন্তু শিবচন্দ্রের নিরপেক্ষ বিচারে ও অমায়িক আচরণে মুগ্ধ হইয়া বিচারার্থীরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিত—তিনি যাহাদের বিরুদ্ধে রায় দিতেন, তাহারও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইত না। রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শিবচন্দ্র একদিনের জন্যও জন্মভূমির

উন্নতিসাধন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু যত দিন প্রবাসে কাটাইয়াছিলেন, ততদিন উহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও রূপ সুবিধা ছিল না। চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি কলিকাতার সন্নিহিত আলিপুরে বদলি হইলেন এবং সপ্তাহান্তে এক দিন কোন্নগরে কাটাইবার সুযোগ পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার চিরপ্রিয় জন্মভূমির হিতসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং এই উদ্দেশ্যে "কোন্নগর হিতৈষিণী সভা" নাম দিয়া একটি সভা স্থাপন করিলেন। গ্রামবাসী ভদ্রমহোদয়গণের যথোচিত সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবে উক্ত সভা তিন বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিল না, কিন্তু মহাত্মা শিবচন্দ্র তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যেই একে একে কোন্নগরের প্রায় সকল অভাব মোচনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; ইংরাজি, বাঙগালা ও বালিকা বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, রেলওয়ে স্টেশন, ডাকঘর প্রভৃতি সমস্ত হিতকর অনুষ্ঠানের তিনিই মূলাধার। তত্ত্বজ্ঞানী এমার্সন বলেন যে,—প্রত্যেক অনুষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষের দীর্ঘীকৃত ছায়ামাত্র; শিবচন্দ্র সম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে খাটে। এইরূপে জীবনের মধ্যাহ্নকাল গুরুভার রাজকার্য্যে ও তৎসঙ্গে জন্মভূমির কল্যাণসাধনে অতিবাহিত করিয়া মহাত্মা শিবচন্দ্র ঐ বয়সের কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্টের অধীনে শিবচন্দ্রের ন্যায় সুদক্ষ কর্ম্মচারীর উত্তরোত্তর যথেষ্ট পদোন্নতি হইয়াছিল এবং আরও হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তিনি ভাবী উন্নতির প্রলোভন পরিহার করিয়া বাহান্ন বৎসর বয়সেই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও শেষ জীবন নিরবচ্ছিন্ন দেশ-সেবায় ও ধর্ম্ম-চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন।

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অল্প কাল পরেই শিবচন্দ্র নিজবাসগৃহে কোন্নগর-ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রথমে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত উক্ত সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, কিন্তু উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ যখন মহাত্মা কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিলেন তখন উন্নতির চিরপক্ষপাতী শিবচন্দ্রের সহানুভূতি ক্রমশঃ সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল; পরে যখন কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজার সহিত কেশবচন্দ্রের ত্রয়োদশবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার পরিণয় হিন্দুমতে সম্পন্ন হওয়ায় বহুসংখ্যক উন্নতিশীল ব্রাহ্ম ভাবী অবনতি হইতে ব্রাহ্ম-সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন, তখন সত্যনিষ্ঠ শিবচন্দ্র তাঁহাদের একজন বিশিষ্ট নেতা হইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি উক্ত সমাজের সভাপতি ছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর ঐ পদে বৃত হইয়াছিলেন; শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

আমরা দেখাইলাম যে, এই মহাত্মার জীবন-সঙ্গীতে কখনও তাল কাটে নাই। তিনি প্রথম বয়সে সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া মধ্যবয়সের সমস্ত কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং সেই কর্ত্তব্যপালনের ফলে তাঁহার শেষ জীবনও কল্যাণভূয়িষ্ঠ ও শান্তিময় হইয়াছিল। কিন্তু সচরাচর আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা কি দেখি না যে, অনেকেই প্রথম বয়স হেলায় হারাইয়া মধ্যবয়সে সেই ক্ষতি পূরণে বৃথা চেষ্টা করেন এবং পরিণামে তাঁহাদের পরিতাপই সার হয়?

একজন পাশ্চাত্য মনীষী বলেন যে, কর্ম্ম-বীজ বপন করিলে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহার নাম অভ্যাস, অভ্যাস-বীজ হইতেই চরিত্রের উৎপত্তি, এবং সমগ্র জীবনের গতি চরিত্র দ্বারা নিয়মিত হয়। কর্ম্মবীর শিবচন্দ্রের জীবন এই মহত্ত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি কিশোর বয়সেই বুঝিয়াছিলেন যে, সংসার কর্ম্মক্ষেত্র—স্বপ্নরাজ্য নহে; এই জন্য অতন্দ্রিত থাকিয়া ও আলস্য পরিহার করিয়া নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সদভ্যাসের ভিত্তিস্থাপন ও তদুপরি চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন এবং সেই দেবোপম চরিত্রবলেই জীবনের স্রোতকে অবলীলাক্রমে ঈপ্সিতপথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাস্তবিক চরিত্রই সকল উন্নতির মূল। চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, নদী যেমন কোনও গিরি-গুহা হইতে নিঃসৃত হইয়া যতই সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, ততই উহার স্রোত বর্দ্ধিত হয়, চরিত্রও সেইরূপ কাল-সহকারে উত্তরোত্তর বলসঞ্চয় করিতে থাকে। মহাত্মা শিবচন্দ্র কোনও কালেই বলিষ্ঠদেহ ছিলেন না এবং মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার কৃশশরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তখনও তিনি চরিত্রবলে বলীয়ান ছিলেন।

শিবচন্দ্র বিনয়ের অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি"—ইহা কেবল তাহার মুখের কথা নহে, তিনি ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল কর্ম্ম করিতেন বলিয়া বাস্তবিকই আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেখিতেন। তিনি খ্যাতিলাভের জন্য কোনও কর্ম্ম করেন নাই—প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সীমা ছিল না। শিশুর অমায়িক সারল্য, যুবকের জ্বলন্ত উৎসাহ ও প্রফুল্লতা এবং প্রৌঢ়ের ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য—এই সকল গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ আমরা তাঁহার চরিত্রে দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম; বস্তুতঃ তিনি জীবনের সকল ঋতুর উৎকৃষ্টতম ফলসমূহ এককালে ভোগ করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মসাধনে কঠোরতার লেশমাত্র ছিল না; নির্দ্দোষ আমোদে বা পরিহাস কৌতুকে যোগদান করিতে তিনি কখনও সঙ্কুচিত হইতেন না; তিনি নিজে যেমন সহাস্য বদন ছিলেন, চারিদিকে হাসিমুখ দেখিতে তেমনি ভালবাসিতেন। তাঁহাকে কখনও সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে দেখি নাই, কিন্তু তিনি বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; তাঁহার যত্নে কোন্নগরে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। মহাত্মা শিবচন্দ্রের

মুখে ধর্ম্মের কথা বড় একটা শোনা যাইত না; ধর্ম্ম তাঁহার প্রাণের প্রাণ হইয়া সমগ্র জীবনে ব্যাপ্ত ও অন্তর্নিহিত ছিল। তিনি প্রত্যহ স্নানান্তে ক্ষণকালের জন্য পরিজন-বেষ্টিত হইয়া শান্ত ও সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন এবং উপাসনান্তে কোনও ধর্ম্মগ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। যাঁহারা বহুপুণ্যফলে কখনও তাঁহার সেই পারিবারিক উপাসনায় যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন, প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা যে কাহাকে বলে তাহা তাঁহাদের জানিতে বাকি নাই। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্বরচিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে ঠিক বলিয়াছেন যে "শিবচন্দ্রের জীবন আদর্শ ব্রাহ্মজীবন।" শিবচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন যে দিক হইতেই আলোচনা করা যায় সেই দিকেই তাহার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। তিনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পিতা ও আদর্শ পতি ছিলেন। তাঁহার আশ্রিত-বাৎসল্য ও বন্ধুপ্রেম ও সকলের দৃষ্টান্ত স্থল; তিনি স্বহস্তে অনেক কাজ করিতে ভাল বাসিতেন বলিয়া বহু পরিমাণে ভৃত্য-সেবা-নিরপেক্ষ ছিলেন; ভৃত্যগণ তাঁহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত।

এদেশের অনেক সাধু ধর্ম্মাত্মা একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই পরা বিদ্যা জানিয়া অনাবশ্যক বোধে অপর বিদ্যার অনুশীলনে বীতস্পৃহ হন এবং দৈহিক স্বাস্থ্যের নিয়মপালনেও অবহেলা করেন। শিবচন্দ্র কখনও এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন না; তিনি আজীবন সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় আনন্দলাভ করিতেন এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ "শিশুপালন" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন; নিয়মিত ব্যায়ামাদি দ্বারা তাঁহার স্বভাবতঃ ক্ষীণদেহকে কার্য্যক্ষম করিবার জন্যও তিনি আজীবন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিরূপে শিবচন্দ্র ইং ১৮৮১ সালের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে যে অভিভাষণটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার উপসংহারে মহামতি থিওডোর পার্কারের নিম্নানূদিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন :—

"আমাদিগের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, আমাদিগের মনের বা আত্মার প্রত্যেক বৃত্তি, আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া যে সকল শক্তি অধিকার করি বা উত্তরকালে অর্জ্জন করি—এ সমস্তের নিয়মানুগত ব্যবহার, বিকাশ ও উপভোগের দ্বারা ঈশ্বরসেবাই ধর্ম্ম।"

মহাত্মা শিবচন্দ্র আমরণ এই উদার অর্থে ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। মানবজীবনের সর্ব্বতোমুখী অভিব্যক্তিকেই তিনি ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। একজন প্রতীচ্য পণ্ডিত বলেন যে মানব-জীবন রত্ন রাখিবার একটি কৌটা স্বরূপ; যিনি যত মহার্হ রত্ন এই কৌটায় পূরিতে পারেন, তাঁহার জীবন ততই মূল্যবান্ হয়। কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এইরূপ রত্ন সংগ্রহের তারতম্য কেবল ব্যক্তিগত চেষ্টার

উপর নির্ভর করে না—দেশ, কাল ও অবস্থার অনুকূলতা-সাপেক্ষ। সিংহল দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্রের অংশ বিশেষে মুক্তা সংগ্রহের যেরূপ সুবিধা, অন্যত্র সেরূপ সুবিধা নাই। মহাত্মা শিবচন্দ্র নিজ জীবনকে যে অনন্ত-রত্ন-ভাণ্ডারে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা প্রধানতঃ তাঁহার অসাধারণ চরিত্রগুণে বটে, কিন্তু তিনটি অনুকূল ঘটনা তাঁহার জীবন-পথের বিশিষ্টরূপে সহায় হইয়াছিল। প্রথম ঘটনা এই যে, তিনি যখন ছয় বৎসরের শিশু তখন কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দু কালেজ স্থাপিত হওয়াতে এদেশে উচ্চ দরের ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়; দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, তিনি যখন সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; তৃতীয় ঘটনা এই যে, পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি একটি পরমরূপবতী ও গুণবতী বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। ইহা শিবচন্দ্রের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে উচ্চ শিক্ষার প্রথমযুগে ও মহাত্মা রামমোহনের অভ্যুদয় কালে তিনি কলিকাতা রাজধানীতে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন—নতুবা তাঁহার জীবনের বর্ণ অন্যরূপ হইত। তাঁহার বিবাহও নিরতিশয় কল্যাণোদর্ক হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নিজের পঠদ্দশাতেই শিবচন্দ্র তাঁহার মেধাবিনী ভার্য্যার শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার বালিকা স্ত্রীর চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে নিজ চরিত্রের ছাঁচে ঢালিয়া মনের মত করিয়া লইয়াছিলেন· স্ত্রীর শিক্ষা-বিধানে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া ছিলেন, তদনুরূপ গুরুদক্ষিণাও পাইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা পতিপ্রাণা স্ত্রী পঁয়ষট্টি বৎসর কাল যাবৎ তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী ছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে পূর্ণ সহানুভূতি ও যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। এই বুদ্ধিমতী ও সুশিক্ষিতা রমণীর সুনিপুণ গৃহিণীপনায় শিবচন্দ্রের সংসার লক্ষ্মীর সংসার হইয়াছিল। দয়া দাক্ষিণ্যাদি নারীজনোচিত সকল গুণ ত তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিলই, অধিকন্তু তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা তাঁহার স্বামীর অপেক্ষা কোনও অংশে কম ছিল না। কি স্বামী-সেবায়, কি গো-সেবায়, কি অতিথি-সৎকারে, কি সন্তান-পালনে, কি আশ্রিত-বাৎসল্যে, কি গৃহসজ্জায়, সর্ব্ব বিষয়ে তিনি রমণী কুলের দৃষ্টান্ত স্থল ছিলেন। মিতব্যয়িতার ফলে সংসার-খরচের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে তিনি যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা স্বামীর সদনুষ্ঠানে বিধি মতে সাহায্য ও নিজের বদান্যতা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ঠিক সম্মুখে গঙ্গার পশ্চিম তীরে একটি সুন্দর চাঁদনীবিশিষ্ট ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং নিজব্যয়ে স্বামীগৃহে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুপ্ত দানের সংখ্যা নাই—আমরা তাঁহার মৃত্যুর পর প্রসঙ্গ ক্রমে স্বর্গীয় গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে একবার তিনি নিজের নাম গোপন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে একটি হার্ম্মোনিয়ম কিনিবার জন্য চারিশত টাকা দান করিয়াছিলেন। সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার

স্বামীই তাঁহাকে দীক্ষিত করেন; এই দীক্ষার পর তিনি স্বামীর সহিত প্রত্যহ নিয়মিত রূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম যোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল মৃত্যুও তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই।

মহাত্মা শিবচন্দ্র ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী-সৌভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শিবচন্দ্রের কোনও দূরসম্পর্কীয়া কুটুম্বিনীর মুখে নিজ গুণের প্রশংসা শুনিয়া শিবচন্দ্রের স্ত্রী একদিন তাঁহাকে বিনয়-নম্রবচনে বলিয়াছিলেন— "আমার কোনো গুণ নাই, ওঁর গুণেই আমার গুণ; চাঁদের যেমন নিজের কোন তেজ নাই, সূর্য্যের আলোই চাঁদকে উজ্জ্বল করে, আমিও তেমনি।" পূর্ব্বোক্ত কুটুম্বিনী এই কথা শিবচন্দ্রের কর্ণগোচর করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"না, তা নয়, ওঁর যোগ্য আমি, আমার যোগ্য উনি।" এই কথাই ঠিক—মহাত্মা শিবচন্দ্র সর্ব্বাংশে অনুরূপ স্ত্রীলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিধাতা যেন লোক শিক্ষার্থ এই আদর্শ দম্পতীর মিলন ঘটাইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহাদের পবিত্র জীবন কাহিনী বর্ণনা করিবার যোগ্য নহি—তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ আমাদের এই দুর্ব্বল লেখনীর উপর বর্ষিত হউক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বপুরুষ

যে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ জোব চার্ণক কলিকাতা মহানগরীর ভিত্তি পত্তন করেন, তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার নিজ নামে খ্যাত "চানকে" বাসের জন্য এক খানি বাংলা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার অনেক বৎসর পরে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজ রাজ্যের রক্ষার্থ চানকে একটি বৃহৎ সেনা-নিবাস স্থাপিত হয় এবং সেই সময় হইতে উক্ত স্থান "বারাকপুর" নামে অভিহিত হয়। সেনা-নিবাস সংস্থাপনের জন্য যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ইংরাজরাজ ক্রয় করিয়াছিলেন তাহাতে অনেক ভদ্রলোকের বাস ছিল; তাঁহারা এখন বারাকপুর হইতে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। যাঁহারা এইরূপে বারাকপুর পরিত্যাগ করেন, দেবোপাধি-বিশিষ্ট একটি সম্ভ্রান্ত মৌলিক কায়স্থ গোষ্ঠী তাঁহাদের অন্যতম। এই গোষ্ঠীর একাংশ বারাকপুরের নিকটবর্ত্তী মণিরামপুরে ও অপরাংশ গঙ্গার পরপারস্থ কোন্নগরে নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। বারাকপুরের দেবপরিবারের যিনি কোন্নগরের সুবৃহৎ দেবপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার নাম নিধিরাম দেব। তিনি বারাকপুরনিবাসী অনন্তরাম দেবের একমাত্র পুত্র। নিধিরামের সাত পুত্র ও তিন কন্যা—তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্রের নাম ব্রজকিশোর। ব্রজকিশোরের তিন কন্যা ও চারি পুত্রের সর্ব্ব কনিষ্ঠ মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব। সমগ্র দেববংশ অলঙ্কার দেব মজুমদারের সন্তান বলিয়া পরিচিত; এই প্রাচীন ও বিস্তীর্ণ বংশের সমাজ—কর্ণসেন, এবং গোত্র—আলম্বয়ন। আমরা বংশ-প্রতিষ্ঠাতা হইতে শিবচন্দ্রের পুরুযানুক্রম দেখাইবার জন্য নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত বংশাবলী দিলাম :— (পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায়)

নবাবী আমলে রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কার্য্য পরিচালনের ভার হিন্দুর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক পরগণায় একজন বিধিজ্ঞ রাজপুরুষ (কানুনগো) ভূমির পরিমাণ, রাজস্ব ও স্বত্বাদির বিবরণ রাখিতেন। কানুনগোর অধীনস্থ জমা বা রাজস্বের হিসাব লেখকগণ মজুমদার নামে অভিহিত হইতেন। এখন ঐ পদ উপাধি মাত্রে পর্য্যবসিত

হইয়াছে। দেববংশের প্রতিষ্ঠাতা অলঙ্কার দেব, মজুমদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া নবাবী আমলে ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি উক্ত সম্মানসূচক

সমাজ — কর্ণসেন। গোত্র — আলম্বয়ন।

আদিপুরুষ হইতে গণিত পর্য্যায়সংখ্যা		নিবাস
১৩।	অলঙ্কার দেব মজুমদার	
১৪।	ধরণীধর	ঘড়ঘড়ের শঙ্করপুর
১৫।	রামচন্দ্র	ঘড়ঘড়ের শঙ্করপুর
১৬।	কন্দর্প, কমলনয়ন (রামচন্দ্রের পুত্র)	ঘড়ঘড়ের শঙ্করপুর
১৭।	কৃষ্ণানন্দ, পার্ব্বতীচরণ (কমলনয়নের পুত্র)	মস্মীম নগর
১৮।	রমাবল্লভ, কামদেব (পার্ব্বতীচরণের পুত্র)	গঙ্গাতীর বা বারাকপুর
১৯।	পরশুরাম, অনিরাম (রমাবল্লভের পুত্র)	গঙ্গাতীর বা বারাকপুর
২০।	অনন্তরাম, রামভদ্র (পরশুরামের পুত্র)	গঙ্গাতীর বা বারাকপুর
২১।	নিধিরাম (অনন্তরামের পুত্র)	কোন্নগর
২২।	রামহরি, রামশঙ্কর, জগন্নাথ, নবকিশোর, ব্রজকিশোর, রাজকিশোর, হরকিশোর (নিধিরামের পুত্র)	
২৩।	ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, শিবচন্দ্র (ব্রজকিশোরের পুত্র)	

উপাধি গ্রহণের অধিকারী। বস্তুতঃ প্রাচীন দলিলাদিতে এই উপাধির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—"শ্রীনিধিরাম দেব মজুমদার ওলদে শ্রীঅনন্তরাম দেব মজুমদার এবনে শ্রীপরশুরাম দেব মজুমদার" অর্থাৎ শ্রীপরশুরাম দেব মজুমদারের পুত্র শ্রীঅনন্তরাম দেব মজুমদার তস্য পুত্র শ্রীনিধিরাম দেব মজুমদার। কিন্তু আমরা বহুকাল পূর্ব্বে ব্রজকিশোর দেবের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র দেখিয়াছিলাম—তাহাতে

কেবল দেব উপাধিরই উল্লেখ ছিল; কোন্নগরের দেব বংশীয়েরা কেহ কখনও মজুমদার উপাধি গ্রহণ করেন নাই। কোন্নগরের দেব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺নিধিরাম দেব বারাকপুর হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহার অপর জ্ঞাতিবর্গের ন্যায় মণিরামপুরে নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করা যুক্তি সিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই; তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে বারাকপুরের সেনানিবাসের আয়তন উত্তরকালে আরো বর্দ্ধিত হইলে তৎসন্নিহিত মণিরামপুর গ্রামে বাস করা যে নিরাপদ হইবে তাহার স্থিরতা কি?

কোন্নগর একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম—এখানে বহুকাল হইতে অনেক কুলীন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস; কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা বর্ণনোপলক্ষে কোন্নগরের উল্লেখ আছে—

"ত্বরায় চলে তরী তিলেক নাহি রহে।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ বহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
সর্ব্বমঙ্গলা দেউল দেখিবারে পায়॥"

অধিকন্তু হিন্দু মাত্রেরই ধারণা এই যে, "গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসী সমতুল।" এই জন্য নিধিরাম গঙ্গার পশ্চিমকূলবর্ত্তী তরুচ্ছায়াসমন্বিত কোন্নগর গ্রামের গঙ্গার অনতিদূরে নিজ বৃহৎ পরিবারের স্বচ্ছন্দ বাসোপযোগী একখানি ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী ও তৎসংলগ্ন সুদূর বিস্তৃত উদ্যান ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিধিরাম ও তাঁহার কৃতী পুত্র ব্রজকিশোর উক্ত বাটীর কলেবর ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত করিয়া উহাকে একটি প্রকাণ্ড দালান ও প্রশস্ত প্রাঙ্গণ শোভিত বৃহৎ অট্টালিকায় পরিণত করিয়াছিলেন। আমরা নিধিরাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই। তাঁহার পঞ্চমপুত্র ব্রজকিশোরই কোন্নগরে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন ক্রিয়াবান্ ও ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন বলিয়া কোন্নগরের প্রাচীনেরা এখনও তাঁহার নামোল্লেখ করেন। মহাত্মা শিবচন্দ্র তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে তাঁহার পিতৃদেব ব্রজকিশোর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার সামান্যরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং তিনি বহুকাল সৈনিক বিভাগে রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় ইংরাজ সেনানীদিগের সহিত নিত্য সংসর্গের ফলে ক্ষিপ্রতার সহিত ইংরাজি পড়িতে ও ঐ ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন। সে কালে উক্ত কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল; তিনি বহুকাল বিশ্বস্ততার সহিত গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরি করিয়া বৃদ্ধ বয়সে যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তি পাইয়া কর্ম্ম হইতে অবসব গ্রহণ করেন। তিনি সাহসী, কর্ম্মিষ্ঠ ও খারা লোক ছিলেন। তিনি মিতাচারী ছিলেন এবং আহারাদি দৈনন্দিন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিতেন—কদাচিৎ তাহার অন্যথা হইত; এই জন্য তিনি সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বদেশে একটি ঘড়ী রাখিতেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; ইংরাজি ১৮৪৬ সালে, ৯৫ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হয়।"

ব্রজকিশোর তেজস্বী ও উগ্রস্বভাব ছিলেন; সকলে তাঁহাকে সম্মান ও ভয় করিত—তাঁহার পুত্র কন্যারাও কখনও মুখ তুলিয়া তাঁহার সমক্ষে কথা কহিতে সাহস করিতেন না। তিনি যে সরকারি কর্ম্ম করিতেন তাহার মাসিক বেতন দশ টাকা মাত্র ছিল, কিন্তু তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীরা তাঁহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইতেন যে তাঁহাকে বিধিমতে পুরস্কার দিতে ত্রুটি করিতেন না, এবং ন্যায় পথে থাকিয়া, যখনই দশ টাকা পাইবার সুযোগ ঘটিত, তখনই তাঁহাকে সে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার কর্ম্মস্থান সাধারণতঃ বারাকপুরেই ছিল, কিন্তু তাঁহাকে কখন কখন সৈন্যদলের সহিত পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হইত। ইংরাজি ১৭৭৪ সালে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "রোহিলা সমরে" অযোধ্যার নবাব-উজীরের সাহায্যার্থ যে সমস্ত সৈন্য পাঠাইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস্ দুরপনেয় কলঙ্কের ভাগী হইয়াছিলেন, ব্রজকিশোর তাহাদের সঙ্গে রোহিলখণ্ডে গিয়াছিলেন এবং যে যুদ্ধে বীরকেশরী হাফেজ রহমৎ ইংরাজ সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন, সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। নবাব-উজীরের কাপুরুষ সৈন্যগণ যুদ্ধকালে দূরে থাকিয়া, যখন দেখিল যে ইংরাজ সৈন্যের জয় হইয়াছে, তখন তাহার লুণ্ঠন কার্য্যে অগ্রসর হইতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলেন যে ইংরাজ সৈন্যগণ এই লুণ্ঠন কার্য্যে যোগ দেয় নাই। ইহা সত্য হইলেও, তাহারা যে লুণ্ঠনের ফলভোগে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছিল তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, কার্য্যকুশল ব্রজকিশোর লুণ্ঠনের কোনও ভাগ না পাইলেও, কতকগুলি মহার্হ দ্রব্য লুণ্ঠনকারীদিগের নিকট সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে কোনওরূপে দোষ দেওয়া যায় না।

ব্রজকিশোরের সাহস ও বীর্য্য সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, একবার তিনি কোনও যুদ্ধে বিপক্ষকর্ত্তৃক নিহত সেনা-নায়কের পরিচ্ছদ পরিধান ও অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়নোদ্যত স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সাহস দিয়া ও উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ইহা কতদূর সত্য তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের সাধ্যাতীত। ব্রজকিশোরের নগদ টাকা বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু তাঁহার কোন্নগরে অনেক জায়গা জমি ছিল এবং কোন্নগরের নিকটবর্ত্তী রিষড়া গ্রামে ৮০ বিঘা পরিমিত একখানি উৎকৃষ্ট বাগান ছিল; বারাকপুরের একখানি বাংলা হইতেও তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পাইতেন। সেকালে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত, সুতরাং সামান্য আর্থিক আয়েও ভোগ-বিলাস-বিরত পল্লীবাসী গৃহস্থের সংসার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিত। ব্রজকিশোর বড় মিতব্যয়ী ছিলেন এবং তাঁহার সকল কার্য্যের বেশ শৃঙ্খলা ছিল; এই জন্য তিনি তাঁহার বৃহৎ সংসারের নিত্য খরচ চালাইয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকাণ্ডের নৈমিত্তিক খরচও সুচারুরূপে চালাইতেন। তাঁহার চাল-চলন একজন সম্পন্ন গৃহস্থের যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ ছিল; বাটিতে একজন সরকার হিসাবপত্র রাখিতেন; ছেলেদের শিক্ষার জন্য একজন গুরুমহাশয় নিযুক্ত ছিলেন;

একজন কবিরাজ প্রত্যহ ব্রজকিশোর ও তাঁহার পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যের তত্ত্ব লইতেন। ব্রজকিশোর নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং ধনিয়া, পল্‌তা, জোয়ান, মৌরী প্রভৃতি বিবিধ স্বাস্থ্য-বিধায়ক দ্রব্য নিত্য সেবন করিতেন এবং নিয়মিত সময়ে আহারাদি করিতেন। সকল প্রকার পাঁচনের উপকরণ সর্ব্বদা তাঁহার হাতের কাছে থাকিত; তাঁহার প্রতিবেশীগণও আবশ্যক হইলে এই সকল দ্রব্য তাঁহার নিকট পাইতেন। বাটীর সম্মুখস্থ বাগানের একাংশে ঔষধার্থ প্রয়োজনীয় লতাগুল্ম যত্নে রোপিত ও সংরক্ষিত হইত। সাংসারিক সকল বিষয়ে ব্রজকিশোরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল; প্রাচীন বয়সেও তাঁহার শ্রবণশক্তি এরূপ প্রখর ছিল যে বাটীর নিকটবর্ত্তী তাল নারিকেলাদি বৃক্ষের ফল বৃক্ষচ্যুত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া ভূপতিত ফল আহরণের জন্য লোক পাঠাইতেন। প্রত্যহ প্রাতে ভাণ্ডারী ব্রজকিশোরের বৃহৎ সংসারের দুই বেলায় খরচের উপযোগী ভোজ্য দ্রব্য হিসাব ও ওজন করিয়া কর্ত্তার আদেশমত ভাণ্ডার হইতে অন্তঃপুরে পাঠাইত। অকারণে কোনও দ্রব্যের সামান্য অপচয়ও ব্রজকিশোরের অনভিমত ছিল; কিন্তু আবশ্যক বিষয়ে তাঁহার ব্যয়কুণ্ঠতা ছিল না; গৃহের জীর্ণসংস্কারাদি তিনি যথাসময়ে সম্পন্ন করিতেন এবং তজ্জন্য স্থপতি বা সূত্রধরের ব্যবহার্য্য যন্ত্রসমূহ সর্ব্বদা মজুত রাখিতেন। জল ভাল থাকিবে বলিয়া তাঁহার বাটীর সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিদিকের মৃত্তিকা-স্তূপ এত উচ্চ করিয়াছিলেন, যে কোন্নগরের লোকে তাহাকে "ব্রজকিশোরী পগার" বলিত। অতি সূক্ষ্মতম বিষয়েও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের ও শৃঙ্খলা-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাইত; আমরা ইহার একটি উদাহরণ দিব। ক্রিয়াকাণ্ডের সময় বিশাল প্রাঙ্গণের উপর বিশেষ নিপুণতার সহিত সামিয়ানা খাটানো হইত এবং উহাকে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিবার জন্য ছাদের প্রান্তে কতকগুলি ছিদ্র যথাস্থানে খনিত হইত; সেগুলি বুজিয়া গেলে নূতন ছিদ্র পাছে অযথাস্থানে খনিত হয় এবং সামিয়ানা পূর্ব্ববৎ নৈপুণ্যের সহিত খাটানো না হয়, এই ভয়ে ছিদ্র-মুখগুলি, ব্রজকিশোরের আদেশে, নারিকেল ছোবড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইত। ব্রজকিশোর শাক্ত ছিলেন; প্রতি বৎসর মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা করিতেন এবং এই উপলক্ষে অনেক দীন-দরিদ্রকে খাওয়াইতেন। পিতামাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষেও তিনি গ্রামস্থ কাঙ্গালাদিগকে ভোজন করাইতেন এবং বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজ্য উৎসর্গ করিতেন। পূজার সময় ব্রজকিশোরের বাটীতে যাত্রা হইত; এসম্বন্ধে আমরা মহাত্মা শিবচন্দ্রের মুখে একটি কৌতুকজনক গল্প শুনিয়াছিলাম। কোন্নগরের একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের উপাধি "বসু" কিন্তু তাঁহারা "মণি" নামে খ্যাত। ৺মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—কোন্নগরের লোকে তাঁহাকে "মহেন্দ্র মণি" বলিত; সেইরূপ কমল বসু নামে তাঁহার জনৈক পূর্ব্বপুরুষ "কমল মণি" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। একবার পূজার সময় ব্রজকিশোরের বাটীতে একদল যাত্রাওয়ালার সমাগম হয়। নিজ বাটীতে

তাহাদিগকে বাসা দেওয়ার সুবিধা হইবে না বলিয়া ব্রজকিশোর যাত্রার দলের অধিকারীকে ডাকিয়া বলিলেন—"কমলমণির বাটিতে তোমাদের বাসা ঠিক করিয়াছি, তোমরা সেইখানে যাও।" অধিকারী এই কথা শুনিয়া বিষম উদ্বিগ্ন হইল এবং করযোড়ে নিবেদন করিল—"কর্ত্তা মহাশয়! আমার দলে ছোকরার ভাগই বেশী, বেশ্যার বাটীতে বাসা দিলে তাহাদের ঘোর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; আপনি দয়া করিয়া অন্যত্র বাসার বন্দোবস্ত করুন।" ব্রজকিশোর অধিকারীর নিবেদন শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই; তিনি কমল মণির প্রকৃত পরিচয় দিয়া অধিকারীর ভয় ভঞ্জন করিলেন। বলা বাহুল্য, যে, শিবচন্দ্র ডেপুটি কালেক্টারের পদ পাইয়া পৈতৃক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশিষ্টরূপ অর্থ সাহায্য করিতেন।

আমরা ৺ব্রজকিশোর দেব মহাশয় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা লিখিলাম। তিনি যে একজন কৃতী ও ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথমেই জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। যখন পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে এদেশে ইংরাজ-আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় তখন তিনি ৫।৬ বৎসরের শিশু; প্রথম শিখ-যুদ্ধের শেষ দেখিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং তিনি ইংরাজ-আধিপত্যের মধ্যাহ্ন-গৌরবও দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বয়সে এদেশে শিক্ষার চরম অবনতি এবং শেষ বয়সে উচ্চ শিক্ষার সূচনা ও অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তিনি রীতিমত শিক্ষা না পাইয়াও নিজের উদ্যমশীলতা, চরিত্রের সারবত্তা ও কার্য্যকুশলতাগুণে স্বীয় সমাজে বিশিষ্টরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। যে সময়ে এদেশে ঘড়ীর ব্যবহার ছিল না বলিলেই হয়, সেই সময়ে তিনি ঘড়ী ধরিয়া সকল কাজ করিতেন। তিনি তাঁহার বাসগ্রাম কোন্নগরের মায়া কাটাইয়া বৃদ্ধ বয়সেও কাশীবাস করিতে সম্মত হন নাই; শিবচন্দ্রের শ্বশুর ৺বৈদ্যনাথ ঘোষ মহাশয় যখন স্বয়ং কাশীবাসী হন, তখন বৈবাহিককেও সেইরূপ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন; তদুত্তরে ব্রজকিশোর বলিয়াছিলেন—"আমি গঙ্গার পশ্চিমকূলে বাস করিতেছি, আমার কাশীবাসের প্রয়োজন কি?" শিবচন্দ্রও কোন্নগরের মায়া কাটাইয়া বন্ধুবর্গের অনুরোধে কলিকাতায় বাসাবাটী নির্ম্মাণ করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু শিক্ষার তারতম্যে আদর্শের বিভিন্নতা হয়; শিক্ষার অভাবে ব্রজকিশোর তৎকাল-প্রচলিত হিন্দু আদর্শানুসারে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানদ্বারা কোন্নগরের হিতসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার সুশিক্ষিত কুল-পাবন পুত্র উচ্চতর আদর্শানুসারে বিবিধ স্থায়ী সদনুষ্ঠান দ্বারা কোন্নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মহাত্মা শিবচন্দ্র পিতৃদেবের আত্ম-নির্ভরশীলতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, উদ্যমশীলতা, কর্ম্মিষ্ঠতা, শারীরিক নিয়ম পালনে যত্নশীলতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণের উত্তরধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট ঘড়ী ধরিয়া কাজ করিতে এবং প্রত্যেক কার্য্য নিপুণতা ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় কখনও উগ্র-স্বভাব ছিলেন না; তাঁহার চির-শান্ত প্রকৃতি তাঁহার মাতৃদত্ত ধন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বাল্যজীবন

ইং ১৮১১ (বাং সন ১২১৯) সালের ২০শে জুলাই (৬ই শ্রাবণ) তারিখে শনিবারে কোন্নগর গ্রামে শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হন, সে সময়ে তাঁহার পিতা ব্রজকিশোর দেব কঠিন পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন। এজন্য সূতিকাগারের অনুষ্ঠেয় কার্য্যগুলির প্রতি গৃহের সকলের অমনোযোগ দেখিয়া, প্রসূতি নিজেই, সন্তানের কল্যাণ কামনায়, ষষ্ঠদিবস প্রাতে নবকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রজকিশোরের মধ্যমা ভগিনীকে বলিলেন, "ঠাকুরঝি! খোকার যেঠেরা পূজা হ'বে না?" তিনি এই কথা শুনিয়া ক্রোধ কর্কশস্বরে ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া চীৎকার করিতে করিতে বলিলেন, "ওরে আবাগি! তোর স্বামী কখন মর্‌বে, কখন তোর হাতের শাঁখা খস্‌বে, তুই এখন তাই ভাব্—তা নয়, তুই কিনা ছেলের যেটেরা পূজা করতে চাস্? তোর বলতে লজ্জা হ'ল না?" শিবচন্দ্রের জননী অতিশয় শান্তস্বভাবা ছিলেন। তিনি ননন্দার নিকট তিরস্কৃতা হইয়া পুত্র-ক্রোড়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রজকিশোর উপরের ঘর হইতে ভগিনীর মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিতে পাইয়া ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভগিনীকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মেজদিদি! তুমি রাগ করিতেছ কেন? আমি বলিতেছি আমি আরোগ্য লাভ করিব, আমার কোনও ভয় নাই। আমি জ্যোতিষীর দ্বারা গণনা করাইয়াছি, আমার এই ছেলে বড়লোক হইবে, এই বালক হইতে আমার কুল উজ্জ্বল হইবে এবং আমি এখন অনেক দিন বাঁচিব। তুমি রীতিমত যেঠেরা পূজার আয়োজন কর।" তাহাই হইল। শিশুর পিতাও ক্রমে রোগমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

ঠিক কত বয়সে শিবচন্দ্রের বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আমাদের জানা নাই; প্রচলিত প্রথানুসারে সম্ভবতঃ পঞ্চম বর্ষে তাঁহার হাতে খড়ি হইয়াছিল। সে সময়ে কোন্নগরগ্রামে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য এখনকার মত কোনও বিদ্যালয় ছিল

না। ব্রজকিশোর পুত্রের শিক্ষার জন্য একজন গুরুমহাশয়কে নিযুক্ত করিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন; শিবচন্দ্র তাঁহার নিকট সামান্যরূপ বাঙ্গালা লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখেন। শিবচন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন প্রায় দশ বৎসর, তখন তিনি বাড়ীতে বসিয়া মদনমোহন মিত্র নামক তাঁহার এক পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতার নিকট অল্প অল্প ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন; এই শিক্ষা আর কিছুই নহে—কেবল কতকগুলি ইংরাজি শব্দ বানান করিতে ও পড়িতে শিখা এবং শব্দার্থ কণ্ঠস্থ করা।

বাল্যকাল অতিক্রম করিতে না করিতে, এই শান্তস্বভাব, শিক্ষালোলুপ ও জ্ঞানপিপাসু বালকের জীবনে এক দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিল। একাদশবর্ষ বয়সে শিবচন্দ্র মাতৃহীন হইলেন। জননীর লোকান্তর গমনে, তিনি অসহায় ও অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমবেত যত্নে, বালক শিবচন্দ্র মাতৃবিয়োগ নিবন্ধন দুঃখ ও শোক অনুভব করিতে পান নাই। এইজন্য, তিনি আবাল্য স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কি বাল্যকালে, কি যৌবনে, কি প্রাচীনাবস্থায় কখনও স্ত্রীজাতির শুভসাধনে বিমুখ ছিলেন না। রমণীকুলের সুখবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধনের উপায় করিতে পারিলে, আনন্দ বোধ করিতেন।

গৃহিণীর মৃত্যুর পর ব্রজকিশোর দেব মহাশয়ের সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। তন্নিবন্ধন, শিবচন্দ্রের জীবনের পরবর্ত্তী দুই বৎসর সম্পূর্ণ অলসভাবে কাটিয়া যায়। লেখাপড়া শিখিবার কোনও রূপ ব্যবস্থা ছিল না। মাতৃহীন বালক বলিয়া সকলেই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাই কি ভাবে, কি কাজে, শিবচন্দ্রের সময় কাটিতেছিল, কেহই তাহার সংবাদ লইতেন না। বিনা কাজে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে দুই বৎসর অতীত হওয়ার পর, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শুনিলেন যে, কলিকাতায় ভাল ভাল ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানে ইংরাজি শিখিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার কলিকাতায় যাইবার এবং সেখানে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। মাতৃহীন কনিষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র, পিতার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়াও কখন পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে সাহস করিতেন না। ইহার কারণ এই যে, বালক শিবচন্দ্র কেন, পূর্ণবয়স্ক আত্মীয়েরাও ব্রজকিশোরের সম্মুখে স্বাধীনভাবে কথা কহিতে সাহস করিতেন না। ব্রজকিশোর রুক্ষ-প্রকৃতিবিশিষ্ট—রাশভারি লোক ছিলেন। তাঁহার নিকট কথা কহিতে হইলে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা কহিতে হইত। পিতা না ডাকিলে, শিবচন্দ্র পিতার নিকটে সহজে অগ্রসর হইতেন না।

স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ ও সুপ্রকৃতি নিবন্ধন, শিবচন্দ্র আর অধিক দিন এইরূপে অলসভাবে না কাটাইয়া, কলিকাতায় গিয়া, ইংরাজি শিক্ষার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কি উপায়ে এই অভিপ্রায় পিতার গোচর করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্য কোনও উপায় তাঁহার মনের মত না হওয়ায়, পরিশেষে

একখানি পত্রে আপনার মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া পিতার নিকট দেওয়াই স্থির করিলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত জগন্নাথের পুত্র উমাচরণ দেবের দ্বারা, ঐ মর্ম্মের একখানি প্রার্থনাপত্র ইংরাজি ভাষায় লিখাইয়া লইলেন। পত্রখানি প্রস্তুত হইলে পর, একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, পিতা আহারান্তে দৈনিক প্রথামত নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার শয্যাপার্শ্বস্থ লেখ্যাধার বাক্সের উপর ঐ পত্রখানি আস্তে আস্তে রাখিয়া আসিলেন। ব্রজকিশোর, নিদ্রাভঙ্গে ঐ পত্র পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

শিবচন্দ্র বাল্যকালে কিরূপ ধীর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, কলিকাতা যাত্রার অল্পদিন পূর্বের একটি ঘটনায় তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন, এমন সময়ে গ্রামের চারিদিকে এক জনরব উঠিল যে, গ্রামে "বর্গী" আসিতেছে। গ্রামের লোকেরা আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া সপরিবারে দেবদের বাটীতে আশ্রয়ার্থ সমাগত হইতে লাগিল। ক্রমে লোক সংখ্যা এত অধিক হইয়া উঠিল যে, বিস্তৃত গৃহপ্রাঙ্গণ ও সুবৃহৎ অট্টালিকাতে স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া পড়িল। তবুও জনসমাগম নিবারণ হইতেছে না। এ গৃহে আশ্রয় লইয়াও, গ্রামবাসিগণ বায়ুতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় অনুক্ষণ কম্পিত হইতেছে। উৎকণ্ঠার আবেগে অনেক স্ত্রীপুরুষ অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। এমন সময়ে, বালক শিবচন্দ্র জনে জনে প্রত্যেককে সাহস দিয়া সজীব, ও প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন "ওসব কিছুই নয়। তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমরা মিথ্যা ভয়ে জড়সড় হইয়া গোল করিও না। বর্গী আসা অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু এরূপ বিপদসমাগম-সম্ভাবনাজাত উৎকণ্ঠায়, বালকের কথায় কে শান্ত হইতে পারে? বৃদ্ধদের কেহ কেহ বালককে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুই ছেলে মানুষ, চুপ কর্।" সন্ধ্যার সময় শিবচন্দ্রের পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৃহে আসিয়া দেখেন, গৃহ লোকে লোকারণ্য। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার জানিতে পারিলেন যে, গ্রামময় জনরব, "বর্গী আসিতেছে।" তখন তাঁহারা ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত সংবাদ আনিলেন। ব্যাপার এই যে, গ্রামপ্রান্তে—পথে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে প্রহার করিতেছিল, প্রহৃত ব্যক্তি কোম্পানীবাহাদুরের দোহাই দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, "মেরে ফেল্লে গো, রক্ষা কর গো।" এই ক্রন্দন, এই চীৎকার, এই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ও তাহা হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা হইতে বর্গী আসার জনরব উঠিয়াছিল।

ব্রজকিশোর এই সংবাদ লইয়া, সপুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর, সকলে একে একে সভয় ধীর পাদবিক্ষেপে আপন আপন আলয়াভিমুখে অগ্রসর হইল। যাইবার সময়ে অনেকে শিবচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন, "বালক ত ঠিক

কথাই বলিয়াছিল।" শিবচন্দ্র বাল্যকালেই তীক্ষ্ণবুদ্ধির গুণে সকল বিষয় যেমন সহজে বুঝিতে পারিতেন, সেইরূপ শান্ত স্বভাবগুণে বুদ্ধিরও চঞ্চলতা ছিল না। চলচিত্ততা কাহাকে বলে, শিবচন্দ্র তাহা জানিতেন না। অতি অল্প বয়সেই বিজ্ঞের ন্যায় চিন্তা করিতে এবং স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রবীণের ন্যায় পরামর্শ দিতে পারিতেন।

শিবচন্দ্র, ভাই ভগিনী ও গৃহের অন্যান্য সমবয়স্ক বালকবালিকাদিগের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহবান্ ছিলেন। কাহারও সহিত তাঁহার কলহ বা অপ্রিয় আচরণ কখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। গৃহের বালকে বালকে বা বালক বালিকায় কলহ করিলে, তিনি সহজে তাহার মীমাংসা করিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতিস্থাপন করিয়া দিতেন। অনাত্মীয়তার স্থানে আত্মীয়তা, কলহের স্থানে শান্তি এবং মনোমালিন্যের স্থানে প্রীতিস্থাপন করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। শৈশব-সহচর ও সমবয়স্ক আত্মীয়গণের মধ্যে এই সাধু কার্য্যের অঙ্কুরোদগম হইয়াছিল; প্রবীণ বয়সের বিবিধ ঘটনায় ইহার পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল।

শিবচন্দ্রের ভাবী মহত্ত্ব বাল্যেই সূচিত হইয়াছিল; আমরা ইহার নিদর্শন-স্বরূপ একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। তিনি যখন দশ বারো বৎসরের বালক, তখন তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী নামে তাঁহার পিতৃগৃহের পূজারী ঠাকুর একদিন তাঁহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি হাকিম হইবে।" বালক শিবচন্দ্র ইহা অসম্ভব মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; তখন ঐ দেবল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন "যদি তুমি হাকিম হও, তা হ'লে আমাকে কি দিবে, বল?" ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী যে কোনও কালে ফলবতী হইবে তাহা তখন শিবচন্দ্রের স্বপ্নের অগোচর; সুতরাং তিনি না ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিলেন "যদি আমি হাকিম হই, তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিব", এবং ব্রাহ্মণের অনুরোধে এই কয়টি কথা একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন। ইহার ২০।২২ বৎসর পরে উক্ত ব্রাহ্মণ একদিন মেদিনীপুরে শিবচন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত; তিনি তখন সেখানকার ডেপুটি কালেক্টার। ব্রাহ্মণ এতকাল সযত্নে রক্ষিত কাগজখানি যখন শিবচন্দ্রের হাতে দিলেন তখন তিনি বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার বাল্যজীবনের সেই বহুদিন-বিস্মৃত ঘটনাটি স্মরণ হইল। অতঃপর ঐ ব্রাহ্মণ যতদিন জীবিত ছিলেন, সত্যনিষ্ঠ শিবচন্দ্র ততদিন উহাকে প্রতিমাসে পাঁচ টাকা বৃত্তি দিতেন। শুধু তাহাই নহে—যেদিন প্রথম "হাকিম" হইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে প্রতিশ্রুত বৃত্তি হিসাব করিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু-কলেজ

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, শিবচন্দ্র কলিকাতায় প্রেরিত হন। হাটখোলানিবাসী রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয় শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত রামশঙ্কর দেব মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। হাটখোলায় রীড্ নামক জনৈক সাহেবের একটি বিদ্যালয় ছিল; শিবচন্দ্র প্রথমে তথায় প্রবিষ্ট হন। কিন্তু সেখানে যেরূপ পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে তাঁহার মন উঠিল না। বিদেশে বাস করিয়া, নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া, যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করা আবশ্যক, তিনি দেখিলেন রীড্ সাহেবের স্কুলে তাহা হইতেছে না। এজন্য আটমাস পরে উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু কলেজে পড়িবার ইচ্ছা পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন কলেজের বেতন মাসিক পাঁচ টাকা ছিল। পিতা, পুত্রের জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবল স্পৃহা দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনে অনুমিত দিলেন এবং তজ্জন্য নিজের মাসিক পাঁচ টাকা পেন্‌সনের সমগ্রভাগ ব্যয় করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া, শিবচন্দ্র, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখে, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে বেতনপ্রদ ছাত্র রূপে প্রবিষ্ট হইলেন; তখন যে সকল ছাত্র হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে প্রেরিত হইত, তাহাদের এবং আরো অনেক ছাত্রের বেতন লাগিত না। সে সময়ে হিন্দু কলেজে সর্ব্বশুদ্ধ দশটি শ্রেণী ছিল।

যে আত্মীয়ের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শিবচন্দ্র লেখাপড়া করিতেন, তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না। তাহার উপর আবার তাঁহাকে বহু পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। ব্রজকিশোর, পুত্রের খাই-খরচের জন্য ভ্রাতৃ-জামাতাকে অর্থ সাহায্য করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে উপঢৌকন স্বরূপ ভোজ্য দ্রব্যাদি পাঠাইতেন। স্বল্পাহারী শিবচন্দ্র বিলাস কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, সুতরাং

পঠদ্দশায় পরগৃহে অতি সামান্য আহারে, সন্তুষ্টচিত্তে দিন যাপন করিতেন। প্রবল বিদ্যানুরাগ বশতঃ কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। আহার্য্যের অবস্থা ও আহারের ব্যবস্থার দোষে, অনেক সময়ে, কোনও প্রকারে কায়ক্লেশে জঠরানল নির্ব্বাণ করিয়া, সেই কৃশাঙ্গ বালক, রাশীকৃত পুস্তক বহু কষ্টে বহন করিয়া, হাটখোলা হইতে পদব্রজে পটলডাঙ্গার কলেজে দশটার পূর্ব্বে উপস্থিত হইতেন এবং কলেজের ছুটি হইলে আবার সেই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া বাসায় ফিরিতেন। বাসা হইতে কলেজের দূরত্ব নিবন্ধন, শিবচন্দ্রকে ভোরে উঠিয়া দৈনিক পাঠ অভ্যাস করিয়া আটটা, সাড়ে আটটার সময় ভাত খাইয়া কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। এত সকালে ভাত হওয়া অনেক সময় দুষ্কর হইয়া উঠিত। সে কালে কাঠের জ্বালে রান্না হইত এবং বাটীর অল্পবয়স্কা বধূরাই এ কার্য্য করিতেন। বর্ষাকালে ভিজা কাঠের জন্য উনান ধরাইতে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত; এজন্য, ডাল ভাত প্রস্তুত হইতে প্রায়ই বিলম্ব হইয়া যাইত। শিবচন্দ্র পাঠাভ্যাস শেষ করিয়া বধূদের এ বিষয়ে সাহায্য করিতেন। তিনি ছোট ছোট কাঠের চিল্‌তা, কাঠের ফুল্‌কো, পাঁকাটি, শুক্‌না পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেন। শিবচন্দ্রের বিনয় নম্র ব্যবহারে বধূরা সকলেই তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং সকাল সকাল দুটি ভাত রাঁধিয়া কিরূপে তাঁহাকে দিবেন সেজন্য সকলেই বিশেষ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তথাপি শীতকালে তাঁহার ভাগ্যে সুসিদ্ধ ডাল ভাত প্রায়ই হইয়া উঠিত না। তিনি যখন আহার করিবার জন্য রান্নাঘরে গিয়া পাতা লইয়া বসিতেন, তখন হয়ত কোনও দিন বধূরা বলিতেন "আজ যে এখনও ডাল ভাত হয় নাই, একটু বিলম্ব কর।" উত্তরে শিবচন্দ্র বলিতেন "আর বিলম্ব করিলে কলেজ বসিয়া যাইবে, আপনারা যাহা হইয়াছে তাহাই হাতা কাটাইয়া আমার পাতে দিন।" বধূরা তখন অগত্যা সেই অর্দ্ধসিদ্ধ ডাল ভাতই দুই চারি হাতা পাতে তুলিয়া দিতেন। শিবচন্দ্র তাহারই দুই চারি গ্রাস তাড়াতাড়ি মুখে দিয়া কলেজে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার আশ্রয়দায়িনী বয়োজ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রত্যহ জল খাইবার জন্য তাঁহাকে একটি পয়সা দিতেন, তিনি সেই পয়সা দিয়া অপরাহ্ণে গজা কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন।

কলিকাতায় তাঁহার গতিবিধি ও চালচলনের উপর দৃষ্টি রাখিবার এবং তাঁহার উত্তম রীতিনীতির পরিপোষক কেহই ছিলেন না। কিন্তু তিনি এমনই শান্ত, বিনীত ও শিষ্ট ছিলেন যে, বিদেশেও তাঁহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন হইত না। তিনি যে বাড়ীতে বাস করিতেন, সে বাড়ীতে তাঁহার সমবয়স্ক অনেকগুলি বালক ছিল। তাহারা লেখাপড়ায় যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিত না। এজন্য, তিনি সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করিয়াও একটু দূরে দূরে অবস্থান করিতেন। এমন সাবধানে থাকিতেন যে, কোনও বালক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে কলহে প্রবৃত্ত করিতে অথবা তাঁহাকে দলে মিশাইয়া তাহাদের একজন করিয়া লইবার সুবিধা করিতে পারিত

না। বাল্যজীবনে এরূপ কঠিন পরীক্ষায় সচরাচর সকলকে পড়িতে হয় না। এই কঠিন পরীক্ষা ক্রমশঃ কঠিনতর আকার ধারণ করিল। এই যে, সাধারণ ভাবে সকলে সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করিয়াও, তিনি আপনার পথে আপনি চলিতেন, বালকদিগের কাহারও সহিত যোগ দিয়া কাহারও প্রদর্শিত পথে চলিতেন না, এইটি তাহারা পছন্দ করিত না। তাহারা তাঁহাকে নিজেদের দলের একজন করিতে গিয়া, যখনই বিফল-প্রযত্ন হইত, তখনই তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিত।

এই গৃহের বাহির বাটীর একটি ঘরে বালকগণের বসিবার ও পড়িবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাড়ীর বালকেরা, অনেক সময়েই নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকে সময় কাটাইত। সময়ে সময়ে শিবচন্দ্রকেও তাস ও দাবা খেলায় যোগ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। তাহাদের অভিপ্রেত কাজে তাঁহাকে নিয়োজিত করিতে না পারিয়া তাঁহার লেখাপড়ায় ব্যাঘাত জন্মাইত। তিনি সন্ধ্যার সময় পাঠ আরম্ভ করিলে, কেহ না কেহ তাঁহার প্রদীপ নিবাইয়া দিত।

তখন প্রদীপ জ্বালা এখনকার মত সহজ ছিল না। তখন এখনকার মত দেশলাই ছিল না। গৃহস্থের গৃহের সকল কাজ শেষ হইলে, মাল্সায় আগুন, আর গন্ধকের দেশলাই, সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষিত হইত, লোকে অগ্নি সংযোগে গন্ধকের দেশলাই ধরাইয়া প্রদীপ জ্বালিত। অথবা চক্‌মকির পাথর হইতে অগ্নিকণা উৎপন্ন করিয়া, সোলার সাহায্যে আগুন প্রস্তুত করিয়া, প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করিত। কাজেকাজেই, বালকেরা প্রদীপ নিবাইয়া দিলে, শিবচন্দ্রকে প্রত্যেকবার, বহুপথ অতিক্রম করিয়া, বাড়ীর ভিতর হইতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিতে হইত। একদিন বালকেরা পণ করিয়া বসিল, তাঁহাকে কিছুতেই পড়িতে দিবে না। তিনিও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। ক্রমান্বয়ে তিনটিবার বালকেরা তাঁহার প্রদীপ নিবাইয়া দিল, তিনিও বার বার বাড়ীর ভিতর হইতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিতে লাগিলেন। এইরূপ বিড়ম্বনাগ্রস্ত হইয়াও তিনি একটিবার বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, কলহ না করিয়া, উত্তেজিত না হইয়া, শান্তভাবে পুনঃপুনঃ প্রদীপ জ্বালিয়া আনিতেছেন দেখিয়া, অবশেষে সকলেই পরাজয় মানিল এবং বলিল "তোমার পড়ায় যখন এত টান, তুমি পড়, আর আমরা প্রদীপ নিবাইয়া দিব না।" প্রবীণ ব্যক্তিরও সহিষ্ণুতার সীমা আছে, কিন্তু বালক শিবচন্দ্রের সহিষ্ণুতার সীমা ছিল না। বস্তুতঃ তিনি চিরজীবন সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতিমা ছিলেন। যাহারা বাল্যকালে শিবচন্দ্রকে এইরূপে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বহু বৎসর পরে, কোনও প্রয়োজন বশতঃ একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোন্নগরে গিয়াছিল। শিবচন্দ্রের আদর ও অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া ঐ হতভাগ্য পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি যে কুব্যবহার করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া সাতিশয় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়াছিল, এবং আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল "যদি বাল্যকালে বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া তোমার মত লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিতাম,

তাহা হইলে আমিও আজ তোমার ন্যায় এইরূপ সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারিতাম।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একঘরে সকল বালকের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। বালক শিবচন্দ্র, কিশোরবয়স্ক বালকগণের শতবিধ চপলতা, আমোদ আহ্লাদ ও অট্টহাস্যের মধ্যে বসিয়া, স্বতন্ত্র একটি প্রদীপের আলোকে, কিরূপে ধ্যানমগ্ন শুকদেবের ন্যায় আত্মস্থ হইয়া একাগ্রচিত্তে লেখাপড়া করিতেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

একালের ন্যায় সেকালেও, গৃহের বালকগণ সর্ব্বদাই ভ্রাতৃজায়াদিগকে সম্পর্ক সঙ্গত নানাপ্রকার পরিহাসের উৎপীড়নে বিব্রত করিত। রামনারায়ণের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও সে সুযোগ কখনও ছাড়িত না। বধূরা বালক দেবরদিগের উপর অনেক সময়ে বিরক্ত ও বিরূপ হইতেন, কিন্তু শিবচন্দ্র কখনও আপনার আচরণদ্বারা কাহারও বিরক্তি উৎপাদন করেন নাই। প্রবীণ রামনারায়ণ এই পরগৃহবাসী বালকের আচার, ব্যবহার ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া, তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। রামনারায়ণের অত্যাধিক স্নেহ প্রদর্শনের ফলে পরগৃহবাসী বালক শিবচন্দ্রের অবশিষ্ট সুখ সুবিধারও কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিল। বধূগণের কেহ কেহ গৃহের বালকগণের পরিবর্ত্তে পরের ছেলের প্রতি গৃহকর্ত্তার এতাদৃশ স্নেহ প্রদর্শনে কাতর ও ক্রমে ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িলেন। একটি ঘটনায় তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ঘটনাটি এই :— বধূদের একজন একদিন শিবচন্দ্রকে কর্ত্তার নিকট অপদস্থ করিবার মানসে তাঁহার প্রতিদিনের মুখ ধুইবার গুল গুঁড়ার স্থানে গোপনে মিশি রাখিয়া দিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র বুঝিতে না পারিয়া, গুলগুঁড়া ভ্রমে, সেই মিশি ব্যবহার করায় দন্তে ও অধর-ওষ্ঠে সেই মিশির দাগ লাগিয়া গেল। রামনারায়ণ পৌরজনবর্গের কাহারও দুষ্ট বুদ্ধিতে এবং শিবচন্দ্রের অনবধানতায় এরূপ ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া, বালকের শীলতায় সন্দেহ করিলেন এবং বিধিমত তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে ভাল মানুষটি বলিয়া জানিতাম, ভিতরে ভিতরে তোমার রীত চরিত্র মন্দ হইতেছে দেখিতেছি। এরূপ করিলে আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হইবে না।" বালক তিরস্কৃত হইয়াও কৃত অপরাধ ও তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। পরিশেষে বাড়ীর অন্যান্য পুরাঙ্গনাদের ইঙ্গিতে দর্পণে মুখ দেখিতে গিয়া যার পর নাই লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইলেন। সে কালে, বিলাসী যুবকেরা মুখের শোভা বৃদ্ধির মানসে মিশি ব্যবহার করিত। কাহার কৌশলে শিবচন্দ্র ভগ্নীপতিসদনে এরূপ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইলেন, তাহা তাঁহার বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না, কিন্তু তিনি অনিষ্টকারিণীকে কিছুই বলিলেন না এবং ভগ্নীপতির নিকটও আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহা প্রকাশ করিলেন না। আমরা সংসারে অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ ঈর্ষাশূন্য ও বিদ্বেষবর্জ্জিত সজ্জন অতি অল্পই দেখিয়াছি।

আমরা শিবচন্দ্রের হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কাহিনী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, উক্ত কলেজ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ক ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি। যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিমণ্ডিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ইংরাজের প্রভু-শক্তি এদেশে স্থাপিত হইবার বহু বৎসর পর পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজপুরুষেরা সেই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টাই করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করাই সে সময়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের প্রধান লক্ষ্য ছিল; পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের বিস্তারে পাছে কোনওরূপ বিপ্লব ঘটে এবং উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায় উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকমণ্ডলীর শিক্ষায় হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদের চির প্রচলিত রীতিনীতি ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতেন। ইংরাজ-আধিপত্যের প্রথম যুগে দেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট আদৌ কোনওরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই। এ বিষয়ে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ই প্রথম পথ-প্রদর্শক—তিনি মুসলমান সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা রাজধানীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ইহার একাদশ বৎসর পরে, সংস্কৃত সাহিত্যচর্চ্চার জন্য, লর্ড কর্ণওয়ালিস কাশীধামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। দেশীয়দিগের প্রাচীন ও প্রামাণিক সাহিত্যচর্চ্চায় উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা, এবং হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে বিচারকার্য্য সম্পাদনে ইংরাজ বিচারকদিগের সহায়তার জন্য উপযুক্ত পণ্ডিত ও মৌলবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা,—এই দুই উদ্দেশ্যে উক্ত বিদ্যালয়দ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই লর্ড ওয়েলেস্লি “ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ” নাম দিয়া ইংরাজ- রাজপুরুষদিগকে দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ করিবার জন্য যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাও তাঁহাদের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, ইংরাজ ধর্ম্মযাজকগণ, প্রথম হইতেই, এদেশের লোকমণ্ডলীকে ইংরাজি শিক্ষা দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া অবিশ্রান্ত আন্দোলন করিয়াছিলেন। অবশেষে সেই আন্দোলনের ফলে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে, ইংলণ্ডেশ্বর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের মেয়াদ বিংশতি বৎসরের জন্য বাড়াইয়া যে নূতন চার্টার বা সনন্দ প্রদান করেন, তাহার একটি ধারায় এই ব্যবস্থা করা হইল যে, “ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিসাধন, দেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলীকে উৎসাহ প্রদান এবং দেশীয়দিগের মধ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানপ্রচার, এই সকল উদ্দেশ্যে কোম্পানি বাহাদুরকে প্রতি বৎসর ন্যূনকল্পে লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।” এই যৎসামান্য সদ্ব্যয়ে যেটুকু উপকারের আশা করা যাইতে পারিত, তাহাও লব্ধ হয়

নাই। সাধারণ দেশীয় শিক্ষায় ব্যবহৃত না হইয়া, বহুবৎসর উক্ত অর্থ সংস্থানের কিয়দংশ মুসলমান মৌলবী ও হিন্দু পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতরিত হইত এবং অবশিষ্ট অংশ সঞ্চিত হইত!!!

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, নেপাল যুদ্ধাবসানের অল্পকাল পরে, উদারচেতা লর্ড হেষ্টিংস্ ঘোষণা করেন যে, শিক্ষাদ্বারা প্রজাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিলে তাহার রাজার তাদৃশ বশবর্ত্তী থাকিবে না, এই ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ মতের প্রভাব তাঁহার শাসন কার্য্যে কখনও স্থান পাইবে না। এই মাহেন্দ্রযোগে, এদেশে সুশিক্ষার জন্মদাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ারের আন্তরিক যত্নে ও অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে হিন্দুসন্তানদিগের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার সুপ্রচার সাধনকল্পে তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড্ ইষ্ট মহোদয়ের ভবনে এক মহতী সভা আহূত হয়। এই সভায় বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক ও পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায় এই বৃহদনুষ্ঠানের মূলে ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন যে তাঁহার সংস্রব থাকিলে হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্মত নহে, তখন তিনি স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে দেশের হিতার্থ আপনাকে এই ব্যাপার হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হন নাই। সার্ হাইড্ ইষ্ট, সমাগত ভদ্রলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কি উদ্দেশ্যে তাঁহার আহূত হইয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের উপকারিতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। সভাস্থ ভদ্র মহোদয়গণ চাঁদার বহিতে নাম স্বাক্ষর করিয়া অনেক টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; যাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও অনেক টাকা দিবেন বলিয়া ব্যক্ত হইল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখে আর একটি সভা আহূত হয়। ঐ সভায় স্থির হইল যে হিন্দুবালকদিগের সুশিক্ষার্থ কলিকাতায় একটি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপিত হউক এবং গবর্ণর জেনারাল ও তাঁহার সভার সদস্যগণকে উক্ত কলেজের পৃষ্ঠপোষক হইতে, সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড্ ইষ্টকে উহার সভাপতি হইতে এবং সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান বিচারপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন সাহেবকে উহার সহকারী সভাপতি হইতে অনুরোধ করা হউক। উক্ত তারিখে একখানি পত্রে মহামতি সার্ হাইড্ ইষ্ট যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যভাবে উৎসাহ দিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু হিন্দু অনুষ্ঠাতারা তজ্জন্য কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হন নাই। আমরা এইজন্য উক্তপত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"যখন তাহাদিগকে [হিন্দু অনুষ্ঠাতাদিগকে] বলা হইল যে, ইংরাজি পদ্ধতি অনুসারে প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা পাছে তাহাদের বিশিষ্ট প্রকার ধর্ম্মমতে হস্তক্ষেপ করে, গবর্ণমেণ্ট এই আশঙ্কায় তাহারা যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার প্রকাশ্য

অনুমোদন আপাততঃ স্থগিত রাখাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন, তখন তাহারা অতীব বিচক্ষণতার সহিত উত্তর দিয়াছিল যে, উচ্চশিক্ষালাভে তাহাদের কোনও আপত্তি আছে, কোনও ভদ্র সাহেব যে এরূপ কল্পনা করিতে পারেন, ইহাতেই তাহারা আশ্চর্য্য বোধ করে; উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত্যবসরে যদি তাহারা এমন কিছু পায় যাহা তাহাদের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ, তাহা হইলে তাহারা উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে; তথাপি, ভদ্র সাহেবগণ যাহা কিছু শিক্ষা করেন, তাহারা তৎসমস্ত জানিতে ইচ্ছা করে—তন্মধ্যে যাহা ভাল বোধ করিবে ও পছন্দ করিবে, তাহাই তাহারা গ্রহণ করিবে। গবর্ণমেণ্টের নিকট সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ না পাইয়াও তাহারা যে এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পচ্যুত হয় নাই, ইহা হইতে হিন্দুদিগের প্রকৃত মনের ভাবের যেরূপ প্রবল পরিচয় পাওয়া যায় এমন আর কিছু হইতেই নহে। আমি আশা করি, যখন আমরা তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছা আরো উত্তমরূপে জানিতে পারিব এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতির শুভফলের প্রমাণসমূহ যখন স্তূপীকৃত হইতে থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে যে সকল কুসংস্কার বিদ্যমান আছে তৎসমুদয় দূরীভূত হইবে; বলিতে কি, আমাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও এ সম্বন্ধে যে কুসংস্কার আছে তাহা হিন্দুদিগের কুসংস্কারাপেক্ষাও বলবত্তর।”

হিন্দুকলেজের গঠনকালে কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একটি সমিতির সৃষ্টি হইয়াছিল; ৮ জন ইউরোপীয় ও ২০ জন দেশীয় ভদ্রলোক উহার অবৈতনিক সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ভিন্ন একজন ইউরোপীয় ও একজন দেশীয় বৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। লর্ড হেষ্টিংস্ প্রস্তাবিত বে-সরকারী কলেজের পৃষ্ঠপোষক (Patron) হইতে আপত্তি করেন নাই।

উক্ত সমিতির কয়েকটি অধিবেশনের পর, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২০শে তারিখে, সোমবারে, আপার চিৎপুর রোডের পশ্চিম পার্শ্বে গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে (যেখানে সম্প্রতি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে) মহাবিদ্যালয় বা হিন্দুকলেজ সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। তৎপরে, হিন্দুকলেজ, ক্রমান্বয়ে, চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের বাটীতে এবং জোড়াসাঁকোস্থ ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলেজের আর্থিক অনটন আরম্ভ হয় এবং ঐ অসচ্ছলতা ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শেষোক্ত বৎসরে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি, অর্থ সাহায্যের জন্য এবং কলেজের অবস্থানোপযোগী একখানি বাটীর জন্য, গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে বাধ্য হন।

পর বৎসরেও ঐরূপ আবেদন “জেনারাল্ কমিটি অফ্ পাবলিক্ ইনষ্ট্রক্শনের” অর্থাৎ সরকারী সাধারণ শিক্ষা-সমিতির নিকটে করা হইয়াছিল। তদনন্তর, গবর্ণমেণ্ট কলেজের সাহায্যকল্পে নিজব্যয়ে একজন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে এবং

অবস্থানোপযোগী একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। অবশেষে, সংস্কৃত ও হিন্দুকলেজের একত্রাবস্থানই ধার্য্য হইল, এবং গোলদীঘির উত্তরাংশে হেয়ার সাহেব প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকায় নির্ম্মিত নূতন বাটীতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে উভয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু কলেজের টাকাকড়ি জোসেফ্ ব্যারেটো কোম্পানির নিকট জমা থাকিত এবং সুদে খাটিত। উক্ত কোম্পানি দেউলিয়া হওয়াতে, আবার গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থসাহায্য চাহিতে হইল। গবর্ণমেণ্ট প্রার্থিত অর্থসাহায্য অবশেষে এই নিয়মে দিতে স্বীকৃত হইলেন যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত টাকার সদ্ব্যয় হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য সরকারী সাধারণ শিক্ষা-সমিতির পক্ষ হইতে কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ডাক্তার এইচ্, এইচ্, উইল্‌সন্ শেষোক্ত সমিতির একজন পদহেতুক (ex-officio) সভ্য ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থ তাঁহাকেও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত করা হইল; তিনি প্রতিদিন কলেজ পরিদর্শন করিতেন। শিবচন্দ্রের অধ্যয়নকালে হিন্দুকলেজ এইরূপ প্রধানতঃ বে-সরকারীভাবে পরিচালিত হইত এবং তখন উহা "এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান কলেজ" নামে খ্যাত ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, গবর্ণমেণ্ট হিন্দুকলেজের সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করেন এবং তদবধি উহার বে-সরকারীত্ব লোপ পায়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত বর্ত্তমান "হিন্দুস্কুল" হিন্দু কলেজের নিম্ন-বিভাগের এবং সেই সময়েই প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান "প্রেসিডেন্‌সি কলেজ" উক্ত কলেজের উচ্চ-বিভাগের, নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শিবচন্দ্র ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে, হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ছয় বৎসর পাঁচ মাস কলেজে কাটাইয়াছিলেন; কোন্ বৎসর কোন্ শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

ইং সাল	শ্রেণী	অধ্যয়নকাল
১৮২৫	সপ্তম (আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)	পাঁচ মাস
১৮২৬	পঞ্চম	এক বৎসর
১৮২৭	চতুর্থ	এক বৎসর
১৮২৮	তৃতীয়	এক বৎসর
১৮২৯	দ্বিতীয়	এক বৎসর
১৮৩০ ও ১৮৩১	প্রথম	* দুই বৎসর।
		মোট ছয় বৎসর পাঁচ মাস।

* এই দুই বৎসর শিবচন্দ্র মাসিক ষোল টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

এই তালিকা দৃষ্টে উপলব্ধ হইবে যে, শিবচন্দ্র কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া পাঁচ মাসের মধ্যেই এরূপ উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, সপ্তম হইতে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন।

তিনি প্রত্যেক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেন এবং পারিতোষিক পাইতেন। সেকালে হিন্দুকলেজের পারিতোষিক পুস্তকসমূহ আগাগোড়া চামড়া দিয়া সুন্দররূপে বাঁধান হইত এবং প্রত্যেক পুস্তকের মলাটে স্বর্ণাক্ষরে কলেজের ছাপ থাকিত। তখন কিরূপ পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া হইত, তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গের নিবারণার্থ কতিপয় পুস্তকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পুস্তকের নাম	কোন্ ইং সালে প্রদত্ত
Blair's Universal Preceptor Goldsmith's History of Rome	১৮২৭ (২৭শে জানুয়ারী)
Walker's Pronouncing Dictionary	১৮২৮
Adams's Astronomical and Geographical Essays	১৮২৯ (১৮ই ফেব্রুয়ারী)
Dugald Stewart's Elements of the Philosophy of the Human Mind 2 Vols. Dugald Stewart's Essays	১৮২৯ (১৩ই ফেব্রুয়ারী) দ্বিতীয় শ্রেণীর যে ছাত্র "নীতির উৎপত্তি" বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিবেন, ডিরোজিও সাহেব তাঁহার জন্য এই পারিতোষিক স্বয়ং দান করেন
Imison's Elements of Science and Art. (Natural Philosophy and Chemistry) 2 Vols. Miller's History of Great Britain	১৮৩১ (ফেব্রুয়ারী)
Nicholson's Popular Course of Pure and Mixed Mathematics, with Key 2 Vols.	১৮৩২ (১৬ই ফেব্রুয়ারী)

স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের রচিত হেয়ার সাহেবের জীবনীতে উক্ত সাহেব সম্বন্ধে শিবচন্দ্রের যে দুই একটি স্মৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটিতে তাঁহার ছাত্র-জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"আমি যখন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, তখন একদিন ঐ শ্রেণীতে বসিয়া আছি, এমন সময়ে হেয়ার সাহেব আসিয়া তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নব-প্রকাশিত ইংরাজি-বাঙ্গালা অভিধানের একখণ্ড আমাকে দিলেন। আমি ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, কেননা আমি কলেজের একজন বেতন-প্রদ ছাত্র ছিলাম এবং তাঁহার সহিত আমার তখন সামান্যই পরিচয় ছিল। আমাকে 'ঐ উপহার দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ভদ্রলোক আমাদের শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি ঐ পরীক্ষা যেরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সন্তোষের নিদর্শনস্বরূপ আমাকে ঐ পুস্তকখানি দিলেন। সেই অবধি তিনি আমার একজন বিশেষ শুভানুধ্যায়ী হইলেন। আমি তাঁহারই পরামর্শে একটি ছাত্রবৃত্তির জন্য আবেদন করি এবং তদর্থে পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করি।"

শিবচন্দ্র যখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার আর একজন পরম হিতকারী বন্ধু ও শিক্ষক লাভ হইয়াছিল। তিনি আর কেহই নহেন—সেই অসাধারণ প্রতিভাশালী, ছাত্রসুহৃদ, ফিরিঙ্গি যুবক-শিক্ষক ডিরোজিও, যিনি প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে, চারিবৎসর মাত্র হিন্দুকলেজে শিক্ষকতা করিয়া, এদেশে উচ্চশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ইতিহাসের সহিত তাঁহার অমর নাম চিরদিনের জন্য গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, হেন্‌রি লিউইস্ ভিভিয়ান্ ডিরোজিও সাহেব, হিন্দুকলেজের উপরিতন বিভাগে একজন সহকারী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, এবং পরবৎসর মার্চ্চ মাসে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষকত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি জাতি ও বর্ণে, কালা ফিরিঙ্গি ছিলেন, এবং কলিকাতায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই খানেই শিক্ষালাভ করেন। তিনি আকৃতিতে বালকের ন্যায় ছিলেন এবং আমরণ বালকের ন্যায় স্ফূর্ত্তিমান্ ও সরল হৃদয় ছিলেন; তাঁহার গণ্ডদ্বয় বালকের ন্যায় সুগোল ও স্ফীত ছিল; তাঁহার সুদীর্ঘ কেশদামে তিনি সোজা-সিঁথি কাটিতে ভালবাসিতেন; তাঁহার বিশাল ও প্রোজ্জ্বল নয়নযুগল তাঁহার প্রতিভার অব্যর্থ পরিচয় দিত। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল তারিখে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। এত স্বল্পায়ু হইয়াও তিনি "জঙ্ঘীরার ফকীর" (Fakir of Jungheera) নামে বাইরণী ছাঁচের একখানি কাব্য রচনা করিয়া তাঁহার অপরিণত ও অপরিমার্জ্জিত কবিত্ব-শক্তির সামান্য পরিচয় দিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এই যে, তিনি তাঁহার বাঙ্গালী ছাত্র-মণ্ডলীকে চিরপ্রচলিত কুসংস্কারের অন্ধতামস ভেদ করিয়া, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছিলেন, এবং নির্ভীকহৃদয়ে সত্যের অনুসন্ধান ও তদনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া, তাহাদের মানসিক ও নৈতিক জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন। এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইবার প্রভূত শক্তিও তাঁহার ছিল।

একদিকে যেমন তাঁহার ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, অপরদিকে তেমনি আবার তিনি সুলেখক ও সুকবি ছিলেন; আবার বিধাতার কৃপায় তিনি স্পর্শমণিসদৃশ অমূল্য হৃদয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীকে এতাদৃশ স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার সঙ্গকে একটা লোকদুর্ল্লভ সম্পদ বলিয়া মনে করিত। রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, কৃষ্ণমোহন, রামতনু, হরচন্দ্র,, রসিককৃষ্ণ, রাধানাথ, প্যারীচাঁদ, শিবচন্দ্র প্রভৃতি ছাত্রগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারা, যেমন তেমন লোকের কর্ম্ম নহে, একার্য্যে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও সহৃদয়তার প্রয়োজন; ডিরোজিও সেইরূপ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। বস্তুতঃ ডিরোজিওর ন্যায় সুদক্ষ, সত্যপরায়ণ ও সহৃদয় শিক্ষক একান্ত দুর্লভ। তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য—মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী—বিদ্যাবুদ্ধিতে গুরুর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু গুরুর সত্যনিষ্ঠা ও সহৃদয়তা পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিলেন এবং এই দুইগুণে "বঙ্গের আর্ণোল্ড" বা আদর্শ-শিক্ষক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়, স্বরচিত হেয়ার সাহেবের জীবনীতে, লিখিয়াছেন যে, ডিরোজিও নিয়মিত অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদনে এমন অমনোযোগী ছিলেন যে, একবার প্রধান শিক্ষক ডা'ন্‌সেলিম্‌ সাহেব ডিরোজিওর অধ্যাপনাকার্য্যের মাসিক বিবরণ পড়িয়া ক্রোধাবেগে তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিরোজিওর অধ্যাপনা-কার্য্যের পরিমাণ সাধারণ মাপকাঠিদ্বারা নির্ণেয় নহে। প্রকৃত শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান প্রচলিত জ্ঞানাপেক্ষা অনেক উচ্চতর ছিল। ছাত্রেরা ভালরূপ বুঝুক বা না বুঝুক, কতকগুলা জ্ঞানের আবর্জ্জনা প্রচলিত প্রথানুসারে তাহাদের মস্তিষ্কের উপর চাপাইতে পারিলেই শিক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হইল, ডিরোজিও কখনও এরূপ মনে করিতেন না; তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের চিন্তা-শক্তির বিকাশের চেষ্টা করিতেন; কারণ, এই শক্তির পরিস্ফুটনে জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ অতি সহজ ও সুগম হয়। এই উদ্দেশ্যে, তিনি অগ্রগামী ছাত্রদিগকে তাঁহার নিকটে আসিয়া মন খুলিয়া কথা কহিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন।

ছাত্রেরা টিফিনের সময়ে ও বিদ্যালয়ের ছুটির পর, বিদ্যালয়গৃহে, এবং অন্য সময়ে ডিরোজিওর বাটীতে মিলিত হইয়া, মুক্তহৃদয়ে তাঁহার সহিত সকল বিষয়ের আলোচনা ও আলোচ্য বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিত। এইরূপে স্বাধীনভাবে পরস্পরের চিন্তা-বিনিময় হইত, এবং প্রসঙ্গক্রমে অনেকগুলি পুস্তকও পঠিত হইত, যাহা এই উপলক্ষ না হইলে হয়ত কখনই পড়া হইত না; এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই কাব্য, দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে, "একাডেমিক এসোসিয়েশন" নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। মানিকতলায়, যে বাটীতে ওয়ার্ডস্‌ ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌ বহু বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই উদ্যান বাটীতে উক্ত সভার অধিবেশন

হইত এবং ডিরোজিওর সভাপতিত্বে, হিন্দুকলেজের উন্নত ছাত্রগণ কাব্য ও দর্শনাদি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও তর্কবিতর্ক করিত। একাডেমিক সভা এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, হেয়ার সাহেব সর্ব্বদা দর্শকরূপে সভায় উপস্থিত হইতেন। তৎকালীন সুপ্রীম্ কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এড্ওয়ার্ড্ রায়্যান্, গবর্ণর জেনেরাল্ লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট্ সেক্রেটারি কর্ণেল্ বেন্সন্, এড্জুটাণ্ট্ জেনেরাল্ কর্ণেল বীট্সন্ এবং বিশপ্স্ কলেজের সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ ডাক্তার মিল্স্ও মধ্যে মধ্যে সভায় উপস্থিত হইয়া সভ্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ এই সভাতেই প্রথম মুখ খুলিতে শিখেন।

ডিরোজিওর পরিচালনায়, হিন্দু কলেজের উন্নত ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "পার্থেনন্" (The Parthenon) নামে একখানি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ডাক্তার উইল্সনের আদেশানুসারে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত স্বাধীন চিন্তার ফলে, প্রায় প্রত্যেক উন্নত ছাত্রের গৃহে তুমুল বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ প্রায় সকলেই হিন্দুধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে লাগিল, এবং তাহাদের দেখাদেখি নিম্নশ্রেণীর বালকেরাও হিন্দুধর্ম্ম অনুষ্ঠানকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রোচ্চারণের পরিবর্ত্তে তাহারা হোমর-রচিত ইলিয়াড-কাব্য হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিত, এবং কেহ কেহ যজ্ঞোপবীত বর্জন করিয়া তৎকালীন হিন্দুসমাজে দারুণ বিভীষিকার উদ্রেক করিয়াছিল। ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায়, কোনও কোনও ছাত্রের অভিভাবক কলেজ হইতে ছাত্র ছাড়াইয়া লইলেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিব্রত হইয়া হুকুম জারি করিলেন যে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যেন এমন কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে না দেওয়া হয়, যদ্দ্বারা ছাত্রগণের হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিলীকৃত হইবার সম্ভাবনা। যদি কোনও শিক্ষক হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও কথা ছাত্রদিগকে বলেন অথবা তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর হিন্দু আচার বিরুদ্ধ পানাহারাদি কোনও কার্য্য করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত হইবেন। ছাত্রেরা কোনও রাজনৈতিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার সভায় উপস্থিত হইলে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিরাগভাজন হইবে। এই সকল হুকুম জারির পর, কিয়ৎ পরিমাণে বিপ্লবের শান্তি হইয়াছিল, কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে আবার গোলযোগ ঘটিল এবং অভিভাবকগণ কলেজ হইতে আবার ছাত্র ছাড়াইতে লাগিলেন। পরিশেষে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ডিরোজিওকে পদচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গত্যন্তর না দেখিয়া, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রেল তারিখে, ডিরোজিও কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন।

কলেজের সহিত সংস্রব ঘুচিয়া যাইবার পরেও, ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রগণের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিয়মিতরূপে

তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় ছাত্র, তিনি বিসূচিকা রোগে শয্যাশায়ী হইলে পর, অন্তিমকাল পর্য্যন্ত নিরতিশয় যত্নের সহিত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

যে সকল ছাত্র প্রতিনিয়ত ডিরোজিওর সঙ্গ-লোলুপ ছিলেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় নিজে একজন, এবং তিনি এই কয়জনের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক ও অমৃতলাল মিত্র।

শিবচন্দ্র, আত্মজীবনীতে এই কয়জন বন্ধু ও সতীর্থের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র ও হরিমোহন সেন।

প্যারীচাঁদ-প্রদত্ত ডিরোজিও-ভক্তের তালিকার সহিত শিবচন্দ্রের সতীর্থবন্ধুগণের তালিকা মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, শিবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ সকলেই ডিরোজিওর ভক্ত ছিলেন। গুরুর গুণে, বিভিন্ন প্রকৃতির শিষ্যগণ পরস্পরের সহিত একপ্রাণ হইয়া মিশিয়াছিলেন। ডিরোজিও শিবচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন এবং শিবচন্দ্রও তাঁহার সেই প্রথম বয়সের গুরুকে শেষ বয়সেও একদিনের জন্য ভুলেন নাই। আমরা কতবার তাঁহার মুখে ডিরোজিওর গুণকীর্ত্তন শুনিয়াছি—তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার কাব্যপ্রিয়তা, তিনি কিরূপে বাইরণের নব নব কাব্যের আবৃত্তি করিয়া, তাঁহার ছাত্রগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতেন,—ইত্যাদি বিষয়ক কত কথাই শুনিয়াছি! সে সকল কথার অধিকাংশই ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এইটি কখনও ভুলিব না যে, ডিরোজিওর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সেই বর্ষীয়ানের আনন্দোৎফুল্ল মুখে তরুণের উৎসাহজ্যোতি দেখা দিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিবচন্দ্র যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন "নীতির উৎপত্তি" বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া ডিরোজিওর নিকট দুইখানি দার্শনিক পুস্তক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পুস্তক দুইখানি তিনি চিরজীবন গুরুর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন যে, "উচ্চ মনোভাব শিক্ষক হইতে ছাত্রে যত সহজে সংক্রামিত হয়, এমন আর কিছুই নহে; কতবার দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রেরা অধ্যাপক বিশেষের জীবন্ত প্রভাবগুণে সকল প্রকার নীচ ও স্বার্থপর উদ্দেশ্যের প্রতি যে অবজ্ঞা বোধ করিতে শিখে এবং পৃথিবীর উন্নতি সাধনের যে উচ্চাভিলাষ পোষণ করিতে

শিখে, তাহা তাহাদের চিরজীবনের সাথী হয়।" শিবচন্দ্রের ভাগ্যে এইরূপ অধ্যাপকই যুটিয়াছিল।

কার্লাইল বলেন যে, কলেজে পড়ার একটি শুভফল এই যে, এখানে, পড়া যেমন তেমন হউক না কেন, অনেক নবীন আত্মার সহিত পরিচয় ও সংঘর্ষ হয় এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শিক্ষা। হিন্দুকলেজে শিবচন্দ্রের এই শিক্ষারও বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল; ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি যে সকল সহপাঠীর নামোল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইবে।

(১) হরচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮০৮—মৃত্যু ১৮৬৮ খৃঃ অঃ) যেমন কৃতবিদ্য, তেমনি সচ্চরিত্র ছিলেন; দেশীয়দের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ইনি পঞ্চদশ বৎসর কলিকাতা ছোট আদালতের জজ ছিলেন। ডিরোজিওর ভক্ত হইয়াও, ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।

(২) রসিককৃষ্ণ মল্লিক—হিন্দু কলেজের একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন; ইনি প্রথম বয়সে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন এবং কিয়ৎকালের জন্য "জ্ঞানান্বেষণ" নামে একখানি ইংরাজি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন করেন; শিবচন্দ্রের ন্যায়, ইনিও একজন সুযোগ্য ডেপুটি কালেক্টার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

(৩) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮১৩—মৃত্যু ১৮৮৫ খৃঃ অঃ) কুড়ি বৎসর বয়সে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন; বহুবৎসর বিশপ্‌স কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এবং কলিকাতার লর্ড বিশপের চ্যাপ্‌লেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন; গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি একাদশটি ভাষা জানিতেন; হিন্দু দর্শন শাস্ত্র ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকখানি পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক "ডি. এল." উপাধি পাইয়াছিলেন।

(৪) রামগোপাল ঘোষ (জন্ম ১৮১৫—মৃত্যু ১৮৬৮ খৃঃ অঃ) প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন এবং বাণিজ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা ইউরোপীয় বণিক্ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; রাজনৈতিক আন্দোলনে ইনি আমাদের একজন প্রথম পথপ্রদর্শক; গবর্ণমেণ্টও ইহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষাসমিতির (Council of Education) ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম বয়সে, ডিরোজিওর প্রভাবে, হিন্দু আচার ব্যবহারে বিশিষ্টরূপে অনাস্থা দেখাইয়াছিলেন।

(৫) রাধানাথ শিকদার (জন্ম ১৮১৩—মৃত্যু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ) গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় গ্রেট্ ট্রিগনমেট্রিক্যাল্ জরিপ (Great Trigonometrical Survey) বিভাগে বহুবৎসর বিশেষ সম্মান ও দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ইনি কর্ণেল (সার জর্জ) এভারেষ্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন;

আমরা শিবচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি যে, উভয়ে (সাহেব ও শিকদার) গভীর নিশীথে, একতাম্বুতে বসিয়া অতি দুরূহ গাণিতিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। ইংরাজি ১৮৫৪ সালে, ইঁহারই সহযোগিতায় স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্গমহিলাগণের পাঠার্থ, "মাসিক পত্রিকা" প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার এক খেয়াল ছিল যে, গোমাংসভোজী না হইলে আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিব না।

(৬) রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮১৪—মৃত্যু ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ) সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া লর্ড ক্যানিং ইঁহাকে অযোধ্যার জনৈক বিদ্রোহী ভূস্বামীর বাজেয়াপ্ত ভূমি-সম্পত্তি দান করেন এবং ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে, লোকহিতৈষিতা ও স্বদেশপ্রিয়তার পুরস্কারস্বরূপ, গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রাজোপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ইনি অযোধ্যার তালুকদার-সভার প্রথম সম্পাদক এবং লক্ষ্ণৌ নগরস্থ ক্যানিং কলেজের ও কলিকাতার বীটন স্ত্রী-বিদ্যালয়ের অন্যতম অনুষ্ঠাতা ছিলেন; শেষোক্ত বিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বাংশে আদর্শ চরিত্রের লোক না হইলেও, ইঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

(৭) রামতনু লাহিড়ী (জন্ম ১৮১৩—মৃত্যু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ) আদর্শ চরিত্র গুণে ও শিক্ষা-নৈপুণ্যে "বঙ্গের আর্ণোল্ড" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন; ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

(৮) প্যারীচাঁদ মিত্র (জন্ম ১৮১৪—মৃত্যু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) বঙ্গীয় উপন্যাস সাহিত্যের আদি পুস্তক "আলালের ঘরের দুলালে"র রচয়িতা; স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকারও ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তক—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইনি "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন", "বেঙ্গল সোশ্যাল সাইয়েন্স এসোসিয়েশন", "পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারিণী সভা" প্রভৃতি বিবিধ সভা স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং সাধারণ হিতকর নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল। ইনি একসময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

(৯) হরিমোহন সেন—বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান রামকমল সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র; পিতার মৃত্যুর পর, ইনি ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কিয়ৎকালের জন্য গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারির দেওয়ানিও করিয়াছিলেন; পরিশেষে, ইনি জয়পুরাধিপতি মহারাজাধিরাজ রামসিংহের প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অতীব দক্ষতায় সহিত উক্তপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জয়পুরে বাঙালির প্রতিপত্তি ইঁহার আমলে আরম্ভ হইয়া অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। শিবচন্দ্র, তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে লিখিয়াছন—"বাবু হরিমোহন সেন আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন; তিনি আমার অনেক উপকার করিয়াছিলেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী। যখন আমরা কলেজে পড়িতাম, তখন হরিমোহন

ও আমি, উভয়ে মিলিয়া, আরব্য উপন্যাসের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম।"

বস্তুতঃ আমরা শিবচন্দ্রের সতীর্থ বন্ধুগণের মধ্যে যে কয়জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতিগত বা চরিত্রগত বৈষম্যের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রও একরূপ ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন নব-প্রবর্ত্তিত উচ্চশিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। এই বৈষম্যের ভিতর দিয়া সাম্যের উদ্বোধন বড় সামান্য শিক্ষা নহে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইং ১৮২৮ সালে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী-লেখক, এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব, ঐ বৎসর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ উক্ত দুই বিষয়ের কি কি পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করিত, তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। তৎকালীন হিন্দু কলেজে সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষার কিরূপ প্রসার ছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমরা সেই তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

Goldsmith's History of Greece, Rome and England.
Russell's Modern Europe.
Robertson's Charles the Fifth.
Gay's Fables.
Pope's Homer's Iliad and Odyssey.
Dryden's Virgil.
Milton's Paradise Lost.
Shakespeare, one of the Tragedies.

শিবচন্দ্রের সহাধ্যায়ী রাধানাথ শিকদার মহাশয়ের লিখিত হিন্দু কলেজে গণিতাধ্যয়নের বিবরণ, ১২৯১ সালের কার্ত্তিক মাসের "আর্য্য দর্শনে" প্রকাশিত হইয়াছিল; আমরা উহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

1828 Euclid, Bk. I., props. 29.
1829 Euclid, Bks. I to IV., and Algebra up to Quadratic Equations.
1830 Euclid, Bk. VI., Fluxions, Maxima and Minima, Tangents, Rectifications, Quadrations.
1831 Whole of Euclid's Elements, Spherical Trigonometry, Fluxions, Taylor's and Maclaurin's Theorems, Kepler's Problems.
1832 Winahouse's Analytical Trigonometry, Jepson's Fluxions, Lagrange's Theorem, Windhouse's Astronomy.

শিকদার মহাশয় ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহাও উক্ত মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম, এবং ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের জন্য, মূলের ভাবার্থ বঙ্গভাষায় প্রকটিত করিলাম :—

"Mr. Derozio was a very kind and indulgent teacher; and though often vain of his attainments, was nevertheless a learned man. He first taught us (the whole class) the object and end of knowledge, an information which cannot be too highly valued; and implanted that ambition of literary fame in my bosom which I am glad to affirm directs and actuates all my efforts even to this day. He first directed my metaphysical studies and gave us those moral and liberal principles which I hope will ever influence my actions. Cut off in the prime of prime, amidst innumerable projects for the reformation of India, his untimely death must ever be a matter of regret; and it may be safely affirmed also that he has been the cause and the sole cause of that spirit of enquiry after truth, and that contempt of vice, which are so fashionable among the enlightened portion of the community, and which cannot but be beneficial to India."

"ডিরোজিও সাহেব বড় দয়ালু ও ক্ষমাশীল শিক্ষক ছিলেন। তিনি অনেক সময়ে বিদ্যার অভিমান করিতেন বটে, কিন্তু বাস্তবিকই সুবিদ্বান্ ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে (অর্থাৎ আমাদের সমগ্র শ্রেণীকে) জ্ঞানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তাহা শিখাইয়াছিলেন—এ শিক্ষার মূল্য নাই। আমি সানন্দে ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি যে, সাহিত্যিক খ্যাতিলাভের যে উচ্চাভিলাষ দ্বারা আমার সকল চেষ্টা অদ্যাবধি পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত, সেই উচ্চাভিলাষের বীজ তিনিই আমাদের হৃদয়ে রোপণ করিয়াছিলেন। দার্শনিক তত্ত্বানুশীলনে তিনিই আমার প্রথম পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন, এবং তিনিই আমাদিগকে সেই সকল নীতিসঙ্গত ও উদার মূলমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাব, আমি আশা করি, আমার চিরজীবনের কার্য্যকলাপকে পরিচালিত করিবে। যে সময়ে তিনি ভারতে পুনঃ সংস্কারের অসংখ্য কল্পনায় ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে, নিতান্ত অল্প বয়সে, তাঁহার অকাল মৃত্যু সংঘটন, চিরন্তন পরিতাপের বিষয়। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সত্যানুসন্ধিৎসার ও পাপের প্রতি অবজ্ঞার প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, এবং যাহা হইতে ভারতের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী, তিনিই তাহার কারণ, এবং একমাত্র কারণ।"

সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগ বশতঃ শিবচন্দ্র একদিকে যেমন ডিরোজিওর একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন, অপরদিকে, গণিতশাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন বলিয়া, উক্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার টাইট্‌লারেরও তেমনি স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা শিবচন্দ্রের নিকট ডাক্তার টাইট্‌লার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছি। তিনি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু বড়ই ব্যস্তবাগীশ ছিলেন, এবং তাঁহার একটু বাতিকের ছিটও ছিল। শিবচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যখন প্রস্রাব করিতে যাইতেন, তখনও তাঁহার দুই কক্ষে দুইখানি প্রকাণ্ড পুস্তক থাকিত—পাছে একমুহূর্ত্ত

সময় নষ্ট হয়!! ডাক্তার টাইট্‌লার শিবচন্দ্রের সুন্দর হস্তাক্ষরের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; একবার তাঁহার অনুরোধে, শিবচন্দ্র একখানি পুস্তকের—পুস্তক কি নোটবুক, আমাদের ঠিক স্মরণ নাই—প্রতিলিপি, রোমান অক্ষরে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের হস্তলিপি—কি বাঙ্গালা কি ইংরাজি—কি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে বাস্তবিকই বড় পরিষ্কার ও সুন্দর ছিল; তিনি যখন যে কাজ করিতেন, তাহা যত্নপূর্ব্বক ও নৈপুণ্যের সহিত করিতে ভাল বাসিতেন। আমরা তাঁহার কলেজের নোটবুকগুলিতে একটি কালীর দাগ ও সংশোধনের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাই নাই; সকলগুলিই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কলেজে অধ্যয়নের শেষ দুইবৎসর, শিবচন্দ্র মাসিক ১৬্ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সেই ১৬্ টাকা হইতে তিনি মাস মাস পাঁচ টাকা করিয়া পিতাকে দিতেন; গুরুদেবকে আট আনা, পুরোহিত ঠাকুরকে চারি আনা, এক নিঃস্ব মাতুলানীকে আট আনা, পত্নীকে এক টাকা এবং সহোদরাকে জলপানি বলিয়া আট আনা দিতেন। প্রাপ্ত ১৬্ টাকা হইতে যাহাকে যাহা দিলে ভাল হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া, পরে নিজের অত্যাবশ্যক অভাবগুলির মোচন করিতে যাহা ব্যয় করা আবশ্যক, তাহা করিতেন, কিন্তু সে ব্যয় বিষয়ে আপনার আহারাদি কি পরিধেয় ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। একটি পয়সা কখনও অকারণে অনর্থক ব্যয় করিতেন না। বেশভূষা বা আমোদপ্রমোদে কখনও সামান্য অর্থও ব্যয় করিতেন না। বৃত্তির টাকা পাইয়া বালকদিগের হৃদয়ে যে সকল খেয়াল জাগিয়া উঠে, তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে সে সকলের বিরোধী ছিল; নিয়মিত মাসিক দান ভিন্ন, যখন যেখানে যাহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার আবশ্যক বোধ হইয়াছে, তখনই তাহা করিয়াছেন। বৃত্তির ১৬্টি টাকা লইয়া যে তরুণ বয়স্ক যুবক বিদ্যালয়ে পড়িতে পড়িতে এরূপ সুবিবেচনা সহকারে অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তিনি যে উত্তরকালের প্রচুর অর্থোপাৰ্জ্জন করিয়া বিপন্ন আত্মীয়গণের এবং আর্ত্ত ও দীন দুঃখী জনের অভাব মোচনের জন্য ও স্বদেশের বহুবিধ হিতসাধনের জন্য ব্যগ্র হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

শিবচন্দ্রের সতীর্থ বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে মদ্যমাংসের ভক্ত ছিলেন; মদ্যমাংস না খাওয়া তাঁহারা কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করিতেন। পল্লীবাসী শান্তস্বভাব শিবচন্দ্র স্বভাবতই স্বল্পাহারী ছিলেন। প্রচুর পরিমাণ আহার, কিম্বা মাংস প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য আকণ্ঠ ভোজন করা, তাঁহার অভ্যাস ছিল না। কোনওরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাও তাঁহার প্রকৃতিসঙ্গত ছিল না, সুতরাং তিনি সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবর্ত্তক সুরাপানের কখনও পক্ষপাতী হন নাই।

শিবচন্দ্রের বন্ধুবর্গের মধ্যে যাঁহারা পানদোষে দুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মজ্‌লিসে

তিনি কখন কখন উপস্থিত হইলে, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না যে, তিনিও দুই এক গেলাস পান করেন নাই। তিনি এমন সামাজিক ছিলেন যে, সুরাপান না করিয়াও, তাঁহাদের সঙ্গে সমান আমোদ আহ্লাদ করিতে পারিতেন। তাই কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন,--"আমরা আমোদের জন্য খাই, আর তুমি না খেয়েই আমাদের সঙ্গে সমান মাতাল!"

একবার কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া সুরাপানের জন্য শিবচন্দ্রকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন। শিবচন্দ্র অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াও সহজে বন্ধুগণের হস্তে নিস্তার পান নাই। তাঁহাকে একবিন্দু সুরা বলপূর্ব্বক পান করাইবার আয়োজন হইল। দুর্ব্বলদেহ শিবচন্দ্র, বলশালী ও প্রমত্ত বন্ধুদের সমক্ষে দৃঢ়তাসহকারে বারবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াও অব্যাহতি পাইলেন না, কিন্তু তাঁহারা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে শয়ন করাইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার মুখে সুরা ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। প্রবল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ও দৃঢ়চিত্ত শিবচন্দ্রকে কিছুতেই বন্ধুরা সুরাপান করাইতে পারেন নাই।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে, শিবচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তৎকালে তিনি কলেজ হইতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি সূচক যে নিদর্শন পত্র পাইয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি ও অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

No. 69 Anglo-Indian College.

These are to certify that Sib Chandra Dey has studied in the Anglo-Indian College for a period of six years 5 ms, that at the time of quitting College he was in the First Class, that he has acquired very considerable proficiency in the English language and Literature and in the Elements of General Knowledge and that his Conduct has been satisfactory.

G. T. F. Speed, B.D.
Head Master

H. H. Wilson
Visitor

Calcutta,
The 18th February, 1832

Chunder Kumar Tagore
Radamadub Banerjee
Russomoy Dutt
David Hare
Ramcomul Sen
Prosunno Comar Tagore
Radha Kant Deb
Managing Committee

সংখ্যা ৬৯। **এঙ্গ্‌লো ইন্ডিয়ান কলেজ।**

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, শিবচন্দ্র দে ছয় বৎসর পাঁচ মাসকাল এঙ্গ্‌লো ইন্ডিয়ান কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কলেজ পরিত্যাগ করিবার সময়ে

তিনি প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন, তিনি ইংরাজি ভাষায় ও সাহিত্যে এবং সাধারণ জ্ঞানের মূলতত্ত্বে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার আচরণ সন্তোষজনক ছিল।

জি. টি. এফ. স্পীড, বি.ডি.
প্রধান শিক্ষক

এইচ. এইচ. উইল্‌সন
পরিদর্শক।

কলিকাতা
১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩২

চন্দ্রকুমার ঠাকুর
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
রসময় দত্ত
ডেভিড হেয়ার
রামকমল সেন
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
রাধাকান্ত দেব
কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি

এতদ্ভিন্ন, কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার সাহেব শিবচন্দ্রকে স্বতন্ত্র প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। আমরা সেই দুইখানিরও সানুবাদ প্রতিলিপি প্রদানপূর্ব্বক এই দীর্ঘ পরিচ্ছেদ শেষ করিলাম :—

I hereby certify that Shiva Chandra Deva was an attentive student in my class of Natural Philosophy including Chemistry in which he made considerable progress while under me for nearly three years before he left the Hindu College in December 1831, and I have reason to believe that he has since kept up his acquaintance with these subjects, since he quitted the College.

David Ross
Professor of Natural & Experimental
Philosophy in the Anglo-Indian or
Hindu College of Calcutta

Calcutta
24th April 1835

আমি এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, শিবচন্দ্র দেব আমার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রসায়ন বিদ্যার শ্রেণীতে একজন অভিনিবেশশীল ছাত্র ছিলেন; ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রায় তিন বৎসর আমার অধীনে থাকিয়া তিনি ঐ দুই বিষয়ে বিশিষ্টরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন; এবং আমার সমূলক বিশ্বাস এই যে, কলেজ ছাড়িবার পরেও তিনি উক্ত দুই বিষয়ের চর্চ্চা রাখিয়াছিলেন।

ডেভিড রস্
কলিকাতার এঙ্গ্‌লো ইন্ডিয়ান বা
হিন্দু কলেজের প্রাকৃতিক ও পরীক্ষামূলক
বিজ্ঞানের অধ্যাপক

কলিকাতা
২৪শে এপ্রেল, ১৮৩৫

ANGLO-INDIAN COLLEGE.

These are to certify that Baboo Shiva Chunder Deva was educated in the Hindoo College where he was a student for several years during which time he conducted himself with the greatest propriety. I have known him for many years and am happy to say that in my opinion he is a very steady well-behaved youngman of excellent acquirements.
22nd April, 1835 David Hare

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, বাবু শিবচন্দ্র দেব হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; তিনি যে কয় বৎসর সেখানকার একজন ছাত্র ছিলেন, তাঁহার আচরণ নিরতিশয় শিষ্ট ছিল। তিনি আমার বহু বৎসরের পরিচিত, এবং আমি বলিতে আনন্দ বোধ করিতেছি যে, আমার বিবেচনায় তিনি একজন অতি ধীর, সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত যুবক।
২২শে এপ্রিল, ১৮৩৫। ডেভিড হেয়ার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহ ও পত্নীর শিক্ষাসম্পাদন

তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে, ব্রজকিশোর দেব মহাশয়, শিবচন্দ্রের কিঞ্চিদূন পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে (বাং ১২৩৩ সালের বৈশাখ মাসে) তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী গোপালনগর গ্রামনিবাসী সম্পন্ন গৃহস্থ বৈদ্যনাথ ঘোষ মহাশয়ের নবমবর্ষীয়া দ্বিতীয় কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। দেবীপক্ষে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, কন্যার পিতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—"অম্বিকা"; কিন্তু তাঁহার জন্মলগ্নে চন্দ্রগ্রহ ছিল বলিয়া, পিত্রালয়ে তাঁহাকে সকলে "লগনচাঁদা" বলিয়া ডাকিত। বিবাহের সময় তাঁহার বয়স, প্রকৃতপক্ষে, অষ্টমবর্ষ ছিল; কিন্তু জোড় বৎসরে বিবাহ দিতে নাই বলিয়া, মাতৃগর্ভবাসের কয় মাস ধরিয়া নবমবর্ষ গণনা করা হইয়াছিল। অম্বিকার পিতা বৈদ্যনাথ ও মাতা ভৈরবী আদর্শ হিন্দু-দম্পতি ছিলেন। উভয়ে মিলিত হইয়া দিবসের অধিকাংশ সময় জপ-তপঃ-পূজার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতেন। ভৈরবীর পিতা অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ধনীর সন্তান হইয়াও ভৈরবীর করুণাপ্রবণ হৃদয় সর্ব্বদাই দরিদ্রের দুঃখে ব্যথিত হইত। তাঁহার দয়ার একটি সুন্দর উদাহরণ আমরা তাঁহার কোমলহৃদয়া দুহিতার নিকট শুনিয়াছিলাম। পল্লীগ্রামে কোনও বাটীতে মহাপূজার অনুষ্ঠান হইলে, পল্লীর সমস্ত কুলকামিনীগণ, চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে, যথাসাধ্য বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। দয়াময়ী ভৈরবী এতদুপলক্ষে দরিদ্র প্রতিবেশিনীদিগকে নিজের এক একখানি বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিতে দিতেন এবং স্বয়ং প্রায় নিরাভরণা হইয়া প্রতিমার নিকট অঞ্জলিদানে চরিতার্থ হইতেন। পত্নীর মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে, বৈদ্যনাথ সংসারে বীতরাগ হইয়া সমস্ত বিষয় বৈভব রক্ষণাবেক্ষণের ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অর্পণ করিয়া বার্দ্ধক্যের প্রাক্কালেই কাশীধামে বাস করেন ও তথায় জীবনের শেষভাগ কেবল ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করেন। এরূপ পবিত্র আকরে জন্মগ্রহণ করিয়া অম্বিকা

উত্তরকালে যে অনন্যসাধারণ গুণোপেত নারীরত্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

অম্বিকার শুভলগ্নে জন্ম হইলেও, তাঁহার জন্মকাল ঘোর বিপচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার ৪।৫ দিন পরে, প্রসূতি মুমূর্ষু হইয়া পড়েন এবং মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই ভাবিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করা হয়, কিন্তু তিনি সেযাত্রা রক্ষা পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আইসেন। গঙ্গাযাত্রার গোলমালে, অম্বিকার কনিষ্ঠাগ্রজ—মায়ের কোলের ছেলে—হারাইয়া যান এবং তজ্জন্য বাড়িতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। বিস্তর খোঁজ তল্লাসের পর দেখা গেল যে, গৃহের পোষা কুকুরটা ছাইগাদায় শুইয়া আছে এবং তাহার পার্শ্বে কি একটা নড়িতেছে। তখন সকলে আলো লইয়া সেখানে গিয়া দেখিলেন যে শিশুটি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে এবং কুকুরটা তাহাকে আগুলিয়া আছে। বলা বাহুল্য যে, ছেলে পাইয়া সকলেই অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। সে সময়ে বৈদ্যনাথ ঘোষ মহাশয় গৃহে ছিলেন না, বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তর গিয়াছিলেন। কন্যার জন্ম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সকল ঘটনার সংবাদ পাইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—"এই কন্যা অতি শুভক্ষণে লগনচাঁদে জন্মিয়াছে, ইহার পয়ে আমার আয় বাড়িয়াছে; তোমরা ইহার খুব যত্ন করিবে, আমি টাকা পাঠাইতেছি, ইহার গহনা গড়াইয়া দিবে।"

বৈদ্যনাথ ঘোষ মহাশয়ের তিন পুত্র ও চারি কন্যা সন্তান হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র দীর্ঘজীবী হইয়া সংসারধর্ম্ম করেন; মধ্যম পুত্র, পিতৃবিয়োগের পর, সংসার ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সিঙ্গুরের সম্ভ্রান্ত বসু-মল্লিক পরিবারে পরিণীতা হইয়াছিলেন; কনিষ্ঠা দুইজন অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্বিতীয়ার যখন মহাত্মা শিবচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়, তখন বর অতিশয় কৃশ ছিলেন বলিয়া বৈদ্যনাথ কন্যার অকাল বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া এ বিবাহে আহ্লাদ প্রকাশ করেন নাই। কন্যার জননীও পতিসন্নিধানে সরোদনে বলিয়াছিলেন,—"এমন রোগা ছেলের হাতে মেয়ে দিলে, এর অকাল বৈধব্যে আমায় চিরজীবন ভুগতে হবে।" তাঁহারা জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের প্রাণসমা দুহিতা সেই পুরুষসিংহের সহিত ৬৫ বৎসরকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাটাইবেন।

শিবচন্দ্রের বিবাহের পর যথা সময়ে ব্রজকিশোর দেব মহাশয় পুত্রবধূকে আপন আলয়ে আনাইলেন। তখন নববধূর বয়ঃক্রম একাদশ কি দ্বাদশ বৎসরের অধিক নহে। বিপত্নীক ব্রজকিশোরের সমস্ত গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত বহির্ব্বাটীতে পুরুষ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইত; অন্তঃপুরে তাঁহার মধ্যমা কন্যা শ্যামাসুন্দরী—যিনি সধবা হইয়াও চিরদিন পিত্রালয়ে বাস করিতেন—ভ্রাতৃজায়াদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং পিতা,

ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য আত্মীয়গণের আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন।

সেকালে এই বঙ্গদেশে কোনও ভদ্রপরিবার "কেনা ভাত" খাইতেন না; সুতরাং বাটীর বধূগণকেই পর্য্যায়ক্রমে রন্ধন করিতে হইত। ব্রজকিশোরের চারি পুত্রবধূর মধ্যে দুইজন বয়ঃস্থা ছিলেন এবং প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকেই পালাক্রমে শ্বশুর মহাশয়ের বৃহৎ পরিবারের উপযোগী অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে হইত। ব্রজকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরবচন্দ্রের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নবাগতা স্ত্রী, উভয়েই বালিকা ছিলেন বলিয়া, প্রথমতঃ শাক তণ্ডুলাদি ধোয়া, পরিবেশন করা, দুই একটি তরকারি প্রস্তুত করা, ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদিগকেও পালাক্রমে সমস্ত রান্নাই করিতে হইত। এই সময়ে দেব মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ এরূপ কৃশ ও ক্ষুদ্রকায় ছিলেন যে, রন্ধন করিতে বসিলে চুল্লী ও তদুপরিস্থিত প্রকাণ্ড ভাতের হাঁড়ির ব্যবধানবশতঃ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী লোক তাঁহাকে দেখিতে পাইত না; অন্ন প্রস্তুত হইলে, চুল্লী হইতে হাঁড়ী নামাইবার জন্য তাঁহাকে অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইত। দেব মহাশয়ের বৃহৎ সংসারে যে বধূটি যে সময়ে পালার রান্না করিতেন, অনেক সময় তিনি উদর পুরিয়া আহার করিতে পাইতেন না; এত লোকের আহার যোগাইতে যোগাইতে অকুলান পড়িলে আবার রাঁধিবার অবকাশ থাকিলেও সুবিধা হইত না, কারণ, সরকারী ভাণ্ডার বহির্ব্বাটীতে; কর্ত্তার আদেশমত দ্রব্যাদি লোক হিসাবে ওজন করিয়া প্রতিদিন যাহা ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া ভিতরে পাঠান হইত, তাহার মধ্যে কিয়দংশ ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়া অবশিষ্ট যাহা মধ্যমা কন্যা গৃহিণী শ্যামাসুন্দরীর হাতে পঁহুছিত তাহাই তিনি রাঁধিতে দিতেন—ইহার উপর আবার উপরি লোকও আসিয়া আহার পাইত; বিশেষতঃ রাত্রে আগন্তুক আসিলে, তত রাত্রে আবার ভাণ্ডার খুলিবার জন্য গৃহকর্ত্তাকে কে বিরক্ত করিবে? এই সকল কারণে অনেক সময় রন্ধনকারিণী বধূটি সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া নিজে হাত ধুইয়া রন্ধনশালা হইতে বাহির হইতেন, ননন্দা জানিতে পারিলে দুটি জলপান থাকিলে আঁচলে দিতেন, বধূটি তাহাই খাইয়া এবং এক পেট জল পান করিয়া নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতেন। শিবচন্দ্রের বালিকা পত্নীর ভাগ্যে এরূপ অনশনে নিশিযাপন অনেকবার ঘটিয়াছিল, ইহা আমরা তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি।

শিবচন্দ্র যখন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখন তিনি প্রতি শনিবারে বাটী আসিতেন; সেই সময় হইতেই তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। স্ত্রী যে সজীব ক্রীড়নক বা উপভোগের বস্তু নহেন, তিনি

যে স্বামীর জীবন-ব্রতের প্রধান সহায় এবং তাঁহার প্রত্যেক মহদনুষ্ঠানের ও উচ্চচিন্তার তুল্যাংশভাগিনী, শিবচন্দ্র প্রথম যৌবনেই ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি অপর দশজনের ন্যায় তাঁহার বালিকা স্ত্রীর সহিত কেবল প্রণয়ালাপ করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। প্রথম পরিচয়েই তিনি তাঁহার অশিক্ষিতা পত্নীকে লেখাপড়ার উপকারিতা বুঝাইয়া দেন এবং তিনি লেখাপড়া শিখিলে তাঁহার স্বামী তাঁহার উপর কতদূর সন্তুষ্ট হইবেন তাহাও ব্যক্ত করেন। বুদ্ধিমতী বালিকা প্রধানতঃ স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতে সম্মত হইলেন। শিবচন্দ্রও সানন্দে পত্নীর শিক্ষা সম্পাদনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সে কালে স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ বিঘ্নসঙ্কুল ব্যাপার ছিল, বর্ত্তমানকালে আমরা তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। প্রথম ও প্রধান বিঘ্ন এই যে, সে সময়ে স্ত্রীলোকের বর্ণজ্ঞান লাভ নিরতিশয় সংস্কার বিরুদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, লেখাপড়ার চর্চ্চা সীমন্তিনীদের সীমার বাহিরের ব্যাপার; সিঁতার সিন্দুর বা হাতের খাড়ু বজায় রাখিতে হইলে, বিদ্যাশিক্ষার ত্রিসীমানায় পদার্পণ চিন্তা স্বপ্নে ও কল্পনাতেও নিষিদ্ধ কার্য্য। লোকের এই বিশ্বাস ছিল যে, যে কেহ এই নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম করিবে, অচিরে তাহার বৈধব্যদশা সংঘটিত হইবে। বোধ হয় কোথাও কোনও হতভাগিনীর এইরূপ পরিণাম দর্শনে, লোকের মনে ঐরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই সংস্কার উপেক্ষা করিয়া, গুরুজন পরিবেষ্টিত গৃহে, স্বামীর অভিপ্রেত পথে বালিকা স্ত্রীর পদার্পণ, যে কিরূপ সাহস ও আনুগত্যের প্রমাণ প্রদান করিতেছে, তাহা এখনকার দিনে অনুভব করিতে পারা কঠিন। অসীম সাহস ও দৃঢ় আনুগত্য ভিন্ন, বালিকা বধূর পক্ষে প্রচলিত সংস্কার ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করা, কোনও মতেই সম্ভবপর হইত না। শিবচন্দ্রের বালিকা পত্নী এইরূপ অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় পিতৃগৃহে অবস্থানকালেই দিয়াছিলেন; আমরা, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাঁহার বাল্যজীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। একবার তিনি কোনও সমবয়স্কার সহিত হারজিতের বাজি রাখিয়া প্রায় ২৫।৩০ হাত দীর্ঘ, একখানি ইটের, সঙ্কীর্ণ পরিসর প্রাচীরের উপর দিয়া মৃদু পাদবিক্ষেপে চলিয়া তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। গমনকালে, উক্ত বয়স্যা, ভয়বিহ্বলা হইয়া বারবার চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল "পড়্লোরে! গেলরে! ম'লোরে!", কিন্তু তিনি কোনও দিকে দৃষ্টিপাত বা কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, ধীরে ধীরে একটি পায়ের পর আর একটি পা ফেলিয়া চলিয়া গিয়া শ্রান্তি বোধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একবারও টলেন নাই। ঠিক সেইরূপে, তিনি সকল কুসংস্কার, গঞ্জনা ও লাঞ্ছনাকে উপেক্ষা করিয়া, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত স্বামীর অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্ট পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর

হইয়াছিলেন—ক্ষণকালের জন্যও সেই পথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার স্বামীকেও স্বজনবর্গ এই সূত্রে অল্প বিস্তর পরিহাস ও বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

সে কালে স্ত্রীশিক্ষার আর একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক এই ছিল যে, দিবাভাগে বধূরা শ্বশুরগৃহের পাকশালা অঞ্চলে থাকিতেন। দিনের বেলা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার অপেক্ষা নিন্দার বিষয় আর কিছুই ছিল না। রাত্রিকালেও যুবকেরা শয়নকক্ষে স্ত্রীর সহিত অস্ফুটস্বরে কথা না কহিলে, নিন্দার ভাগী হইত। রাত্রিতে স্বামীর শয়নকক্ষে স্ত্রীর প্রবেশকালে প্রদীপের আলোক থাকাও নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় ছিল।

এমন অবস্থায় শিবচন্দ্র ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, প্রথমতঃ তাঁহার বালিকা স্ত্রীর বর্ণপরিচয়ার্থ একখণ্ড বৃহৎ কাগজে সমগ্র বর্ণমালা লিখিয়া শয়নকক্ষের দেওয়ালে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। আর গোপনে কলিকাতা হইতে মোমবাতি আনিয়া শয়ন গৃহের নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিতেন। বাতি জ্বালিবার জন্য স্ত্রীর প্রতি এই উপদেশ ছিল যে, সকল কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে পর, একটি প্রজ্বলিত সলিতা হাতে করিয়া শয়নাগারে আসিবেন। শিবচন্দ্রের নবীনা পত্নীর পক্ষে এরূপ সলিতা হস্তে শয়নকক্ষের দ্বার অতিক্রম করাও, ক্রমে নিন্দার কথা বলিয়া প্রচারিত হইল। কিন্তু তিনি শেষে বাধ্য হইয়া এই নিন্দাটুকু মাথায় লইয়া, সপ্তাহে সপ্তাহে স্বামীর নিকট দুই রাত্রি বাঙগালা বর্ণমালা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন এখনকার মত দেশলাই ছিল না, সুতরাং বাতি জ্বালিবার অন্য কোন সহজ উপায় ছিল না।

সপ্তাহে দুই রাত্রিতে শিক্ষালাভের কি সুযোগ হইতে পারে? তাহাতে আবার সারাদিনের পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া শিবচন্দ্রের বালিকা পত্নী প্রথম প্রথম প্রায়ই শয়নাগারে প্রবেশ করিবার অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িতেন, অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহাকে জাগরিত রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইত। যে দিন পূর্ব্ববর্ণিত সাংসারিক ব্যবস্থার দোষে বালিকা অভুক্তা থাকিতেন, সেদিন মুখে কিছু না বলিয়া কেবল দুই বাহুর কফোণি সঞ্চালন করিয়া স্বামী কর্ত্তৃক নিদ্রাভঙ্গের সকল চেষ্টা বিফল করিতেন; শিবচন্দ্র প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া নিদ্রাতুরতার আতিশয্য মনে করিয়া সে রাত্রি শিক্ষাদানে বিরত হইতেন। দিবাভাগে লেখাপড়ার কোনও সুবিধাই ছিল না। ব্রজকিশোর দেব মহাশয়ের একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেক লোক ছিলেন। পরিচর্য্যার ভার বধূগণেরই উপর ন্যস্ত ছিল। কাজে কাজেই সর্ব্বদা সময়ের অভাব হইত। কিন্তু পতিপ্রাণা নবীনা বধূ সকল কাজের ভিতরে এক একবার কোনও অছিলায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন এবং দেওয়ালে লম্বমান চিত্র দর্শনে নিজের নির্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস করিতেন। তাহার পর পাকশালায় পাককার্য্যের সময়, কেহ না

থাকিলে, পাক করিতে করিতে কয়লা দিয়া গৃহতলে বা উনানের গাত্রে অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেন। কাহারও সমাগম সঙ্কেত পাইলেই, লিখিত অক্ষরের উপর জল ঢালিয়া দিতেন। একদিন তাঁহার ননদ শ্যামাসুন্দরী অকস্মাৎ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃজায়াকে এইকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া বিস্তর লাঞ্ছনা করিলেন। পিতার আহারের সময় তাঁহাকে এই বিপদের কথা বলিলেন; কিন্তু তিনি ইহার শাসনের কোনও ব্যবস্থা করিলেন না—বরং বলিলেন, পুরাকালেও এদেশে বিদ্যাবতী নারী ছিলেন। ইহাতে শ্যামাসুন্দরী অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন; তিনি যখন তখন ভ্রাতৃজায়াকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "আর কোনো বউ ত তোমার মত নয়।" কালের কি কুটিলা গতি! উত্তরকালে এই শ্যামাসুন্দরীর একমাত্র তনয়া, প্রাতঃস্মরণীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, স্বামী-গৃহে ইংরাজি ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের বালিকা পত্নী, এইরূপ নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও, সপ্তাহকাল ধরিয়া স্বামীপ্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। সপ্তাহের পর শিবচন্দ্র বাটী আসিয়া নবীনা ভার্য্যার এতাদৃশ অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার আদেশ পালন ও কৃতকার্য্যতা দর্শনে পুলকিত হইয়া নূতন পাঠ দিতেন। এইরূপে বর্ণমালা ও যুক্তাক্ষর শিক্ষা শেষ হইলে, শিবচন্দ্র পড়িবার জন্য পুস্তকাদির ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং পূর্ব্ববৎ পড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন লেখাপড়ায় স্ত্রীর অনুরাগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আপনার চেষ্টায় জ্ঞানোন্নতি সাধন সহজসাধ্য হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন হইতে গোপনে ঐরূপ রাত্রিজাগরণ ও ক্লেশস্বীকার করিয়া বিদ্যাভ্যাস বন্ধ করিয়া দিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিবচন্দ্রের বালিকা ভার্য্যা প্রধানতঃ স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যা শিক্ষা করিতে স্বীকৃত হন কিন্তু যখন তিনি কথঞ্চিৎ বর্ণবিন্যাস করিতে শিখিলেন, তখন তাঁহার প্রবাসী স্বামীকে একদিন পত্র লিখিতে সক্ষম হইবেন, এই আশা তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইল, এবং এই আশাপ্রণোদিত হইয়াই তিনি প্রাণপণে লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তজ্জন্য সকল গঞ্জনা, লাঞ্ছনা ও কষ্ট নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। স্বামীকে পত্র লিখিবার সঙ্কল্প কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবেন, ইহাই অহরহঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে কালে, সময় এবং সমাজ এই কার্য্যে এতই প্রতিকূলতা করিত, যে স্বামীর সংবাদ বা পত্র পাইলে, তাহার উত্তর দেওয়াও এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এরূপ কঠিন কার্য্য, বোধ হয় স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কিছুই ছিল না। শিবচন্দ্র প্রবাস হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুস্পুত্র গিরীশচন্দ্রের নামে স্ত্রীকে পত্র পাঠাইতেন; গিরীশচন্দ্রের স্ত্রী সেই পত্র তাঁহার ছোট খুড়শ্বাশুড়ীকে

আনিয়া দিতেন। শিবচন্দ্রের নবীনা পত্নীর স্বামীকে পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইলে, গোপনে আল্‌তার রং করিয়া মস্‌লা বাঁধা কাগজে সম্মার্জ্জনীর কাঠির অগ্রভাগের সাহায্যে সে কার্য্য সমাধা করিতে হইত। তাহার পর হাতের চুড়িভাঙগা গালা গলাইয়া পত্র বন্ধ করিয়া গিরিশচন্দ্রের স্ত্রীকে দিতেন; তিনি আবার সেই পত্র তাঁহার স্বামীকে শিবচন্দ্রের নিকট পাঠাইবার জন্য সমর্পণ করিতেন। তখন এখনকার মত খাপের ব্যবহার ছিল না।

এইরূপে শিবচন্দ্রের গৃহিণীর প্রাথমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু তাঁহার শিক্ষার শেষ এইখানেই হয় নাই। তিনি এতাদৃশ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তৎকালীন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রায় কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার অপঠিত ছিল না; যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি অতি দুরূহ গ্রন্থ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা তিনি অবলীলাক্রমে পাঠ করিতেন। অসাধারণ মেধাপ্রভাবে তিনি এই সকল অধীত গ্রন্থের অনেকাংশ অতি প্রাচীন বয়সেও বিস্মৃত হন নাই; সমগ্র "শব্দাম্বুধি" অভিধান তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা এরূপ বলবতী ছিল যে, মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বেও তিনি আমাদিগকে কোনও সদ্‌গ্রন্থের সারমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে বলিতেন, এবং আমরা তাঁহার ইচ্ছামত কোনওরূপ সৎপ্রসঙ্গের উত্থাপন করিলে তিনি অতীব আগ্রহ সহকারে শুনিতেন। এই সময়ে তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন এবং সেই বর্ষীয়সীর মুখে তরুণীর নব উৎসাহ প্রতিভাত হইত।

বালিকাবয়সেই শিবচন্দ্রের পত্নী কিরূপ সদ্বিবেচনা ও নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শিবচন্দ্র কলেজে যে ১৬৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতেন, তাহা হইতে স্ত্রীকে ১৲ টাকা দিতেন; বালিকা ঐ টাকাটি নিজের সুখে ব্যয় না করিয়া, উহার প্রায় সমগ্রভাগ রুচিকর মশলা ক্রয়ে ব্যয় করিয়া রন্ধনের উৎকর্ষ সাধন ও পরিজনবর্গের তৃপ্তিবিধান করিতেন।

কলিকাতায় অবস্থানপূর্ব্বক অধ্যয়নকালের শেষভাগে শিবচন্দ্র সপ্তাহে সপ্তাহে শনিবারে বাটী গিয়া সোমবারের প্রাতঃকালে আবার কলিকাতায় আসিতেন। এই সময়ে শিবচন্দ্রের এক ভগ্নীপতি তাঁহাদের বাটীতে অবস্থান করিতেন। তিনি এরূপ অবিবেচক ছিলেন যে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া শিবচন্দ্রের শয়নকক্ষ অধিকার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেন। শিবচন্দ্র বাটী আসিয়া আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশাধিকার পাইতেন না। কিন্তু শিবচন্দ্র এরূপ নির্ব্বিরোধী ও নিঃস্বার্থ লোক ছিলেন যে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাটী আসিয়া নীরবে বাহিরের ঘরে বাস করিতেন, তবুও দুটি দিনের জন্য

আপনার শয়ন কক্ষটি পাইবার চেষ্টা করিতেন না। যে স্ত্রীর জ্ঞানোন্নতি ও উৎকৃষ্ট রীতিনীতির পরিপুষ্টি কল্পে তিনি দীর্ঘকাল এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, সপ্তাহান্তে বাটী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের একমাত্র স্থান আপনার শয়ন কক্ষটি পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরে যামিনী যাপন করিয়াছেন। ইহাতে স্বামী স্ত্রী উভয়ের কেহই ক্ষুণ্ণ, উত্ত্যক্ত, বিরক্ত বা বিষণ্ণ হইতেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজসেবা—প্রবাসে

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, গবর্ণমেন্ট, ভারতবর্ষীয় গ্রেট্ ট্রিগনমেট্রিক্যাল সার্ভে বিভাগের কর্ত্তা (Surveyor General) কর্ণেল এভারেষ্টকে, উক্ত বিভাগের গণনাকার্য্যে, অঙ্কবিদ্যায় সুশিক্ষিত কতিপয় বুদ্ধিমান্ যুবককে নিযুক্ত করিবার অনুমতি দেন। তদনুসারে, কর্ণেল এভারেষ্ট (হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ যাঁহার নামে আখ্যাত) হিন্দু কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার টাইট্লারকে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্য হইতে, উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত একজন যুবককে নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করেন। ডাক্তার টাইট্লার শিবচন্দ্রকে মনোনীত করিয়া, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের বিস্তর প্রশংসাসহ তাঁহার নাম কর্ণেল এভারেষ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। গবর্ণমেন্ট, গণনা কার্য্যের জন্য, একশত টাকা বেতনে একজন প্রধান গণনাকারী, ষাট টাকা বেতনে তাঁহার একজন সহকারী বা ডেপুটি, এবং চল্লিশ টাকা বেতনে ছয়জন গণনাকারী—এই আটটি পদ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কর্ণেল এভারেষ্ট শিবচন্দ্রকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি শেষোক্ত একটি পদ আপাততঃ ত্রিশ টাকা বেতনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না, এবং বুঝাইয়া বলিলেন যে, সার্ভে বিভাগের ঔপপত্তিক জ্ঞান তাঁহার সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত থাকিলেও, গণনাকার্য্যের ব্যবহারিক জ্ঞান ও নৈপুণ্য লাভ করিতে কিছুকাল লাগিবে; তিনি কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইতে পারিবেন তদনুরূপ পদোন্নতি হইবে, এই আশাও দিলেন। এভারেষ্ট সাহেবের এই মর্ম্মে ইংরাজি ভাষায় লিখিত মূল পত্রখানির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Baboo Shib Chunder Day.

Sir,

The Honorable the Vice-President in Council having authorized me to engage a certain number of talented young men, who have received

a mathematical education, for the purpose of carrying on the computation of the Great Trigonometrical Survey of India. I am induced by the high character which you bear to offer you a situation in that capacity.

You have already, I am told, made yourself master of the theory of my profession, but before you can be efficient as a computer, it will be necessary that you acquire a practical facility and readiness in the methods of calculating by the formulae which will be given to you.

The prospects which will be held out to you are shewn in the following statement of the Establishment which Government have authorized, vizt.

1 Principal Computer at Rs. 100.
1 Deputy Do at Rs. 60.
6 Computers each at Rs. 40.

but as your advancement will depend entirely on your qualifications, I shall not select any persons to fill the higher situations until I am fully assured of their superior claims.

Moreover, until you have attained an aptitude for computing, as your services will be of little value, I can only offer you a monthly salary of 30 Rupees in the outset, which will gradually be augmented as you improve.

I request your answer to this letter on Monday next.

Surveyor General's Office, The December, 1831 — Your obedient servant, Geo. Everest.

শিবচন্দ্র কর্ণেল এভারেষ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ইহার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে, শিবচন্দ্রের সহাধ্যায়ী রাধানাথ শিকদার মহাশয়ও ডাক্তার টাইট্লারের সুপারিশে ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ণেল এভারেষ্টের অধীনে, শিবচন্দ্রের ন্যায়, একজন গণনাকারীরূপে নিযুক্ত হন।

সার্ভেয়ার জেনেরালের আফিসে প্রবিষ্ট হইবার ছয়মাস পরে—১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে—শিবচন্দ্রের আর ১০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৪০৲ টাকা বেতনে উক্ত আফিসে প্রায় ছয় বৎসর কর্ম্ম করার পর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে, তদানীন্তন বোর্ড অফ রেভিনিউর সুপারিশে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে জরিপের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া রেভিনিউ সার্ভে (রাজস্ব জরিপ) বিভাগের অধীন বা নিম্নতন শাখায় কর্ম্ম পাইবার যোগ্য হইয়াছিলেন।

সার্ভেয়ার জেনারেলের আফিসে শিবচন্দ্র কিরূপ সন্তোষজনকরূপে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য, তিনি উক্ত আফিস পরিত্যাগকালীন যে প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি ও অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

This is to certify that Baboo Shiva Chundra Deva has been employed in the Office of the Surveyor General of India as a Computer on the establishment of the Great Trigonometrical Survey for upwards of six years, and I have much pleasure in saying that during the above period, he has conducted himself with great propriety and to my entire satisfaction.

Baboo Shiva Chundra Deva has been educated at the Hindu College, is a young man of great attainments, has a good knowledge of Survey and Astronomical Instruments, and of very respectable, modest and unassuming character; he is well qualified for any situation.

He resigned his situation in this department in consequence of his recent appointment as Deputy Collector in Cuttack.

Joshua De Penning,
Head Computer,
In charge of the Surveyor General's Office,
Calcutta, 6th March 1838

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, বাবু শিবচন্দ্র দেব ভারতবর্ষের সার্ভেয়ার জেনারেলের আফিসে, গ্রেট ট্রিগনমেট্রিক্যাল সার্ভের একজন স্থায়ী গণনাকারীরূপে, ছয় বৎসরের অধিককাল কর্ম্ম করিয়াছেন; এবং আমি বলিতে আনন্দ বোধ করিতেছি যে, উক্তকালে তাঁহার ঔচিত্যপূর্ণ আচরণে আমি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

বাবু শিবচন্দ্র দেব হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছেন; তিনি একজন কৃতবিদ্য যুবক; জরিপ ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত যন্ত্র সমূহের ব্যবহারে তিনি বেশ অভিজ্ঞ; এবং তাঁহার চরিত্র নিরতিশয় সম্মানার্হ, নম্র ও অনাড়ম্বর; তিনি যে কোনও উচ্চপদের সুযোগ্য।

তিনি সম্প্রতি কটকে ডেপুটিকালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া এ বিভাগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

জশুয়া ডিপেনিং,
প্রধান গণনাকারী
সার্ভেয়ার জেনারেলের আফিসের ভারপ্রাপ্ত,
কলিকাতা, ৬ই মার্চ, ১৮৩৮।

ডেপুটিকালেক্টার হইবার পূর্ব্বে, যে ছয় বৎসরকাল শিবচন্দ্র কলিকাতায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে ছয় বৎসর প্রতিদিন নৌকা করিয়া কোন্নগর হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতেন। তখন রেলের গাড়ীর কল্পনা এ দেশের লোকের চিন্তাপথে স্বপ্নেও

উদিত হয় নাই। সুতরাং সে কালে কলিকাতা হইতে কোন্নগর যাতায়াতের নৌকা ভিন্ন সহজ উপায় আর কিছু ছিল না। এই নৌকাপথে যাতায়াত সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়িত। অনেক সময়ে ঝড়-তুফানে নৌকা সকল জলমগ্ন হওয়াতে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। শিবচন্দ্রও একদা এক শনিবারের অপরাহ্লে নৌকাপথে বাড়ী আসিবার সময়ে, বাত্যাবিতাড়িত ভাগীরথীবক্ষে নৌকাসহ জলমগ্ন হইয়াছিলেন।

ঝড়ের আবির্ভাব দেখিয়া পরিজনবর্গ নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। বাটীর কেহ না কেহ, নিয়তই গঙ্গাতীরে ছুটাছুটি করিতেছেন। এইভাবে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। কিন্তু শিবচন্দ্রের কোনও সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না। অবশেষে বাটীর সকলে হতাশ হইয়া হাহাকারে গৃহ পূর্ণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাত্রি একটার পর, শিবচন্দ্র নগ্নপদে, সিক্তবস্ত্রে ও অবশ শরীরে, ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সদর বাটীর দ্বারে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন তাঁহার শরীরে একবিন্দু শক্তি নাই, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ঝড়ে বিপর্যস্ত হইয়া এবং নদীর তরঙ্গ-তুফানের সহিত সংগ্রামে অবসন্ন হইয়া, কোন্নগর হইতে বহুদূর দক্ষিণে নদীতটে নিক্ষিপ্ত হন। সেখানে নৌকার ও নৌকার দাঁড়ী মাঝির অনুসধান করিতে করিতে শেষ শক্তিটুকু ক্ষয় করিয়া, অবশেষে অপর সকলের প্রাণরক্ষায় সন্দিহান হইয়া একাকী রাত্রি একটার সময় উপরোক্ত অবস্থায় বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুক্তদ্বারে কেহ কেহ তখনও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দ্বারস্থ হইবামাত্র, তড়িতবেগে সে সংবাদ অন্তঃপুরে পৌছিল। তিনি সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ অগ্নির উত্তাপে বসিয়া শরীরের শৈত্য দুর করিলেন। নৌকার মাঝি ও বাহকগণের কে কোথায় পড়িয়াছে, কে আছে, কে নাই, সে সকলের কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবল তিনি যে পাদুকা ত্যাগ করিয়া এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ফেলিয়া নৌকার জলমগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, ইহাই তখন তাঁহার স্মরণ ছিল। তাহার পর নৌকা, নৌকার অন্যান্য যাত্রী এবং মাঝি ও বাহকগণের কি হইয়াছে, তাহা বলিতে পারিলেন না। তৎপরে তরঙ্গ-সংগ্রামে কি অবস্থায় কোথায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রথম প্রথম বুঝিতেই পারেন নাই। তৎপরে কিঞ্চিৎ বললাভ করিয়া, বহু কষ্টে, বহু পথ অতিক্রম করিয়া সেই অবস্থায় বাটী আসিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সংবাদ পাইলেন যে, মাঝি ও মাল্লারা কেহ মরে নাই এবং তাহারা তীরে উঠিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নৌকায় যে সকল দ্রব্য তিনি ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সে সকলগুলিই পাওয়া গিয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে, নৌকাসহ জলমগ্ন দ্রব্যগুলির অধিকাংশ লইয়া মাঝি ও মাল্লারা শিবচন্দ্রের বাটীতে নৌকাডুবির সংবাদ দিতে আসিয়া

শুনিল, ছোট কর্ত্তাও প্রাণে বাঁচিয়া আসিয়াছেন। তখন পরস্পরের জীবিত থাকার সংবাদে আনন্দের সীমা রহিল না। তখন প্রাপ্ত দ্রব্যগুলি তিনি দেখিয়া লইলেন।

সেকালে ডেপুটি কালেক্টারের নিয়োগ-পত্র কিরূপ রীতিতে লিখিত হইত, তদ্বিষয়ে ইংরাজিনবিশ পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা শিবচন্দ্র উক্ত পদে যে পত্রদ্বারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার অবিকল প্রতিলিপি দিলাম, কিন্তু উহার বিস্তৃত অনুবাদ অনাবশ্যক বোধে দিলাম না; যে অংশটুকু এই জীবনী-পাঠকমাত্রেরই জানা আবশ্যক, কেবল তাহাই ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বঙ্গভাষায় প্রকটিত করিব।

No. 318

To
Baboo Sibchunder Deb.
Sir,

I am directed to inform you that the Honorable the Deputy Governor of Bengal has been pleased to appoint you to be Deputy Collector in the Province of Cuttack under the Provisions of Regulation IX, 1833. Previously to entering upon the discharge of the duties of your office you will be pleased to make and subscribe before the Collector of the District to which you may be posted by the Commissioner, the solemn declaration required by Section XIX of the above-mentioned Regulation.

2. Your salary is fixed at Rs. 300 per month including Rs 50 for office establishment, but when employed in the Mofussil, you are authorized to draw an additional sum of Rs. 50 per month on the latter account.

3. The Honorable the Deputy Governor of Bengal trusts that you will discharge with zeal, uprightness and fidelity the duties of the high office to which you are hereby appointed, and that by the future uniform tenor of your conduct, you will prove yourself worthy of the confidence which has been reposed in you.

4. You will receive from the Collector of the District to which you may be posted the necessary instructions on taking charge of the duties to which you are appointed.

I am,
Sir,
Your Obedient humble servant,
F. Js. Halliday,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal

Fort William,
The 20th Feby. 1838

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখের এই নিয়োগ-পত্রদ্বারা বঙ্গের ডেপুটি গবর্ণর, বাবু শিবচন্দ্র দেবকে কটক (বর্ত্তমান উড়িষ্যা) প্রদেশে ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত করিলেন। বেতন সম্বন্ধে নিয়োগ-পত্রের দ্বিতীয় ধারায় লেখা ছিল,—"আপনার বেতন মাসিক তিন শত টাকা ধার্য্য হইল, তন্মধ্যে পঞ্চাশ টাকা কাছারির কর্ম্মচারীগণের জন্য; কিন্তু যখন মফস্বলে থাকিবেন, তখন শেষোক্ত বাবতে আরো পঞ্চাশ টাকা পাইবেন।"

কটক বিভাগের কমিশনরের নির্দ্দেশানুসারে, শিবচন্দ্র বালেশ্বরের কালেক্টারের অধীনে তাঁহার নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বালেশ্বরে একজন কালেক্টার নিযুক্ত হন; তৎপূর্ব্বে বালেশ্বরের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যসমূহ কটক হইতেই পরিচালিত হইত। শিবচন্দ্র ঐ জেলায় ছয় বৎসরের অধিককাল রাজস্বের বন্দোবস্ত (Settlement) ও পুনর্গ্রহণ (Resumption) কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। গোবিন্দপুর, নদিগাঁ, ভদ্রক, জামঝাড়ি, সদর ষ্টেশন বালেশ্বর, প্রভৃতি জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অতীব ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য করিয়া তিনি সর্ব্বত্র সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় উপরিতন রাজপুরুষেরাও পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; বালেশ্বরের কালেক্টার পি. টেলার সাহেব কটকের কমিশনার সাহেবকে, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখের একখানি পত্রে, শিবচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা বাহুল্য ভয়ে কেবল তাহারই কিয়দংশ, মর্ম্মার্থসহ, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"I have a very high opinion of Seeb Chunder Deb's character and qualifications. I consider him to be one of the best native officers I ever met with and likely to be of the greatest use to me and my successors in office."

"শিবচন্দ্র দেবের চরিত্র ও কার্য্যোপযোগিতা সম্বন্ধে আমার মত, অতীব উচ্চ। আমি যে সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশীয় রাজকর্ম্মচারী দেখিয়াছি, তিনি তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া মনে করি, এবং আমার ধারণা এই যে, তাঁহার নিকট হইতে আমার ও আমার পরিবর্ত্তিগণের অত্যধিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনা।"

তখন ডেপুটি কালেক্টারদিগের তিনটিমাত্র শ্রেণী ছিল। তৃতীয় ও নিম্নতম শ্রেণীর বেতন ছিল—২৫০্ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর—৩৫০্ টাকা, এবং প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর—৪৫০্ টাকা মাত্র। কার্য্যে দক্ষতা দেখাইলে, পাঁচ বৎসর অন্তর পদোন্নতি হইত। বালেশ্বরে থাকিতে থাকিতেই, শিবচন্দ্র ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, তিনি মেদিনীপুরে বদলি হইলেন। উক্ত জেলায় তিনি পাঁচ বৎসরের অধিকাল, সদর মহলসমূহের রাজস্বের বন্দোবস্ত, ১৮১৯

খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় কানুনের (Regulation II) ত্রিশধারা অনুসারে সামান্য পুনর্গ্রহণ (petty resumptions), বিস্তীর্ণ ক্রোকী ভূ-সম্পত্তি সমূহের রাজস্ব আদায়, বহুসংখ্যক দাখিল খারিজ, ডিক্রিজারির ও সংক্ষিপ্ত বিচারের মোকদ্দমা (summary suits), বাঁটোয়ারা বা ভূমিসম্পত্তির বিভাগ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এখানেও তাঁহার কর্ম্মের সুখ্যাতি ও প্রশংসার সীমা ছিল না।

মেদিনীপুর জেলার রাজস্বের বন্দোবস্তের অধ্যক্ষ—এইচ, ভি, বেলি সাহেব, ১৮৪৪-৪৫ সালের কার্য্য বিবরণীতে, শিবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"His work is always well done, and to be trusted. He is a highly educated good officer, and does great credit to Hindu College."

"তাঁহার সকল কাজই সুসম্পন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য। তিনি একজন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উত্তম কর্ম্মচারী এবং তাঁহার গৌরবে হিন্দুকলেজ সমধিক গৌরবান্বিত।" কমিশনার সাহেব, ১৮৪৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের কার্য্যবিবরণীতে, শিবচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহাও মর্ম্মার্থসহ, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"Of Baboo Shib Chunder Deb, uncovenanted Dy. Collector, the Collector states that he 'maintains the high character which has been so frequently and deservedly given him. He is esteemed by the Community as an impartial and just officer, and reflects much credit on that part of the uncovenanted service selected from Educated Natives.' * * *. I believe him to be deserving of the character given him by Mr. Torrens."

"অসিভিলিয়ান ডেপুটি কালেক্টার বাবু শিবচন্দ্র দেব সম্বন্ধে কালেক্টার বলেন যে, 'তিনি বারবার যে সুখ্যাতি পাইয়া আসিতেছেন এবং যাহা তিনি পাইবার উপযুক্ত,' তাঁহার সেই উচ্চ সুনাম তিনি বজায় রাখিয়াছেন। নিরপেক্ষ ও ন্যায়পর রাজকর্ম্মচারী বলিয়া জনসমাজ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং অচিহ্নিত কর্ম্মচারীবর্গের যে অংশ শিক্ষিত দেশীয়দিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হয়, সেই অংশও তাঁহার গৌরবে সমধিক গৌরবান্বিত।'***। টরেন্স্ সাহেব তাঁহার যে সুখ্যাতি করিয়াছেন, আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি তাহার উপযুক্ত।"

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, শিবচন্দ্র ৪৫০্ টাকা বেতনে তৎকালীন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং পরবৎসর জানুয়ারি মাসে মেদিনীপুর হইতে ২৪ পরগণায় বদলি হন। এইরূপে তিনি প্রায় দ্বাদশ বৎসর প্রবাসে কাটাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। মেদিনীপুর পরিত্যাগকালে, তত্রত্য এক্টিং কালেক্টার জি. ডি. উইল্‌কিন্‌স সাহেব, শিবচন্দ্রকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

"I cannot allow you to leave the office without assuring you that you have given me unmixed satisfaction in the performance of your public duties; and that your loss will be much felt both by me and by the people of the District."

"বিদায় দিবার পূর্ব্বে, আপনাকে বিশেষ করিয়া না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না যে, আপনি আপনার সরকারী কার্য্য সম্পাদনে আমাকে অবিমিশ্র সন্তোষ প্রদান করিয়াছেন, এবং আপনাকে হারাইয়া, আমি ও এই জেলার লোকেরা, উভয়েই, অত্যন্ত ক্ষতিবোধ করিব।"

ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া বালেশ্বর যাত্রাকালে, শিবচন্দ্র তাঁহার পত্নী ও একটি শিশুকন্যাকে কোন্নগরে পিতৃগৃহে রাখিয়া যান; তখন এখনকার ন্যায় সপরিবারে বিদেশে গমনের সুবিধা ছিল না। সেকালে রেলপথ বা ষ্টিমার ছিল না—উড়িষ্যায় যাইতে হইলে শিবিকার আশ্রয় লইতে হইত। পাল্কীতে জলখাবার প্রভৃতি লইয়া উঠিতে হইত, ফুরাইলে কোনও চটীতে গিয়া আবার সংগ্রহ করিতে হইত। পথে দস্যু ও শ্বাপদের ভয়ও ছিল। আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়, শিবচন্দ্রের প্রায় বিংশতি বৎসর পরে, ডেপুটি কালেক্টার হইয়া বালেশ্বর গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পথের কোনও স্থানে একবার তাঁহাকে পাল্কীর মধ্যে একাকী ফেলিয়া, "ভল, ভল" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে বাহকেরা বনমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল। তিনি কলিকাতা হইতে নবাগত এবং উড়িয়া ভাষায় অনভিজ্ঞ; ব্যাপারটা কি বুঝিতে না পারিয়া, পাল্কীর দ্বাররুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বাহকেরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তাহারা পথে ভল্লুক দেখিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছিল; এই বলিয়া পাল্কী উঠাইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এরূপ বিপদসঙ্কুল পথে ব্রজকিশোর দেব মহাশয় স্বভাবতঃই তাঁহার শিশুকন্যাসমেত তরুণবয়স্কা পুত্রবধূকে পাঠাইতে সম্মত হন নাই; শিবচন্দ্রও লজ্জাবশতঃ পরিবারকে বিদেশে লইয়া যাইবার কথা পিতৃসমক্ষে উত্থাপন করেন নাই। এইরূপে তিনি দুইবৎসরের অধিককাল প্রবাসে একাকী ছিলেন।

প্রবাসে একাকী অবস্থানকালে সে সময়ের লোকের সচরাচর যে সকল চরিত্র-দোষ ঘটিত, শিবচন্দ্রের চির-বিশুদ্ধ চরিত্রে তাহার কিছুই দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার প্রবাসী বন্ধুগণ বড়ই বিস্ময় বোধ করিতেন। একবার তাঁহারা শিবচন্দ্রের চরিত্র পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। একজন বাইজীর আগমনে, তাঁহার সকলেই বাইনাচ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিবচন্দ্র এ সমুদয়ের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বড় সামাজিক ছিলেন; এজন্য সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাদের প্রস্তাবে মত দিলেন। তখন সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া শিবচন্দ্রের বাসাবাটীতেই নাচের আয়োজন করিলেন। যথাসময়ে বাইনাচ আরম্ভ হইল। শিবচন্দ্রও

সকলের সঙ্গে মজলিসে বসিয়া নাচ দেখিলেন। অধিক রাত্রে নাচ শেষ হইলে, যে যাহার গৃহে গমন করিতে লাগিলেন; শিবচন্দ্রও শয়ন করিতে গেলেন।

এদিকে তাঁহার বন্ধুবর্গ বাইজীকে গোপনে শিখাইয়া ছিলেন যে, তুমি অগ্রে গিয়া হাকিম বাবুর শয্যায় শয়ন করিয়া থাক; তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, বলিও "এত রাত্রে আর কোথায় যাই? আজ আপনার নিকটেই থাকিব।" বাইজী প্রথমে কিছুতেই সম্মত হয় নাই—তাহার ভয়, পাছে বাবু রাগ করেন; কিন্তু সকলের অনুরোধে পরিশেষে সম্মত হইল। ভৃত্য বাবুর শয়ন-কক্ষ দেখাইয়া দিলে, বাইজী তথায় প্রবেশ করিল এবং মশারি তুলিয়া শয্যায় প্রবেশ করিয়া আবার মশারি ঠিক করিয়া দিল।

শিবচন্দ্র এ সকল ষড়যন্ত্রের কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি কি প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিলেন, এক্ষণে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং শয়ন করিবার জন্য মশারি তুলিতেই বাইজীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি! তুমি এখানে কেন?" এই কথা বলিতে বলিতে, তিনি দ্বারদেশে আসিলেন। বাইজী পূর্ব্বশিক্ষামত যাহা বলিল, তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, আমি অন্যত্র গিয়া শয়ন করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এদিকে বন্ধুগণ বাইজীকে পাঠাইয়া, গৃহের আশে পাশে লুকাইয়া ছিলেন এবং শিবচন্দ্রকে কিরূপ বিপদে ফেলিয়াছেন, তিনি এখন কি করিবেন, পরস্পরে চুপি চুপি তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া, সকলে হাসিতে হাসিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তিনি বাইজীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। বাইজীও বাহিরে চলিয়া আসিল। তখন সকল রহস্যই প্রকাশ পাইল। বাইজী প্রণাম পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইল। শিবচন্দ্র পুনর্ব্বার শয়ন করিতে গেলেন; বন্ধুগণও পরাজয় মানিয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

দুই বৎসরের অধিককাল একাকী প্রবাসে যাপন করিয়া শিবচন্দ্র যখন দেখিলেন যে পিতৃদেব পুত্রবধূকে স্বামীসমীপে পাঠাইবার কোনও উদ্যোগই করিলেন না, তখন তিনি পত্নীকে নিকটে রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু তিনি নিজে পিতাকে কিছু না বলিয়া ভগ্নীপতি, ভ্রাতা, পুরোহিত প্রভৃতির দ্বারা একথা পিতাকে জানাইলেন। ব্রজকিশোর এ প্রস্তাবে সহজে সম্মত হন নাই। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে বধূকে লইয়া গেলে, পুত্র এখন তাঁহাকে মাসে মাসে যে পরিমাণে টাকা পাঠাইতেছেন তাহার হ্রাস হইবে। কিন্তু তাঁহার পুত্র যেরূপ পিতৃবৎসল তাহাতে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই, ইহা সকলে বুঝাইয়া বলাতে এবং বিশেষ জেদ করাতে, তিনি অবশেষে পুত্রবধূর প্রবাস গমনে অনুমতি দিলেন। এই

অনুমতি পাইয়া শিবচন্দ্র কেবল তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে প্রবাসে লইয়া যান নাই—তাঁহার মেজ পিসীঠাকুরাণীও (যাঁহার পরিচয় আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই দিয়াছি) সঙ্গে গিয়াছিলেন। ব্রজকিশোর যখন দেখিলেন যে, পুত্র পরিবার লইয়া যাইবার পরেও, মাসে মাসে পূর্ব্ববৎ টাকাই প্রেরণ করিতেছেন, তখন তিনি পুত্রের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

শিবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী বিদেশে আসিয়া প্রাকৃত প্রস্তাবে গৃহিণীপদবাচ্যা হইলেন। তিনি নিরলস হইয়া স্বামীর সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানে ত্রুটি করিতেন না। নানাবিধ মিষ্টান্নাদি রুচিকর খাদ্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া স্বামী ও তাঁহার বন্ধুবর্গের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেন। মেজপিসীঠাকুরাণীও বঞ্চিত হন নাই। তিনি বধূমাতার স্বহস্ত-প্রস্তুত সুখাদ্য সমূহ পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া তাঁহার পাকের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন ও আশীর্ব্বাদ করিতেন, কিন্তু গুরু ভোজন দোষে পেটের গোলমাল উপস্থিত হইলে বধূমাতার চতুর্দ্দশপুরুষের জন্য সুখাদ্যের ব্যবস্থা করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। একদিন পিসীমাতার কড়ি মধ্যম শিবচন্দ্রের কর্ণগোচর হওয়াতে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসীমা কাহাকে এত গালি দিতেছেন?" শিবচন্দ্রের গৃহিণী উত্তর করিলেন, "আমাকে—আর কা'কে?" "কেন?" "আমি তাঁহাকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলাম বলিয়া।" শিবচন্দ্র প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেকালের ডেপুটিকালেক্টারেরা আমলা রাখিবার জন্য সরকার হইতে মাসে মাসে মোট টাকার বৃত্তি পাইতেন—সদরে পঞ্চাশ ও মফস্বলে একশত টাকা। আমলা নিযুক্ত করা ও তাহাদের বেতনের জন্য সরকার হইতে প্রাপ্ত মোট টাকার বণ্টন করা, ডেপুটিকালেক্টারের নিজের হাতে ছিল—কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য তিনি স্বেচ্ছামত যে কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। শিবচন্দ্র যতদিন উড়িষ্যায় ছিলেন, ততদিন উড়িয়া ভাষায় অনভিজ্ঞ দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। মেদিনীপুরে সেই সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেখানকার কাছারিতে বাঙ্গালাভাষাই প্রচলিত ছিল বলিয়া, শিবচন্দ্র কতিপয় আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তিকে কর্ম্ম দিয়া নিজের বাসাবাটীতেই স্থান দিয়াছিলেন; তাঁহার ভগ্নীপতি (ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ) ও কনিষ্ঠ শ্যালক (উমাচরণ ঘোষ) ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি প্রত্যহ দুই বেলা তাঁহার গৃহবাসী সমস্ত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে একত্রে আহার করিতেন। নিজের খাদ্যে ও কর্ম্মচারীদের খাদ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না—কেবল তণ্ডুলে কিঞ্চিৎ প্রভেদ ছিল। প্রথমে সকলের জন্য একই প্রকার তণ্ডুলের ব্যবস্থা হইয়াছিল—কিন্তু তাহাতে তাঁহার উদারাময় রোগ জন্মিল; তখন তিনি, ভগ্নীর অনুরোধে, তাঁহার চিরাভ্যস্ত পুরাতন দাদখানি চাউলের অন্ন পুনর্ব্বার খাইতে আরম্ভ করিলেন। একত্র আহার কালে যদি কাহারও আসিতে বিলম্ব হইত,

তাহা হইলে নিজে আহার আরম্ভ না করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার শ্যালক উমাচরণ বাবু কিছু দীর্ঘসূত্রী ছিলেন বলিয়া, প্রায় তাঁহারই আহারস্থানে আসিতে অধিক বিলম্ব হইত। ভ্রাতার বিলম্ব দেখিয়া শিবচন্দ্রের পত্নী সঙ্কুচিত হইতেন, কিন্তু শিবচন্দ্র নিজে কখনও সেজন্য কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার বহুবৎসর পরেও, আশ্রিতবৎসল শিবচন্দ্র তাঁহার পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। আমরা শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় দুরবস্থাপন্ন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীকে কতমাস ধরিয়া কোন্নগরের বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার অন্নধ্বংস করিতে

উচ্চ শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে সকল দেশীয় ভদ্রলোক বিচারকার্য্যে বা অন্য কোনও উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে মতামত যাহাই হউক না কেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে কেবল নিরূপিত বেতনে সন্তুষ্ট না হইয়া "উপর অঙ্কের" প্রত্যাশা করিতেন, সে বিষয়ে, বোধ হয়, মতভেদের সম্ভাবনা অতি অল্প। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ কখনও উৎকোচ গ্রহণ বা অন্য কোনও অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই, ইহা বলা যায় না বটে, কিন্তু শ্রেণী হিসাবে, তুলনা করিলে, উচ্চ-শিক্ষিত নব্যেরা যে এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। আমাদের যে আত্মীয় ডেপুটিকালেক্টার হইয়া শিবচন্দ্রের প্রায় বিশ বৎসর পরে বালেশ্বর গিয়াছিলেন এবং একবার ভল্লুক-ভীত শিবিকা-বাহকগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, একবার তিনি বিদ্যাসাগরোপাধিক জনৈক প্রাচীন সদর-আলার সহিত উড়িষ্যার একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। মাধ্যাহ্নিক আহারের জন্য উভয়ের পাল্কী এক চটীতে স্থাপিত হইল। হাকিমদ্বয়ের আগমনের সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়া স্থানীয় জমিদারের জনৈক কর্ম্মচারী বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য, উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত, তণ্ডুল, ময়দা প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য লইয়া তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। সে নব্য তন্ত্রের ডেপুটি বাবুকে কোনও উপহার দিতে সাহস করে নাই, কিন্তু সদর-আলা বাবুর আহারোপযোগী ভোজ্য দ্রব্য অসঙ্কোচে তাঁহার সম্মুখে ধরিল। ডেপুটি বাবুর স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে, সদর-আলা বাবুকে এরূপ উপহার প্রদান এই প্রথম নহে। নব্য ডেপুটির সমক্ষে উপহার গ্রহণে সদর-আলা মহাশয় প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য। তিনি তাঁহার লোকজনকে উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া, ডেপুটি বাবুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এখানে এরূপ না নিলে আহার যোটা ভার—আপনাদের ইংরাজিতেও না একটা কথা আছে? 'নীষ্টি হ্যাজ্ নো লা' (Necessity has no law—অভাবে বিধি খাটে না)।"

আহারান্তে হাকিমেরা নিজ নিজ পাল্কীকে উঠিলেন এবং দুই পাল্কী পাশাপাশি চলিতে আরম্ভ করিল। এক ব্যক্তি টাকার তোড়া লইয়া সদর-আলার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল, ডেপুটি বেশ বুঝিলেন উহা উৎকোচের টাকা এবং তাঁহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিতেছে না বলিয়া লোকটা উহা দিবার সুযোগ পাইতেছে না। পরিশেষে সদর-আলা মহাশয় নিজেই এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বলিলেন "তবে চৌধুরী! আমার টাকার তোড়াটা কতক্ষণ ধরিয়া থাকিবে? দাও, আমার পাল্কীতে দাও"—যেন তাঁহার নিজের টাকা এতক্ষণ চৌধুরীর জিম্মায় ছিল!!

উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত শিবচন্দ্র, কোনওরূপ উৎকোচ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কখনও কোনও সামান্য উপহারও গ্রহণ না করিয়া হিন্দুকলেজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

একবার তাঁহাকে না বলিয়া চাপরাসীরা লাউশাক আনিয়া রাঁধিয়াছিল। তিনি যখন সকলের সহিত একসঙ্গে আহার করিতে বসিলেন, তখন লাউশাক কোথা হইতে আসিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। নাজির বলিল, চাপরাসী অমুক লোকের লাউগাছ হইতে কাটিয়া আনিয়াছে। ইহা শুনিবামাত্র তিনি সেই তরকারীর বাটি উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মুখে আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

সেকালে হাকিমদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লোকে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে নানাবিধ দ্রব্য প্রদান করিত। কিন্তু তাঁহাকে কেহ কিছু দিবার উল্লেখ করিলেই তিনি এরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন যে, কেহই আর সাহস করিয়া তাঁহাকে কিছু উপঢৌকন দিতে পারিত না। একথা সকলেই জানিত, এজন্য কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না। একবার একটা লোক তাঁহার ন্যায় বিচারে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, চারি পাঁচজন লোকের দ্বারা নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও বড় বড় মৎস্য তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। বাটীর দ্বারবান্ তাহার প্রভুকে বিশেষরূপেই চিনিত, এজন্য শশব্যস্তে ঐ লোকদিগকে জিনিস লইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু তাহারা দ্বারপালের কথা না শুনিয়া বাহির বাটীর রোয়াকের উপর জিনিসপত্র নামাইতে লাগিল। তাহাদের গণ্ডগোল শুনিতে পাইয়া, শিবচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া, তাহাদিগকে জিনিসপত্র উঠাইয়া লইতে বলিলেন। তাহারা কিন্তু জিনিস না উঠাইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। তখন তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরে ও বিরক্তভাবে তাহাদের জিনিস উঠাইতে বলিলেন, এবং তাহারাও তখন শশব্যস্তে সমস্ত জিনিস উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

শিবচন্দ্রের গৃহিণী অন্তরাল হইতে সমুদয়ই দেখিয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আহা! উহারা ওরূপভাবে ফিরিয়া গেল, ইহাতে আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে। ইহা ত টাকাকড়ি নয়, যত্ন করিয়া খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়াছিল,

ইহা লইলে কি দোষ হইত? যে পাঠাইয়াছিল তাহার মনে কষ্ট হইবে।” উত্তরে শিবচন্দ্র বলিলেন, “তোমরা স্ত্রীলোক, এ সব বুঝিবে না। এরূপ উপহার গ্রহণ করা অত্যন্ত অনুচিত। একজনের নিকট হইতে লইলেই, অপর পাঁচজনেও দিতে সাহস করিবে। ইহাতে সকলেই প্রশ্রয় পাইবে। আমার বিচারে যাহা ন্যায়সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহা আমি করিয়াছি, সেজন্য গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আমি টাকা পাইতেছি; তবে ওলোকের নিকট হইতে আমি কেন কিছু লইব?”

শিবচন্দ্রের নিরপেক্ষ বিচারের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে, তিনি বিচার কার্য্যেও এরূপ সহৃদয় ছিলেন যে, আইন অনুসারে যাহার বিরুদ্ধে রায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাকেই আবার প্রকৃত দয়ার পাত্র বোধ হওয়াতে নিজের পকেট হইতে অর্থ দান করিয়াছেন—এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল প্রচার নহে।

শিবচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের ডেপুটিকালেক্টার ছিলেন, তখন তত্রত্য কালেক্টার ও কমিশনার তাঁহার কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত জেলার খড়্গপুর ও কেদারকুণ্ড নামক দুইটি খাস পরগণায় অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ফসলের বিলক্ষণ হানি হওয়াতে, রাজস্বের কিরূপ পরিমাণে রেহাই দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহা নির্ণয় করিবার ভার শিবচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি যে পরিমাণে রাজস্ব ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করেন, বোর্ড অফ রেভিনিউ সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্টকে উহা মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করিয়া ইংরাজি ১৮৫০ সালের ২২শে মার্চ তারিখে একখানি পত্র লিখেন। বোর্ড সেই পত্রে, প্রসঙ্গতঃ শিবচন্দ্রের যে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম :—

“The enquiry into the extent of the losses sustained was conducted by Deputy Collector Shib Chunder Deb, an officer whose character has stood very high for many years.”

“কিরূপ পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন ডেপুটি কালেক্টার শিবচন্দ্র দেব, যাঁহার সুনাম বহু বৎসর ধরিয়া অতি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত।”

“When an officer is deputed to make an investigation of this nature, it should be resolved, the Board observe, to trust him; — if not to be trusted he should not be sent. In their opinion a more trust-worthy person for such a duty could not be found than Shib Chunder Deb. He has had much experience on Mofussil duties, has had charge of these Estates, and is admitted by the Collector to be better acquainted with the condition of the estates and of the ryots than he himself is.”

"বোর্ডের মত এই যে, যখন কোনও রাজকর্ম্মচারীকে এরূপ তদারকে পাঠান হয়, তখন তাঁহাকে বিশ্বাস করাই স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত; যদি তাঁহাকে বিশ্বাস করা না যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে না পাঠানই কর্ত্তব্য। বোর্ডের বিবেচনায়, এই কার্য্যের জন্য শিবচন্দ্র দেবের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া যাইত না। মফস্বলের কার্য্যকলাপে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, এই ভূমি সম্পত্তি সমূহ তাঁহার জিম্মায় ছিল এবং কালেক্টার নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে সম্পত্তির ও প্রজাগণে অবস্থা তিনি কালেক্টারের অপেক্ষা বেশি ভালরূপ জানেন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজসেবা—স্বদেশে

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শিবচন্দ্র মেদিনীপুর হইতে ২৪-পরগণায় বদলি হন। তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমন এইরূপে ঘটিয়াছিল—২৪-পরগণায় ডেপুটি কালেক্টার বাবু রাধানাথ গাঙ্গুলি তাঁহার সহিত স্থান-বিনিময় করিতে স্বীকৃত হন; পরস্পরের সম্মতি ও বোর্ডের অনুমতিক্রমে রাধানাথ বাবু মেদিনীপুরে গেলেন, শিবচন্দ্র আলিপুরে আসিলেন। ২৪-পরগণায় শিবচন্দ্র পঞ্চান্নগ্রামের ও অন্যান্য খাসমহলের রাজস্ব আদায়ের এবং কাছারির কাগজপত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ করণের ভার প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে কালেক্টারির বিবিধ কার্য্য করিতে হইত; খাজনার মোকদ্দমার বিচার এবং সরকারী উদ্দেশ্যে গৃহীত ভূমির মূল্য নিরূপণও তাঁহার কার্য্যের মধ্যে ছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ডেপুটি কালেক্টারেরা সর্ব্বপ্রথমে তিনটি মাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন; প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বেতন ক্রমান্বয়ে ৪৫০, ৩৫০ ও ২৫০ টাকা ছিল এবং পাঁচ বৎসর অন্তর পদোন্নতি হইত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে, বোর্ড অফ রেভিনিউ তৎকালীন ডেপুটি কালেক্টারদিগকে, গুণানুসারে, পাঁচটি নূতন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণীর বেতন ক্রমান্বয়ে ৭০০, ৬০০, ৫০০, ৪০০ ও ২০০ টাকা ধার্য্য করেন। গুণানুসারে নূতন শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্যে, বোর্ড প্রত্যেক কালেক্টারকে তাঁহার অধীনস্থ ডেপুটি কালেক্টারদিগের গুণসম্বন্ধে বিশেষ মত জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে, ২৪-পরগণার কালেক্টার, এইচ. ভি. বেলি সাহেব শিবচন্দ্রের গুণসম্বন্ধে যে বিশেষ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

REMARKS

Special

Shib Chunder Deb. I have given this officer 35 for *acquirements*. Because he has a complete knowledge of the theory and practice of the

Revenue Administration of Bengal and its laws, because he has a complete knowledge of Bengal and of the habits and feelings of the people with whom he has to do, because he is patient and calm both in the character of his mind and in his personal bearing towards them. Because he has a rare and clear knowledge of English, both in conversation and writing. Because he is careful and discreet in going to the foundation points of a case, steady in tracing and eluciding its rise and progress, fair and equal in his statement of results, and sound in his deduction of opinion from those results. Because he is also systematic and punctual in his arrangements for business, and in short because his *practical* acquirements are of the first standard. I have rated his *industry* at 35. Because he is as industrious and willing (and successful in both) as a man can be; and because not only does his example work similar results in his office, but saves time and trouble in the offices with which he has to do; I have given him 30 for good service, not because his testimonials are in one or two instances of mine, but because they are uniformly and annually high from the Board and Mr. Mills and my predecessors in this office."

Degree of Merit according to Standard

35 Industry
35 Acquirements
30 Good Service
100

"শিবচন্দ্র দেব—আমি এই রাজকর্ম্মচারীকে জ্ঞান বা বিদ্যার জন্য ৩৫ দিয়াছি, যেহেতুক বঙ্গের রাজস্বসংক্রান্ত শাসন কার্য্যের ও বিধিসমূহের ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে; যেহেতুক বঙ্গদেশের, এবং যে সকল লোকের সহিত তাঁহাকে কাজ করিতে হয় তাহাদের অভ্যাস ও মনোভাব সমূহের, সমগ্র জ্ঞান তাঁহার আছে; যেহেতুক তাঁহার মানসিক প্রকৃতি ও লোকের প্রতি আচরণ, ধীর ও শান্ত; যেহেতুক, কি কথোপকথনে কি লেখায়, তাঁহার ইংরাজি ভাষা জ্ঞান অসাধারণ ও বিশুদ্ধ; যেহেতুক তিনি সতর্কতা ও বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রত্যেক বিষয়ের মূল তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করেন, অবিচলিতভাবে উহার উৎপত্তি ও গতিক্রম নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করেন, ফলকথাগুলি নিরপেক্ষতা ও সমদর্শিতার সহিত ব্যক্ত করেন এবং তাহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা অভ্রান্ত; যেহেতুক তিনি শৃঙ্খলাপূর্ব্বক ও যথাসময়ে সকল কার্য্যের বন্দোবস্ত করেন; সংক্ষেপতঃ, যেহেতুক, তাঁহার ক্রিয়া-সিদ্ধ জ্ঞান সর্ব্বোচ্চ আদর্শানুগত। আমি তাঁহাকে শ্রমশীলতার জন্য ৩৫ দিয়াছি, যেহেতুক, কোনও মনুষ্য তাঁহার অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী ও কর্ম্মপ্রিয় হইতে পারে না এবং উভয় বিষয়েই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; অধিকন্তু, যেহেতুক তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুরূপ ফল কেবল তাঁহার নিজের আফিসেই ফলে না, কিন্তু যে সকল আফিসের সহিত তাঁহার কার্য্যের সংস্রব আছে, সেখানেও সময় ও কষ্ট বাঁচিয়া যায়। আমি তাঁহাকে কর্ম্মের উৎকর্ষের জন্য ৩০ দিয়াছি, তাঁহার

আদর্শানুসারে গুণের ক্রম।

৩৫ শ্রমশীলতা
৩৫ জ্ঞান বা বিদ্যা
৩০ কর্ম্মের উৎকর্ষ
১০০

দুই একখানি প্রশংসাপত্র আমার প্রদত্ত বলিয়া নহে, কিন্তু তিনি বৎসর বৎসর সমভাবে বোর্ডের, মিল্‌স্‌ সাহেবের ও আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কালেক্টরদিগের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা পাইয়াছেন বলিয়া।"

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন যে, মোট ১০০ সংখ্যার মধ্য হইতে বোর্ড প্রত্যেক গুণের জন্য যে আদর্শ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কালেক্টর বেলি সাহেব সেই সেই গুণের পূর্ণসংখ্যা শিবচন্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তনের বাকি কিছুই রাখেন নাই। এই মন্তব্য পাঠাইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে—৩রা জুন তারিখে—তিনি কমিশনার সাহেবকে পঞ্চান্নগ্রামের রাজস্ব আদায়ের যে কার্য্যবিবরণী পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেও বুঝা যায়, তিনি শিবচন্দ্রের গুণে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন—

"In conclusion I consider the result *most creditable* to the Deputy Collector, and I really believe I am within the mark in saying I do not know a Deputy Collector who would have done the same duty with so much clearness and success to his superiors and so little annoyance to those with whom he has to deal.

Should the Board and you agree with me in thinking this special duty well done, I trust the Board's and your *special* approbation may be accorded in favor of the Deputy Collector with whom the direct responsibility and labour have been."

"উপসংহারে আমি বিবেচনা করি যে, তাঁহার কার্য্যের এই ফল, ডেপুটি কালেক্টারের পক্ষে *সাতিশয় যশস্কর*; এবং আমার আন্তরিক ধারণা এই যে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আমি এমন কোনও ডেপুটি কালেক্টারকে জানিনা, যিনি তাঁহার সহকারীদিগকে এত অল্প বিরক্ত করিয়া, তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের পক্ষে এরূপ বোধগম্য ও সন্তোষজনকরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

আমার মতে এই বিশেষ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। যদি বোর্ডের ও আপনারও এই মত হয়, তাহা হইলে আমি আশা করি যে, যে ডেপুটি কালেক্টারের সাক্ষাৎ দায়িত্বে ও পরিশ্রমে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে বোর্ড ও আপনি আপনাদের *বিশেষ* প্রশংসা জ্ঞাপন করিবেন।"

কমিশনার, এফ, ব্রুস্‌ সাহেবও শিবচন্দ্রকে তাঁহার বিভাগের ডেপুটি কালেক্টারদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ১৮৫২-৫৩ সালের কার্য্যবিবরণীতে শিবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"I consider Shib Chunder Deb the best Deputy Collector now in the Division. Without great talents, he is active, zealous, and indefatigable in the performance of the various duties entrusted to him, and possesses a sound Judgment."

"এই বিভাগের বর্ত্তমান ডেপুটি কালেক্টারদিগের মধ্যে আমি শিবচন্দ্র দেবকে সর্ব্বোত্তম মনে করি। অসাধারণ ক্ষমতাশালী না হইলেও, তিনি যে সকল বিবিধ কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসম্পাদনে তিনি তৎপর, উৎসাহশীল ও অক্লান্ত, এবং তাঁহার বিচারশক্তি অভ্রান্ত।"

এরূপ প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া, শিবচন্দ্র, গুণানুসারে নূতন শ্রেণী বিভাগের ফলে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে, ৪৫০্ টাকা বেতন হইতে, একেবারে ৬০০্ টাকা বেতনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন যে, ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু তিনি উক্ত শ্রেণীর পুরা বেতন ১লা জুলাই হইতে পাইয়াছিলেন—তৎপূর্ব্বের কয়েক মাস ৫০০্ টাকা হিসাবে বেতন পাইয়াছিলেন।

এই সময়ের কিঞ্চিৎপরে তিনি বালিয়াঘাটা হইতে চিৎপুর পর্য্যন্ত এক নূতন খাল কাটিবার জন্য ভূমি সংগ্রহে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য এবং অন্যান্য বিবিধ কার্য্য তিনি কিরূপ দক্ষতা ও ন্যায়পরতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য, এক্‌টিং কালেক্টার, এফ. এ. লশিংটন সাহেব, ১৮৫৫-৫৬ সালের রাজস্ব-শাসন-কার্য্য-বিবরণীতে, শিবচন্দ্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা, মর্ম্মার্থসহ, নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Baboo Shib Chunder Deb—I consider one of the best Deputy Collectors whose labors have come under my observation and I consider it necessary to write thus plainly as the work shown to have been entrusted to him would appear small, if only the numerical amount were noticed; during the year, he has been employed in the valuation of lands taken for the Balliaghatta towing path, for the Ooltadangah Canal, in investigations connected with the Ooloobariah Road, the new Custom House at Diamond Harbour &c. &c. in short in all mofussil cases, this officer has been employed, and judging from the general acquiescence in his decisions, the paucity of appeals from his orders and in cases of arbitration the near proximity to the valuation of lands arrived at by arbitrators to that proposed by himself I deem myself justified in forming the opinion of this officer's merits expressed above."

"আমি যে সকল সর্ব্বোত্তম ডেপুটি কালেক্টারের কাজ নিজে দেখিয়াছি, আমার বিবেচনায় বাবু শিবচন্দ্র দেব তাঁহাদিগের অন্যতম। আমি এরূপ স্পষ্ট করিয়া এইজন্য লিখিতেছি যে, কেবল সংখ্যা হিসাবে দেখিতে গেলে, হয়ত তাঁহাকে যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহা অল্প বোধ হইবে। বিগত বৎসরে, তিনি বালিয়াঘাটার খালের ধারে গুণ টানিবার পথের, ও উল্টাডাঙ্গার খালের, জন্য গৃহীত ভূমিসমূহের মূল্য নিরূপণে, উলুবেড়িয়ার রাস্তা ও ডায়মণ্ডহারবারের নূতন শুল্কালয় ঘটিত তদারকে, সংক্ষেপতঃ, মফস্বলের সকল তদারকে, ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার নিষ্পত্তি

সমূহ লোকে সাধারণতঃ মানিয়া লইয়াছে, তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত আপিলের সংখ্যা অতি অল্প এবং মধ্যস্থেরা যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল মোকদ্দমায় জমির যে মূল্যে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রায় শিবচন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত মূল্যের কাছাকাছি; এই সকল বিবেচনা করিয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে তাঁহার গুণ সম্বন্ধে আমি উপরে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা যথার্থ।"

ন্যায়পরতা শিবচন্দ্রের অস্থিমজ্জাগত গুণ ছিল; তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইবার আকাঙ্ক্ষায় কখনও বিচারক্ষেত্রে প্রজার প্রতি লেশমাত্র ন্যায়বিরুদ্ধ আচরণ করেন নাই; গবর্ণমেণ্টের জন্য ভূমিক্রয়ও নিরপেক্ষভাবে ও ন্যায্য মূল্যে করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে অতি অল্প সংখ্যক আপিল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অধুনা, ল্যাণ্ড একুইজিশন্ আপীলের সংখ্যার সীমা নাই। এখন লোকের এই ধারণা হইয়াছে যে, বিনা মোকদ্দমায় সরকারের নিকট হইতে জমির প্রকৃত মূল্য পাওয়া অসম্ভব।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ ভারত-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দুর্ব্বৎসর। ঐ বৎসরের প্রারম্ভে সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে "এনফীল্ড রাইফ্ল" নামে একপ্রকার নূতন ধরণের বন্দুক ভারতবর্ষীয় সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য ইংলণ্ড হইতে আমদানি হয়। এই বন্দুকের টোটা ইংলণ্ডে গোরুর ও শূকরের চর্ব্বির সংযোগে প্রস্তুত হইত; এদেশের সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উক্ত টোটা এখানেও সেইরূপে প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন—তাঁহাদের তখন খেয়াল হয় নাই যে, গোরুর চর্ব্বি, হিন্দু সিপাহীর, এবং শূকরের চর্ব্বি, মুসলমান সিপাহীর, তুল্যরূপ অস্পৃশ্য। এই টোটার মুখ, আবার, ব্যবহারকালে, সিপাহীকে দন্তদ্বারা ছেদন করিতে হইত। সিপাহীদিগের মধ্যে জনরব উঠিল যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই উপায়ে হিন্দু ও মুসলমানের জাতি মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই জনরবের সংবাদ পাইয়া মহা ভীত হইলেন এবং প্রচার করিলেন যে নূতন টোটা এখনও কাহাকেও দেওয়া হয় নাই এবং উত্তরকালেও কখনও দেওয়া হইবে না। কিন্তু সিপাহীরা অনেকে একথা বিশ্বাস করিল না এবং বিদ্রোহের অগ্নি এই আশ্বাস বাক্যে প্রশমিত হইল না। এই অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ প্রথমে বারাকপুরের সেনানিবাসে দেখা দিয়াছিল এবং অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ১০ই মে তারিখে, মীরটের বৃহৎ সেনানিবাসে বিদ্রোহের দাবানল অতীব ভীষণ আকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বিদ্রোহীরা মীরটে, ও তাহার অব্যবহিত পরে মোগলের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী দিল্লীনগরে কিরূপ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিল; তাহা আমরা বর্ণনা করিতে প্রস্তুত নহি; কারণ, আমরা সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। আমরা শিবচন্দ্রের জীবনের একটি দুর্দ্দৈব ঘটনা বুঝিবার জন্য যতটুকু ইতিহাস জানা আবশ্যক, কেবল

তাহাই বিবৃত করিলাম। মীরটের ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া কলিকাতাবাসী বে-সরকারী ইংরাজেরা দেশীয়দিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন; নিরীহ রাজভক্ত বাঙ্গালি ভদ্রলোকও তাঁহাদের বিদ্বেষের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

মীরটের ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের অল্পদিন পরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, একদিন শিবচন্দ্র রেলপথে কোন্নগর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার কয়েকজন সাহেবের সহিত পথিমধ্যে আলাপ হয়। তিনি যে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিয়াছিলেন, তথায় আর কোনও বাঙ্গালি আরোহী ছিলেন না, কেবল চর্চ্চ নামে একজন ইংরাজ বণিক, জজ নামে একজন এটর্ণি, কাপ্তেন ম্যাথিসন্ নামে একজন সৈনিক পুরুষ এবং দুই একজন নীলকর সাহেব গাড়ী অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এই শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষেরা শিবচন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়া কথায় কথায় মিউটিনির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং দেশীয়দিগের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শান্তস্বভাব শিবচন্দ্রেরও মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি হইল এবং তিনি তর্কের মুখে অনবধানতা বশতঃ বলিলেন,—"কেবল একপক্ষের দোষ দেখিলে চলিবে না; সিপাহীরা যখন ধর্ম্মমূলক কুসংস্কার বশতঃ দাঁত দিয়া টোটা কাটিতে আপত্তি করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে ঐ কাজ করিতে বাধ্য করা গবর্ণমেণ্টের অন্যায় ও অনুচিত কার্য্য হইয়াছিল।" উক্ত সাহেবগণ এই কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শিবচন্দ্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী এবং বিদ্রোহীগণের সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া লর্ড ক্যানিংএর হোম সেক্রেটারি বীডন সাহেবের নিকট শিবচন্দ্রের নামে রাজবিদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত করিলেন এবং হুগলির জজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই অভিযোগের একজন প্রবল সমর্থক খাড়া করিলেন। হোম সেক্রেটারি বীডন—যিনি পরে বঙ্গের লেফ্‌টেন্যান্ট্ গবর্ণর হইয়াছিলেন—শিবচন্দ্রের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। এই সংবাদ প্রচার হইলে, শিবচন্দ্রের আত্মীয় বন্ধুগণ বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে সত্যগোপন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ শিবচন্দ্র সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। তিনি পদচ্যুতি বা অন্য কোনও গুরুতর দণ্ডের ভয়ে তাঁহার কৈফিয়তে নিজের একটিও উক্তি অস্বীকার না করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মনে রাজভক্তির কোনওরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই এবং ইহার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার কতকগুলি প্রশংসাপত্রও প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে একখানি প্রশংসাপত্রে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রাজা কমলকৃষ্ণ দেব, রাজা প্রতাপ নারায়ণ সিংহ, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু লোকনাথ বসু, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু গোপাললাল ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতার অতি সম্ভ্রান্ত ও

মান্যগণ্য ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় এই সকল নামের স্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট শিবচন্দ্রের কৈফিয়তের উত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন যে, তিনি যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসম্মানসূচক এবং তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যেন বারান্তরে এরূপ অবিবেচনার কার্য্য না করেন। এইরূপে শিবচন্দ্র সেই দোলমালাই-এর দিনে এক বিষম বিপত্তি হইতে ভগবানের কৃপায় নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার পদচ্যুতির—অন্ততঃ, পদাবনতির— আশঙ্কা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা না হইয়া, তাঁহার পদগৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুন্ন ছিল। ২৪-পরগণার কালেক্টারের ১৮৫৭-৫৮ সালের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীর নিম্নোদ্ধৃত অংশ ইহা সপ্রমাণ করিবে :—

"Babu Shib Chunder Deb Deputy Collector is an highly efficient officer, and one of the best Deputy Collectors with whom I have come in contact."

"ডেপুটি কালেক্টার বাবু শিবচন্দ্র দেব একজন উচ্চদরের কাজের লোক; আমি যে সমস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডেপুটি কালেক্টারের সংস্রবে আসিয়াছি, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।"

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে, তিনি জেলা ২৪-পরগণার একজন সিবিলিয়ান সহকারী-ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি যেরূপ দয়ালু ও হৃদয়বান্ লোক ছিলেন, তাহাতে তিনি এই সকল ক্ষমতার চালনা করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন; একদিকে, অপরাধীদিগের দণ্ডবিধান তাঁহার কোমল হৃদয়ের যেমন অপ্রীতিকর ছিল, তেমনি আবার বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেও তাঁহার মন সরিত না। তিনি বোর্ড অফ রেভিনিউর তদানীন্তন সিনিয়ার মেম্বর, ডবলিউ ড্যাম্পিয়ার সাহেবকে এই কথা গোপনে বলাতে, উক্ত সাহেবের উপদেশানুসারে ২৪-পরগণার কালেক্টার তাঁহাকে ত্বরায় ঐ অপ্রীতিকর কার্য্যভার হইতে মুক্ত ও অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

উক্ত ড্যাম্পিয়ার সাহেব ও তাঁহার পুত্র, এইচ, এল, ড্যাম্পিয়ার (যিনি উত্তরকালে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারি হইয়াছিলেন) শিবচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। চরিত্র ও কার্য্যদক্ষতা গুণে শিবচন্দ্র আরো অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন—তন্মধ্যে টরেন্স, ট্রেভর, গ্রোট, ট্রিভেলিয়ান ও চ্যাপম্যান প্রভৃতি কয়েকজন সাহেবের নাম তাঁহার মুখে অনেকবার শুনা যাইত।

আর্থার গ্রোট সাহেব, গ্রীস্ দেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জর্জ গ্রোটের ভ্রাতা; তিনি ডবলিউ, ড্যাম্পিয়ার সাহেবের পরে বোর্ড অফ রেভিনিউর সিনিয়ার মেম্বর হইয়াছিলেন এবং পাঁচ বৎসর বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সার চার্লস ট্রিভেলিয়ান যখন (১৮৩৬-৩৮ খৃষ্টাব্দে) বোর্ড অফ রেভিনিউর সেক্রেটারি ছিলেন, শিবচন্দ্র তখন তাঁহার সহিত পরিচিত হন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলের ভগ্নীপতি ছিলেন। মেকলে সুপ্রীম কাউন্সিলের লীগ্যাল মেম্বর হইয়া যতদিন কলিকাতায় ছিলেন ততদিন চৌরঙ্গির যে বৃহৎ অট্টালিকাতে এখন "বেঙ্গল ক্লাব"আছে, সেই বাটীতে ভগ্নী ও ভগ্নীপতির সহিত একত্র বাস করিতেন। আমরা শিবচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি যে, ট্রিভেলিয়ান সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহার ঐ বাটীতেই মেকলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সার চার্লস ট্রিভেলিয়ান, ইহার অনেক পরে, ক্রমান্বয়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর ও ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব হইয়াছিলেন। ইনি ভারতবাসীর একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ভারতে ইংরাজি-শিক্ষা প্রচলনে ইনি মেকলের একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন।

শিবচন্দ্র যখন "কোন্নগর হিতৈষিণী সভা" স্থাপন করেন, তখন আর. বি. চ্যাপম্যান সাহেব শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি উত্তরকালে ভারত গবর্ণমেণ্টের ফিন্যান্‌শ্যাল সেক্রেটারি হইয়াছিলেন। টরেন্স সাহেব যখন মেদিনীপুরের কালেক্টর ছিলেন তখন তিনি শিবচন্দ্রের যে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ট্রেভর সাহেবের সহিত শিবচন্দ্রের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই। তিনি সদরকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বর, শিবচন্দ্র রেলওয়ে কমিশনার ডব্‌লিউ, এন্‌স্‌লি সাহেবের অধীনে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের জন্য ভূমিসংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি এরূপ কার্য্য অতীব নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতার সহিত সম্পন্ন করিতেন; রাজা ও প্রজা, উভয় পক্ষেরই সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেন। ১৮৬০ সালের মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে উক্ত কার্য্য শেষ হইলে, এন্‌স্‌লি সাহেব তাঁহাকে ৩রা মার্চ্চ তারিখের একখানি পত্রে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়াছিলেন :—

"As your connection with this office has come to a close, allow me to offer you my best thanks for the able and willing manner in which you have assisted me during the past twelve months."

"এই আফিসের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ শেষ হওয়াতে, আপনি বিগত দ্বাদশ মাস আমাকে যেরূপ যোগ্যতার সহিত ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে বিশিষ্টরূপ ধন্যবাদ দিতেছি।"

এন্‌স্‌লি সাহেব শিবচন্দ্রের সন্তোষজনকরূপে কার্য্যসম্পাদনের কথা গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন।

রেলওয়ে ডেপুটি কালেক্টারের কার্য্য শেষ হইলে, শিবচন্দ্র ১৮৬০ সালের মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে, তিন মাস "প্রিভিলেজ লীভ" এবং পুরা বেতনের ছুটি লইয়া, স্বাস্থ্যের জন্য, তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে,

মুঙ্গের, পাটনা, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, দিল্লী প্রভৃতি উত্তর ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। মিত্র মহাশয়ের "যৎকিঞ্চিৎ" নামক আধ্যাত্মিক পুস্তক এই ভ্রমণের ছায়াবলম্বনে রচিত; ঐ পুস্তকে শিবচন্দ্র "জ্ঞানানন্দ" নামে অভিহিত।

ছুটির অবসানে, শিবচন্দ্র ২৪-পরগণার কালেক্টারি কাছারিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বরে, সবর্ডিনেট্ এক্‌জিকিউটিভ্ সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীতে, ৭০০৲ টাকা বেতনে উন্নীত হইয়াছিলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জেলা ২৪-পরগণার একজন সিভিলিয়ান সহকারী-ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে, তিনি এই ক্ষমতা পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু রেলওয়ে ডেপুটি কালেক্টারের কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে উহা লোপ পায়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বরে, শিবচন্দ্র আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম ব্যতীত কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টারের কর্ম্মেও নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে পর্য্যায়ক্রমে একদিন আলিপুরে ও তৎপরদিবস কলিকাতায় কাছারি করিতে হইত।

এতদুভয় কার্য্য তিনি কিরূপ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কালেক্টারের ১৮৬০-৬১ সালের বাৎসরিক বিজ্ঞাপনীর নিম্নোদ্ধৃত অংশ তাহার পরিচায়ক :—

"Babu S. C. Deb is employed in making over lands required for public purpose, preparing compensation statements, superintending the collections of Calcutta and Punchannogram and the revised settlements of the latter mehal. He has conducted the duties of his office entirely to my satisfaction, and I consider him one of the best Deputy Collectors I have met with."

"বাবু শিবচন্দ্র দেব, সরকারী উদ্দেশ্যের জন্য আবশ্যক জমির হস্তান্তর করণ, তন্নিবন্ধন ক্ষতিপূরণের তালিকা প্রস্তুত করণ, কলিকাতা ও পঞ্চান্নগ্রামের রাজস্ব আদায়ের এবং শেষোক্ত মহলের পরিবর্ত্তিত বন্দোবস্ত সমূহের পর্য্যবেক্ষণ, এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত। তিনি তাঁহার কার্য্যনিষ্পাদনে আমাকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, এবং আমি যে সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডেপুটি কালেক্টারকে দেখিয়াছি, আমার বিবেচনায় তিনি তাঁহাদের অন্যতম।"

গবর্ণমেণ্টের নিকট শিবচন্দ্র এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এলাকা বহির্ভূত বিষয়েও গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে তাঁহার ব্যক্তিগত মত জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহার উদাহরণ স্বরূপ আমরা "১" চিহ্নিত পরিশিষ্টে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের "শিক্ষা" শীর্ষক, ২৮৮ সংখ্যক, ১৮৫৯ সালের ১৭ই জুন তারিখের একখানি

সার্কিউলার পত্রের প্রতিলিপি দিলাম। এই পত্রের শিরোনামায় গবর্ণমেণ্ট শিবচন্দ্রের নামের পর তাঁহার পদোল্লেখ না করিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের "হাল্কাবন্দী" পাঠশালাসমূহের ন্যায় অল্পব্যয়সাধ্য পাঠশালা বঙ্গে স্থাপিত হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। আজকাল জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তদ্বিষয়ে শিবচন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞব্যক্তির মত জানিতে পারিলে বিশেষ সুখী হইতাম।

শিবচন্দ্রের প্রতিপত্তির আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। ভারত-সচিব লর্ড ষ্ট্যানলি তাঁহার ১৮৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ২ সংখ্যক একখানি পত্রে (ডেস্প্যাচে), ["২" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] ভূমির রাজস্বের মূল্য এককালীন গ্রহণ করিয়া ভূমিকে নিষ্কর করণ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করাতে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট, ১৮৫৯ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ১৫১৮ সংখ্যক একখানি পত্রে ["৩" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ], ভারত-সচিবের পত্রে আলোচিত বিষয় সমূহে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করেন এবং স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন যে, আবশ্যক বোধ করিলে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, রাজস্ব বিভাগের কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৰ্ম্মচারীর ("a few officers of mark") এ সম্বন্ধে মত গ্রহণ করিতে পারেন। তদনুসারে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট "রাজস্ব" শীর্ষক, ২৮৪৪ সংখ্যক, ১৮৫৯ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখের একখানি পত্রে ["৪" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] শিবচন্দ্রের মত জিজ্ঞাসা করেন। ভাগ্যক্রমে, শিবচন্দ্রের উত্তরের খসড়াখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে; আমরা তাহার প্রতিলিপি "৫" চিহ্নিত পরিশিষ্টে দিলাম। শিবচন্দ্রের মতের সারমৰ্ম্ম এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিসমূহের বাৎসরিক রাজস্বের বিশ গুণ মূল্য লইয়া উক্ত ভূমিসমূহকে নিষ্কর করিয়া দিলে প্রজাগণ ভূমির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইবে ও গবর্ণমেণ্টের স্থায়ীত্ব কামনা করিবে। অস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমি সমূহের বিগত দশ বৎসরের মোট রাজস্বের গড়ে চিরস্থায়ী বাৎসরিক রাজস্ব ধার্য্য করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্কর করিয়া দিলে রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। কিন্তু পতিত জমির প্রকৃত চরম রাজস্ব নিরূপণ করিবার সময় বহু বৎসর পরে উপস্থিত হইবে; এই নিমিত্ত, পতিত ভূমি সমূহ আপাততঃ বিনা রাজস্বে বা স্বল্প রাজস্বে বিলি করা কর্ত্তব্য; রাজস্বের মূল্য লইয়া এই সকল ভূমিকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য নিষ্কর করা যাইতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য নহে।

কয়েক বৎসরের অতিরিক্ত পরিশ্রমে শিবচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে, তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে, একাদিক্রমে একত্রিশ বৎসরকাল রাজসেবার পর মাসিক ৩৩০।।০ টাকা পেন্‌সনে, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স বাহান্ন বৎসরেরও কম ছিল, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ আরও

তিন বৎসর—অর্থাৎ পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—কর্ম্ম করিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে তাঁহার পেন্‌সন মাসিক ৩৫০্ টাকা হইত; কারণ, তৎকাল প্রচলিত নিয়মানুসারে পেন্‌সন লইবার পূর্ব্বের পাঁচ বৎসরের মোট আয় গণনা করিয়া গড়ে যে মাসিক আয় দাঁড়াইত, তাহার উপর পেন্‌সন ধার্য্য হইত; শিবচন্দ্র দুই বৎসর মাত্র মাসিক ৭০০্ টাকা বেতন পাইয়াছিলেন; সুতরাং আরো তিন বৎসর ঐ বেতন পাইলে, তিনি উহার অৰ্দ্ধেক বা ৩৫০্ টাকা পেন্‌সন পাইতেন। এজন্য তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে আরো. কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী টাকার অপেক্ষা স্বামীর জীবনের মূল্য অনেক বেশী মনে করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত পেন্‌সন লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করিয়া শিবচন্দ্রকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। তিনি পেন্‌সন লইবার অল্প দিন পরে এই নূতন নিয়মজারি হইল যে, কোনও অচিহ্নিত কর্ম্মচারীর বেতন যতই হউক না কেন, পেন্‌সন সালিয়ানা ৪০০০্ টাকার অধিক হইবে না; ইহার অনেক বৎসর পরে উক্ত পেন্‌সনের সীমা ৪০০০্ টাকার পরিবর্ত্তে ৫০০০্ টাকায় ধার্য্য হয়। শিবচন্দ্র বাস্তবিক যে পেন্‌সন পাইয়াছিলেন তাহার সহিত নূতন নিয়মানুযায়ী সর্ব্বোচ্চ পেন্‌সনের প্রভেদ মাসে তিন টাকারও কম। অধিকন্তু, তিনি সময় থাকিতে পেন্‌সন লইয়াছিলেন বলিয়া, উহা প্রায় ২৮ বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পেন্‌সনের মোট টাকা এক লক্ষ সাড়ে দশ হাজারেরও কিছু অধিক হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে উক্ত কাগজের তৎকালীন সম্পাদক স্বর্গীয় রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর মহাশয় শিবচন্দ্রের রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণোপলক্ষে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা, মর্ম্মার্থ সহ, উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি করিলাম।

The Baboo was a highly intelligent and efficient officer. As a revenue official, his knowledge of the fiscal laws of the country was very great; while his familiar acquaintance with English added not a little to his usefulness in the estimation of his superiors. The Deputy Collectors as a class are by no means in good odour with the people on account of their over-zealous proceedings in the interest of Government to the manifest detriment of justice to the people; but Baboo Shib Chunder Deb was an honorable exception to the rule. His high conscientiousness, added to the urbanity of his manners, won for him golden opinions from all parties who had to appear before him, whether gainers or losers. We have before had occasion to allude to the labors of Baboo Shib Chunder in the cause of the amelioration of the condition of his countrymen. Konnaghur owes its excellent English School to his exertions. Unassuming and quiet, he has done a vast deal of good to his country by stealth. Relieved of the cares and troubles of office,

we hope and trust he may long pursue the career of usefulness for the improvement of his countrymen."

"উক্ত বাবু অতি বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি যেমন একজন রাজস্ব-কর্ম্মচারী ছিলেন, তেমনি তাঁহার এতদ্দেশীয় রাজস্ব-সংক্রান্ত বিধিসমূহের প্রভূত জ্ঞান ছিল; তৎসঙ্গে আবার তিনি ইংরাজি ভাষার সহিত সুপরিচিত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিবেচনায় তাঁহার কার্য্যকারিতা বড় সামান্য পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় নাই। শ্রেণী হিসাবে, ডেপুটি কালেক্টারদিগের জনসাধারণের মধ্যে বড় একটা সুনাম নাই; তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা অতিরিক্ত উৎসাহের সহিত গবর্ণমেন্টের স্বার্থ সমর্থন করেন বলিয়া, প্রজার প্রতি ন্যায় বিচারের সুস্পষ্ট হানি হয়। কিন্তু বাবু শিবচন্দ্র দেব এই সাধারণ নিয়মের সম্মানার্হরূপে বহির্ভূত ছিলেন। যে সকল অর্থীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইত, তাহাদের জিত হউক বা হার হউক, তিনি স্বীয় উচ্চ ধর্ম্মভীরুতা ও সৌজন্যগুণে তাহাদের সকলের নিরতিশয় সুখ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র বাবু স্বদেশবাসীদিগের অবস্থার উন্নতিসাধন কল্পে যে সকল চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কোন্নগর, তত্রত্য উৎকৃষ্ট ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য, তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি বিনীত ও শান্তস্বভাব—এইজন্য স্বদেশের প্রভূত হিতসাধন অতি প্রচ্ছন্নভাবে করিয়াছেন। আমরা আশা করি যে, এক্ষণে তিনি কর্ম্মের আনুষঙ্গিক ভাবনা চিন্তা ও কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া, তাঁহার স্বদেশবাসিগণের উন্নতি সাধন কল্পে তাঁহার হিতকর জীবন দীর্ঘকাল যাপন করিবেন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বগ্রামের শ্রীবৃদ্ধিসাধন

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মেদিনীপুর হইতে ২৪-পরগণায় বদলি হইয়া শিবচন্দ্র কোন্নগরের বাটীতে পরিবার রাখিয়া খিদিরপুরে বাসা করিলেন। সপ্তাহে ছয়দিন আলিপুরে কাছারি করিয়া প্রতি শনিবার অপরাহ্নে কোন্নগর যাত্রা করিতেন এবং রবিবার তথায় কাটাইয়া সোমবার প্রাতে আলিপুরে ফিরিয়া আসিতেন। সপ্তাহে এই একটিদিনমাত্র কোন্নগরে কাটাইতে পাইয়া তিনি স্বগ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১২৫৯ সালের ২৯শে আষাঢ় রবিবার (ইং ১১ই জুলাই, ১৮৫২ সাল) গ্রামবাসীদিগকে একটি প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিলেন। উক্ত সভায়, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে "কোন্নগর হিতৈষিণী সভা" নামে একটি সভা স্থাপনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"(১) যাহাতে গ্রামের শোভা বৃদ্ধি ও সাধারণে উপকার হয় তাহাই সাধ্যমত সম্পাদন করা এ সভার প্রধান উদ্দেশ্য;

(২) গ্রামের মধ্যে কোন কুরীতি দৃষ্ট হইলে তাহা সাধ্যানুসারে সংশোধন করিবার চেষ্টা করা যাইবেক, কিন্তু জাতি অথবা দলাদলি সম্পর্কীয় কোন বিষয় এ সভায় আন্দোলিত হইবেক না।

(৩) কোন ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে আর সেই বিপদ দৈবাধীন ঘটিয়া থাকিলে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির কৃতকর্ম্মের ফল না হইলে, তাহার সাহায্য করিতে চেষ্টা করা যাইবেক।

(৪) গ্রামের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয় আর যদি সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করণাভিপ্রায়ে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে এতৎ সভায় আবেদন পত্র প্রেরণ করেন তবে সভার কর্ত্তব্য যে উক্ত বিবাদ ভঞ্জনার্থ বিশেষরূপে চেষ্টা করেন।"

সভার কার্য্য সম্পাদনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এই দুই উপায় অবধারিত হয়—

"(১) সভার উদ্দেশ্য-কার্য্য সকল সম্পাদন করা ব্যয়সাধ্য, এজন্য যাঁহারা এ সভার সভ্য হইবেন তাঁহারা ন্যূনকল্পে বার্ষিক অগ্রিম ২ টাকা বা মাসিক অগ্রিম ।০ চারি আনা প্রদান করিবেন।

(২) বিবাহ কিম্বা অন্য কোন শুভসূচক কর্ম্মোপলক্ষে যাহা দান প্রাপ্ত হয় তাহা সভায় প্রদত্ত হইবেক।"

সভার কার্য্য চালাইবার জন্য কর্ম্মচারীর বন্দোবস্ত এইরূপ করা হইয়াছিল :—

"সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ একজন সভাপতি, একজন সহকারী সভাপতি, একজন ধনাধ্যক্ষ, একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক এবং অন্যূন ৭ জন অধ্যক্ষ থাকিবেন।"

সভার অধিবেশন সম্বন্ধে এই নিয়ম করা হইয়াছিল :—

"প্রতি মাসে প্রথম রবিবারে প্রকাশ্য সভা হইবেক।

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্য এবং বার্ষিক কার্য্যের বিবরণ গ্রহণ ও শ্রবণ এবং অন্যান্য উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন জন্য প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে এক বার্ষিক সভা হইবেক।"

মহাত্মা শিবচন্দ্র কোনও বিষয়ে নিজের প্রাধান্য দেখাইতে ভাল বাসিতেন না। তিনি এই সভার একমাত্র উদ্যোক্তা হইয়াও সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন নাই—কেবল ধনরক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র, স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়, সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গ্রামবাসী ভদ্রমহোদয়গণের সমুচিত অর্থসাহায্যের অভাবে, উক্ত সভা, তিন বৎসর মাত্র কার্য্য করিয়া, ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং জুলাই ১৮৫৫ সাল) লয় প্রাপ্ত হয়। এই শোচনীয় পরিণামে শিবচন্দ্র কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায় :—

শ্রীশ্রীজগদীশঃ

সহায়

শ্রীলশ্রীযুক্ত কোন্নগর হিতৈষিণী সভার সভ্য মহোদয়গণ সমীপেষু

সসম্মান নিবেদনমিদং—

এতদ্ গ্রামের শোভা বৃদ্ধি ও সাধারণের উপকার বিষয়ক নানাপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে এই সভা ১৭৭৪ শকের ২৯ আষাঢ় দিবসে সংস্থাপিতা হয় তাহাতে যদিও এ বিষয়ে গ্রামের অধিকাংশ লোকের সাহায্য কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই তথাচ ন্যূনাধিক চল্লিশজন সভ্যের সহায়তা সহকারে সভার উদ্দেশ্য-কার্য্য সম্পাদনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করা গিয়াছে এবং ঐ উদ্যোগ কি পর্য্যন্ত সফল হইয়াছে

তাহা মহাশয়েরদিগের অবিদিত নাই এবং সভার প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্যের বিবরণে তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে এজন্য অত্রস্থলে তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজনাভাব। এক্ষণে অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে সভ্য মহোদয়গণের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে লাঘব হইয়া এমত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে সভার দিবসে ৩।৪ জন সভ্য ব্যতিরেকে অধিক লোকের সমাগম হয় না। গত বার্ষিক সভার দিবসে শুদ্ধ ৩ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন সুতরাং সে দিবস সভার কোন কার্য্য হইতে পারিল না। অধিকন্তু সভ্যেরা আপন আপন স্বীকৃত দান প্রদানে নিতান্ত অমনোযোগী ইহাতে সভার আয় ক্রমে খাট হইয়া আসিতেছে যথা প্রথম বৎসরে সভার আয় ৩৫১।০ টাকা ও দ্বিতীয় বৎসরে ১৪২ টাকা ও তৃতীয় অর্থাৎ গত বৎসরে ২৭।৷০ টাকা হইয়াছে এবং এই ২৭।৷০ টাকার মধ্যে কেবল ২ টাকা গত বৎসরের দান অবশিষ্ট ২৫।৷০ টাকা তাহার পূর্ব্বকার দান। অতএব যে স্থলে সভ্য মহাশয়দিগের এ প্রকার নিরুৎসাহ ও অমনোযোগ সে স্থলে সভার কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। সুতরাং সভার উদ্দেশ্য-কার্য্য সম্পাদন না হইলে সভা থাকা ও নাথাকা তুল্য, বরং থাকাতে হাস্যাস্পদ হইতে পারে। অতএব আমার বিবেচনায় এই উচিত বোধ হইতেছে যে এক্ষণে সভা উঠাইয়া দেওয়া যায় এবং সভার কোষে যে ২৯ টাকা স্থিত আছে তাহা কোন সৎকর্ম্মে ব্যয় করা যায় আর যদি ভবিষ্যতে গ্রামস্থ লোকের এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন দেখা যায় তবে তখন সভা পুনরায় স্থাপিত করা যাইবেক। আমার এই প্রস্তাবে আপনকারদের যে মতামত হয় তাহা নিম্নে লিখিয়া বাধিত করিবেন। অলমতি বিস্তারেণ ইতি ১৭৭৭ শক ১৪ শ্রাবণ :—

শ্রীশিবচন্দ্র দেব
কোন্নগর

"হিতৈষিণী সভা" যে তিন বৎসর জীবিত ছিল, সে কয় বৎসর গ্রামের রাস্তা মেরামত, অত্যাবশ্যক স্থলে সাঁকো নির্ম্মাণ, দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান, দস্যুভয় নিবারণার্থ সরদার পাইক নিযুক্তকরণ, বাঙ্গালা পাঠশালার জীর্ণসংস্কার, ইংরাজি বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থদান প্রভৃতি বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা সাধ্যমত স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। সভার দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণে, শিবচন্দ্র, সভাকর্ত্তৃক উক্ত বর্ষে কি কি কার্য্যের চেষ্টা বা অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন আমরা, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"প্রথমতঃ গ্রামে দস্যুভয় নিবারণের নিমিত্তে কতকগুলি উপায় অবধারিত হয় ও দুইজন সরদার পাইক তিন মাসের জন্য নিযুক্ত করা যায় এবং গ্রামস্থ জঙ্গল সকল পরিষ্কৃত করাইবার মানসে প্রথমে শ্রীরামপুরের শ্রীযুত জাইণ্ট মেজিষ্ট্রেট ও

পরে শ্রীযুত ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লেখা যায় কিন্তু গ্রামস্থ লোকদিগের নিরুৎসাহ প্রযুক্ত উল্লিখিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামের মধ্যে যে সকল রাস্তা পূর্ব্ববৎসর মেরামত হইয়াছিল তাহা পুনরায় মেরামত করা গিয়াছে এবং তদতিরিক্ত ৺পঞ্চু দত্তের ঘাটের পশ্চিমের রাস্তা মেরামত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ গ্রাম মধ্যে যে সকল মাদক দ্রব্যের দোকান আছে তাহা উঠাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করা গিয়াছে কিন্তু সরকারি কার্য্যকারকদিগের বিপক্ষতা হেতু সভার উদ্যোগ বিফল হইয়াছে।

চতুর্থতঃ সভার বিশেষ যত্ন দ্বারা গ্রাম মধ্যে এক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গত ১৯ বৈশাখ দিবস হইতে পাঠ আরম্ভ হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালাগৃহ অতিশয় ভগ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সভার ব্যয় দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মেরামত হইয়াছে।"

উক্ত বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সভার সামান্য আয়ের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হইয়াছিল; যথা—

গ্রামস্থ রাস্তা মেরামতি	...	৪৯্
দুই জন সরদার পাইকের বেতন	...	৩৩্
ইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ দান	...	১০০্
বাঙ্গালা পাঠশালা মেরামতি	...	৬০্

সভার দ্বিতীয়বার্ষিক কার্য্যবিবরণের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে মাদক দ্রব্যের দোকান সমূহ উঠাইয়া দিবার যে বিফল উদ্যোগের উল্লেখ আছে, শিবচন্দ্রই তাহার মূলে ছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে কোন্নগরনিবাসীদিগের নামে একখানি আবেদন পত্র রচনা করিয়া দেন। ১৮৫৩ সালের ২৫শে জুন তারিখে উক্ত আবেদনপত্র ["৬" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয়। আবেদনের স্থূল মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বে কোন্নগর গ্রামে একখানিও মদের বা অন্য কোনও মাদক দ্রব্যের দোকান ছিল না। যে অল্প সংখ্যক লোক মাদক দ্রব্য সেবন করিত, তাহাদিগকে এক মাইল দূরে রিষড়া গ্রামের একখানি দোকানে যাইতে হইত। গত ৬ কি ৮ বৎসরের মধ্যে সরকার হইতে লাইসেন্স-প্রাপ্ত দুইখানি মদের ও একখানি গাঁজা ও আফিমের দোকান গ্রামের প্রকাশ্যতম স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য গ্রামবাসিগণের নীতির উপর নিরতিশয় কুফল ফলিয়াছে। এখন অনেক যুবকের মাদক সেবনে আসক্তি জন্মিয়াছে, যাহার পূর্ব্বে এ অভ্যাস ছিল না।

লোকের অভাব পূরণের জন্য এরূপ দোকান স্থাপিত হয়, এই বহুশঃ-প্রযুক্ত তর্ক ভ্রান্তিজনক। লোকর বিনা সম্মতিতে, এবং অনেক সময়ে তাহাদের স্পষ্ট প্রতিবাদ

সত্ত্বেও যে, এই সকল দোকান খোলা হয়, এ কথা সকলে এত উত্তমরূপে জানে যে, ইহা প্রমাণ করা অনাবশ্যক।

শুল্ক লইয়া কোনও ব্যক্তিকে সুরা প্রস্তুত করিতে ও বিক্রয় করিতে অনুমতি দেওয়া এক কথা, এবং সাক্ষাৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রলোভনজনক স্থান সমূহে খুচরা বিক্রয়ের দোকান স্থাপন করা ভিন্ন কথা। এরূপ অপকর্ষজনক দোকান স্থাপনে যে কত অসংখ্য কুফল ফলে এবং হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই লোকচরিত্রের উপর এরূপ দোকানের কুপ্রভাব কিরূপ ভীতির চক্ষে দেখে, গবর্ণমেণ্ট ইহা সম্যক্ জানিতে পারিলে অবিলম্বে ইহা পরিবর্ত্তিত করিবেন; কারণ, ইংলণ্ডে ও অপরাপর সভ্যদেশে যে অপেক্ষাকৃত কম আপত্তিজনক প্রণালী প্রচলিত আছে তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক-রাজস্ব-প্রদ প্রণালী এদেশে অবলম্বন করিয়া প্রজাগণের নৈতিক অবনতি সাধন কদাপি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। যে তর্কের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্দ্বারা দেশময় মদ্যাদি মাদক দ্রব্যের দোকান সংস্থাপন যদি সমর্থন করা চলে, তাহা হইলে দ্যূতক্রীড়ার আড্ডা সমূহও গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে স্থাপিত হইবে না কেন? কিন্তু ব্রিটীশগবর্ণমেণ্ট পিতার ন্যায়, যেরূপ প্রজাবর্গের ইষ্ট সাধনে যত্নবান, তাহাতে আশা করা যায় যে আবকারি বন্দোবস্তের কুফল গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত হইলে, দ্যূতক্রীড়াদির ন্যায় তাহাদেরও প্রতীকার হইবে।

মদ্যাদির দোকানের প্রলোভনে পড়িয়া নেশাখোরের সংখ্যা বাড়িয়াছে। নেশাখোরেরা উচ্ছৃঙ্খল ও অপরিণামদর্শী হয়; এজন্য তাহারা অযথা খরচপত্র করিয়া অনেক সময়ে অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে। ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দুষ্কর্ম্ম অধুনা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আবেদনকারীদিগের মহা ভয় ও ক্ষতি হইয়াছে।

উল্লিখিত আপত্তিজনক দোকানগুলি স্থাপিত হইবার পর হইতে দুষ্কর্ম্ম ও দুর্নীতি যেরূপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিলে বোধ হয় যে, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সমৃদ্ধিশালী ভদ্রপল্লীটির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আবেদনকারীদিগের আশা এই যে, আপনি দয়া করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে উক্ত দোকানগুলি উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া এই গ্রামটিকে আসন্নপ্রায় ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আবেদনকারীদিগের প্রার্থনা যেন বিশিষ্ট হেতুমূলক বলিয়া বিবেচনা হয়। একটি নজিরও আছে—প্রায় তুল্যরূপ অবস্থায় উত্তরপাড়া নগর হইতে দুইখানি মদের দোকান সম্প্রতি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের সদাশয় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আর. বি. চ্যাপ্‌ম্যান সাহেব, আবেদন পত্রখানি হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপে প্রেরণ করেন এবং উহার পোষকতা করিয়া

২৮শে জুনে একখানি পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে আবেদনপত্রখানি গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করেন ও বলেন যে আবকারি বন্দোবস্তের মূলে যে অর্থাগম-চিন্তা নিহিত তদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের এই আবেদনে প্রসন্নচিত্তে কর্ণপাত না করিবার কোনও কারণ নাই। চ্যাপম্যান সাহেব, কোন্নগরবাসীরা নগরের উন্নতি কল্পে যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়া, পরিশেষে বলেন যে সম্প্রতি ঐ অঞ্চলে চৌর্য্যাদি অপরাধের বাস্তবিকই শোচনীয়রূপ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, কিন্তু উহা যে মদের দোকান স্থাপনের ফলে হইয়াছে, স্বীয় স্বল্প অভিজ্ঞতা বশতঃ তিনি তাহা বলিতে অক্ষম।

হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট, সি. এস. বেলি সাহেব, শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠির উত্তরে, ১লা জুলাই তারিখে লিখিলেন যে, এ বিষয় তাঁহার এলাকার বহির্ভূত, সুতরাং তিনি আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে প্রস্তুত নহেন; তিনি আবেদনকারীদিগকে হুগলির আবকারি বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিতে পরামর্শ দেন।

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এই উত্তর পাইয়া, নিজের পত্রের ও তদুত্তরের প্রতিলিপিসহ, আবেদনপত্র ২রা জুলাই তারিখে ফেরত দিলেন। হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশানুসারে, শিবচন্দ্র তত্রত্য আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পাঠাইবার জন্য আর একখানি আবেদনপত্র প্রস্তুত করিলেন।

১৮৫৩ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে এই আবেদনপত্র ["৭" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] উক্ত আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। ইহার সঙ্গে পূর্ব্বতন আবেদনপত্রও পাঠান হইয়াছিল বলিয়া নূতন আবেদনপত্রে পূর্ব্বোক্ত কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া কেবল বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছিল যে, কোন্নগরের সমস্ত আবগারি দোকান নূতন স্থাপিত এবং তাঁহাদের সমগ্র উচ্ছেদই আবেদনের উদ্দেশ্য। সাবেক দরখাস্তে ভ্রমক্রমে তিনখানি দোকানের উল্লেখ করা হইয়াছিল; কিন্তু একখানি মদের দোকান সম্প্রতি আর একখানির সহিত মিলিত হওয়াতে, এখন কোন্নগরে কেবল একখানি মদের ও একখানি গাঁজা ও আফিমের দোকান বিদ্যমান। এই সকল দোকান স্থাপনের অপকারজনক ফল সম্বন্ধে আবেদনকারী- দিগের অনুমাত্র সংশয় নাই এবং শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার শেষাংশও এই কথার কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থক।

হুগলির আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সি. কে. ডোভ সাহেব, এই আবেদন পত্রখানি কলিকাতার প্রথম বিভাগের আবকারি কমিশনারের নিকট ১২ই আগষ্ট তারিখে প্রেরণ করিলেন এবং তৎসঙ্গে উহার বিরুদ্ধে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। এই পত্রের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১ম। আমি কোনও মতে এই আবেদনের পোষকতা করিতে পারি না বলিয়া কতিপয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

২য়। আবেদনকারীরা কোন্নগরের কতকগুলি আবকারি দোকান উঠাইয়া দিবার জন্য যে সকল কারণ দেখাইয়াছেন তাহা প্রকৃত কারণ নহে; আসল কথা এই যে, তাঁহাদের আবেদন অনেক পরিমাণে ব্যক্তিগত-বিদ্বেষভাব-প্রণোদিত।

৩য়। আবেদনকারীরা ভঙ্গীক্রমে এইরূপ জানাইয়াছেন যেন আমরা আবকারি রাজস্ব বাড়াইবার উদ্দেশ্যে লোকের মাদক-সেবনের আসক্তি বর্দ্ধন করি; কিন্তু আমরা মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া মাদক-সেবনে উৎসাহ দিয়া থাকি—এ বড় বিচিত্র কথা!

৪র্থ। শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, চ্যাপম্যান সাহেব, অল্পদিন হইল শ্রীরামপুরে আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি যোগ্য লোক হইলেও, এই আবেদন সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার উপযুক্ত নহেন, এবং তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যে অপরাধ-বৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন তাহা মদের দোকান স্থাপনের ফলে হইয়াছে কিনা তাহা বলিবার অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই।

৫ম। আমি ছয় বৎসরের অধিককাল এখানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিতেছি এবং প্রতি বৎসর ভদ্রেশ্বর বিভাগ (কোন্নগর গ্রাম যাহার অন্তর্গত) পরিদর্শন করিয়াছি এবং কোন্নগর গ্রামেও গিয়াছি, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কখনও উক্তগ্রামে স্থাপিত আবকারি দোকানসমূহ সম্বন্ধে কোনও আপত্তি শুনি নাই। আবেদনকারীরা বলিতেছেন যে দোকানগুলি নূতনস্থাপিত। একথা কেবল বিলাতী সরাপের দোকান সম্বন্ধে খাটে; কেন্তু আবেদনকারীরা অপরাধ-বৃদ্ধি-নিবন্ধন যে আপত্তি করিয়াছেন তাহা এই দোকান সম্বন্ধে খাটে না, যেহেতুক যে সকল দরিদ্র শ্রেণীর লোক সচরাচর অপরাধ করিয়া থাকে, তাহারা বেশী দামের বিলাতী সরাপ কিনিতে অক্ষম।

৬ষ্ঠ। অপর দোকানগুলি নয় হইতে বারো বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত। এস. ওয়াকোপ, ডবলিউ. জি. ইয়ং, সি. এস. বেলি, সি. টি. বক্‌ল্যাণ্ড এবং জি. ব্রাইট সাহেবের ন্যায় সুযোগ্য রাজপুরুষেরা বর্ত্তমান জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা অধিকদিন শ্রীরামপুরে ছিলেন; তাঁহার ত এই সকল দোকান স্থাপনের পর অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়া কখনও লক্ষ্য করেন নাই।

৮ম ও ৯ম। গত মে মাস হইতে বালী ও উত্তরপাড়ার আবকারি দোকানগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তজ্জন্য আবকারি রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি কোতরঙ্গে একখানি নূতন দোকান বসাইবার সঙ্কল্প করি। কতিপয় ব্যক্তি এই নূতন দোকান খুলিবার জন্য আমার কাছে আবেদন করে, বিশ্বনাথ সাহা তাহাদের মধ্যে একজন। এই ব্যক্তির দোষেই বালীর আবকারি বন্দোবস্ত ভঙ্গ

হইয়াছিল বলিয়া আমি ইহার আবেদন অগ্রাহ্য করাতে, উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহার স্বপক্ষতা করিয়া আমাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে যদি আমি এই লোককে কোতরঙ্গে দোকান খুলিতে অনুমতি দিই এবং ভদ্রকালী, কোন্নগর ও রিষড়ার তিনখানি দোকানও দিই, তাহা হইলে বালীর দোকান হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইত সেই রাজস্ব এ ব্যক্তি কোতরঙ্গের দোকান হইতে দিতে প্রস্তুত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া ভিন্ন অঞ্চলের লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছি বলিয়া কোন্নগর হইতে এই আবেদন আসিয়াছে।

১০ম। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যদিও এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই, আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, তিনি ইহার মূলাধার, এবং আমার এই ধারণা আরো দৃঢ়ীভূত হইবার কারণ এই যে, তিনি গত মাসের ২৯শে তারিখে টাউন হলে যে বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে এই আবেদন পত্রের অনেকাংশ অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আবেদনকারীরা বলেন যে, অনেক সময়ে লোকের বিনা সম্মতিতে এবং স্পষ্ট প্রতিবাদ সত্ত্বেও দোকান খোলা হয়, কিন্তু আমি যে দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল আবকারি বিভাগে আছি তন্মধ্যে এরূপ ঘটনা আমার গোচরীভূত হয় নাই।

১১শ। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আবেদনকারীরা উত্তরপাড়ার দোকানের উল্লেখ করিয়া যে নজির দিয়াছেন, তাহা নজির বলিয়া ধরা যায় না; যে বিশেষ বন্দোবস্ত অনুসারে উক্ত দোকান বন্ধ হয়, তাহা আপনি জানেন।

আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পত্রের উত্তরে আবকারি কমিশনর, এস. জি. পামার সাহেব, ১৬ই আগষ্ট তারিখে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। এই পত্রের সারমর্ম্ম সম্বন্ধে এক কথায় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আবকারি কমিশনার আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সকল কথায় সায় দিয়া বলিলেন যে, তাঁহারও মত এই যে, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই আবেদনের মূলে আছেন এবং আবেদনে এমন কোনও পর্য্যাপ্ত কারণ দর্শান হয় নাই যদ্দৃষ্টে তিনি কোন্নগরবাসীগণের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন। কেবল তাঁহার পত্রের সপ্তম প্যারায়, তিনি এইটুকু মাত্র লিখিয়াছিলেন যে, উত্তরপাড়া ও চকবালীর দোকানগুলি একটি নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সান্নিধ্য হইতে, অবশ্যম্ভাবী উপদ্রব ও প্রলোভন হইতে ছাত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, উঠাইয়া দেওয়া হয়। আবেদনকারীরা যদি এরূপ কোনও বিশেষ কারণ দেখাইতে পারেন—তাঁহার মতে এমন কোনও কারণ কোন্নগরে নাই—তাহা হইলে তিনি আহ্লাদের সহিত এ বিষয়ের পুনর্ব্বিচার করিবেন।

আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ১৮৫৩ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে, আবেদনকারীদিগের অবগতির জন্য, নিজের পত্রের প্রতিলিপি সহ এই উত্তরের প্রতিলিপি পাঠাইলেন। অপর কেহ হইলে এইখানেই ক্ষান্ত হইতেন; কিন্তু শিবচন্দ্র

সাধারণের হিতকর কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সহজে নিবৃত্তি হইতেন না। আবকারি কমিশনারের পত্রের পূর্ব্বোক্ত সপ্তম প্যারায় যে ক্ষীণ আশার আলোক-রশ্মিটি ছিল, তদ্দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া, শিবচন্দ্র, অদম্য অধ্যবসায় সহকারে, তৃতীয়বার একখানি সুদীর্ঘ আবেদন পত্র রচনা করিলেন।

২রা নবেম্বরে এই আবেদন পত্র [৮ চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। উহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল :—

আপনি আবকারি কমিশনারকে ১২ই আগষ্ট তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, আপনি কোনও মতে কোন্নগরবাসীদিগের আবেদনের পোষকতা করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে আবেদনকারীদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, তাহারা যে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছিল তাহা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া বিশেষভাবে বিবেচিত হয়, ইহাই তাহাদের প্রার্থনা ছিল। সরকারি রাজস্বের একটি গণনীয় অংশ যে রাজকর হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায্যতা বা বৈধতা সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করার ধৃষ্টতা তাহারা করে নাই।

জনসাধারণের নীতির অপকারী বলিয়া আবেদনকারীরা উক্ত দোকানগুলি উঠাইয়া দিবার জন্য যে সসম্মান প্রার্থনা করিয়াছিল, আপনি তাহা ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাবের উচ্ছ্বাস মনে করিয়াছেন, ইহাতে তাহারা বড়ই দুঃখিত হইয়াছে। তাহারা আপনাকে বিশেষ করিয়া জানাইতেছে, যে আপনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা নয়; একথা নিম্নে প্রদত্ত ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

আপনার রিপোর্টের পঞ্চম প্যারা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গ্রামবাসীদিগের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই গ্রামের কষ্টে দূর করিবার চেষ্টা করিতে সক্ষম, এবং তাহাদের অনেককেই কর্ম্মোপলক্ষে কর্ম্মের দিনে ও সময়ে কলিকাতায় থাকিতে হয়, সুতরাং আপনার সময়ে সময়ে গ্রামে আগমন সংবাদ, হয়ত তাহারা মোটেই পায় নাই, নতুবা এমন সময়ে পাইয়াছে যখন আপনাকে কিছু নিবেদন করিবার সুযোগ চলিয়া গিয়াছে। আর একটি কথা আছে—গ্রামবাসীদিগের পরস্পরের সহিত সম্প্রতি যে ঐক্য ঘটিয়াছে, অনতিপূর্ব্বে তাহা ছিল না, এবং ঐক্যের অভাবে অতি সামান্য নাগরিক উদ্দেশ্যও যে সম্পন্ন হয় না, ইহা আপনি স্বীকার করিবেন প্রায় এক বৎসর হইল, "কোন্নগর হিতৈষিণী সভা" নামে একটি সভা স্থাপন দ্বারা উক্ত অভাবের পূরণ হইয়াছে। প্রত্যেক বৈধ উপায় দ্বারা সমাজের হিতসাধনই এই সভার উদ্দেশ্য। আবেদনকারীরা আশা করে যে, আপনি আবকারি দোকান স্থাপন সম্বন্ধে তাহাদের যে ঔদাসীন্যের কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত বিবরণ এখন বেশ বুঝিতে পারিবেন।

পুনশ্চ নিবেদন যে, আবেদনে আবকারি দোকানগুলি সম্বন্ধে "নূতন" শব্দ আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, যেহেতুক ১৮৪১ সালের পূর্ব্বে এই গ্রামে এরূপ

একখানিও দোকান ছিল না, এবং পরে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহাও লোকের ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুসারে নহে।

কোন্নগরে নব-প্রতিষ্ঠিত মদের দোকানে যে সকল বিলাতি সরাপ খুচরা বিক্রয় হয়, তাহাদের দাম বেশি বলিয়া দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা (যাহারা, আপনি ধরিয়া লইয়াছেন, সচরাচর সম্পত্তি-ঘটিত অপরাধ করিয়া থাকে) উহা ব্যবহার করিতে পারে না, সুতরাং আবেদনকারীদিগের আপত্তিসমূহ ঐ দোকান সম্বন্ধে খাটে না, আপনার এই তর্কের বলবত্তা আবেদনকারীরা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, সমধিক ধনশালী ব্যক্তিও যখন পান দোষে দুশ্চরিত্র ও পাপনিরত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত ও খ্যাতিহীন হয়, তখন নিঃস্বতম গ্রামবাসী যে সকল অপরাধ করিয়া থাকে সেও তাহাই করিতে প্রবণ হয়।

আপনার রিপোর্টের ষষ্ঠ প্যারা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ওয়াকোপ, বেলি, ইয়ং, বক্‌ল্যাণ্ড ও ব্রাইট সাহেব উল্লিখিত আবকারি দোকান সমূহ স্থাপিত হইবার পর এই গ্রামে অপরাধের বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনও মত লিপিবদ্ধ করেন নাই বলিয়া যে বাস্তবিক অপরাধের কোনও বৃদ্ধি হয় নাই, আবেদনকারীরা এই তর্ক ঠিক বলিয়া মানিয়া লইতে অক্ষম; বরং তাহারা ইহার প্রতিকূলে দেখিয়াছে যে, আবকারি অনুষ্ঠান সমূহ সমাজের হেয় অংশের প্রিয় হইতে সময় লাগে, এজন্য ইহারা স্থাপিত হইবার যথাকাল পরে ইহাদের কুফলসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়; অতএব এ বিষয়ে বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেটের মত পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মতাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক।

আপনার রিপোর্টের সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম প্যারা সম্বন্ধে সসম্মান নিবেদন এই যে, আপনি বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে অকারণ এই ব্যাপারের ভিতর টানিয়া আনিয়াছেন। এই আবেদনে তাঁহার হস্ত মোটেই নাই। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, কোন্নগর হিতৈষিণী সভার একটি মাসিক অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। তখন বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উক্ত সভার সহিত কোনও সংস্রব ছিল না। উক্ত অধিবেশনে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে দোকান সমূহ উঠাইয়া দিবার জন্য সরকারী কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট আবেদন করা যাউক। আবেদনপত্র প্রস্তুত হইবার পরে (তৎপূর্ব্বে নহে) জয়কৃষ্ণবাবুকে এবিষয় জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণবাবু বিশ্বনাথ সাহার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আপনি সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, এ সকল কথা আপনার প্রদত্ত আবেদনের উত্তর হইতেই আবেদনকারীরা প্রথম জানিতে পারিয়াছিল, তৎপূর্ব্বে কিছুই জানিত না; সুতরাং আবেদন এই কারণে করা হইয়াছিল ইহা একেবারে অসম্ভব।

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় টাউন হলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে আবেদনের অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তখন

আবেদনপত্র সরকারী কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের হস্তে ছিল সুতরাং উহা তখন একখানি সরকারী কাগজ বলিয়া যে কেহ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারিত। জয়কৃষ্ণবাবু যদি উহা দেখিয়া থাকেন, তাহা কোন্নগর নিবাসীদিগের ন্যায্য প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার কারণ হইতে পারে না।

আপনার রিপোর্টের শেষ প্যারা সম্বন্ধে আবেদনকারীরা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করে যে, এ বিষয়ে উত্তরপাড়ার সহিত কোন্নগরের সাদৃশ্য আছে, যেহেতুক কোন্নগরের গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালা পূর্ব্বোক্ত আবকারি দোকানগুলির অনতিদূরবর্ত্তী এবং একটি ইংরাজি বিদ্যালয়ও অনতিবিলম্বে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। উত্তরপাড়ার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রলোভনে পড়িবার যেরূপ সম্ভাবনা ছিল, এখানকার ছাত্রগণেরও ঠিক সেইরূপ।

আবেদনকারীদের ঐকান্তিক আশা এই যে, আবকারি কমিশনার আপনাকে বিগত ১৬ই আগষ্ট তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সপ্তম প্যারার শেষ ছত্রের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, উপরে প্রদর্শিত বিশেষ কারণে, তাহাদের প্রার্থনা পুনর্ব্বিচার করিয়া পূরণ করিবেন।

এই আবেদন পাঠাইবার কিছুদিন পরে, আবকারি কমিশনারের আদেশানুসারে আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কোন্নগরে গিয়া তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য একটি দিন স্থির করিয়া, আবেদনকারীদিগকে উক্ত দিবস তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের বক্তব্য জ্ঞাপন করিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

তদারক শেষ হইলে, আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ১৮৫৩ সালের ২৮শে নবেম্বর তারিখের একখানি সুদীর্ঘ পত্রে তদারকের ফল আবকারি কমিশনারকে জ্ঞাপন করিলেন। উক্ত পত্রের সার কথা এই যে, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী দেশীয় মদের দোকান উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রায় সিকি মাইল দূরে অবস্থিত এবং উহার বহুদিন পূর্ব্বে স্থাপিত। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের অতি সন্নিহিত স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভদ্রলোকদিগের বসতি হইতে উক্ত মদের দোকানের দূরত্ব ২০০ কদমের (পদক্ষেপের) কম নয়, এবং থানা হইতে ৭০ কদমের বেশি নয়। দোকানখানি একে পুলিশের দৃষ্টিপথের অন্তর্ব্বর্ত্তী, তাহাতে আবার হাবড়া যাইবার সদর রাস্তার ধারে স্থাপিত, সুতরাং এখানে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের আশ্রয় গ্রহণের কোনও সুবিধা নাই। তদারকের ফলে আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এই ধারণা হইয়াছে যে, কোন্নগরবাসীরা উক্ত গ্রাম হইতে আবকারি দোকান সমূহ উঠাইয়া দিবার কোনও বিশিষ্ট কারণ দেখাইতে পারেন নাই; তাঁহারা যে সকল সাধারণ হেতু দেখাইয়াছেন তদনুসারে জেলার প্রত্যেক দোকানই উঠাইয়া দিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলে সুরাপান নিবারণ হইবে না, বরং বাড়ি বাড়ি অসংখ্য মদের ভাঁটি স্থাপিত হইবে।

আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্টের উত্তরে আবকারি কমিশনার ৩০শে নবেম্বরে যে পত্র লিখিলেন তাহাতে তিনি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতে মত দিয়া তাঁহাকে আবেদনকারীদিগের অবগতির জন্য রিপোর্টের প্রতিলিপি সহ তদুত্তরের প্রতিলিপি পাঠাইতে বলিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ১৮৫৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, কমিশনারের আদেশ সানন্দে পালন করিয়াছিলেন।

এইরূপে, ছয়মাস-ব্যাপী চিঠিবাজির পর, যখন এই বহ্বারম্ভ লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইল, তখন শিবচন্দ্র অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন। তিনি এখন আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্নগরে এতাবৎকাল ইংরাজি শিক্ষার কোনওরূপ বন্দোবস্ত ছিল না; ইংরাজি শিক্ষার্থীগণকে হয় শ্রীরামপুর নতুবা উত্তরপাড়ায় যাইতে হইত; কোন্নগর হইতে অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রত্যহ এতদূর যাতায়াত করা সুসাধ্য ছিল না, ইহা বলা বাহুল্য। এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে শিবচন্দ্র নিজেই কোন্নগর হিতৈষিণী সভার একটি অধিবেশনে, গ্রামে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, তিনি স্বয়ং একখণ্ড ভূমি দান করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং স্থির হইল যে, বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সভাকর্ত্তৃক সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যে হিতৈষিণী সভা এতদর্থে এক শত টাকা দান করিয়াছিলেন। মোট কত টাকা খরচ হইয়াছিল এবং উক্ত সভার দান ব্যতীত সাধারণে নিকট কত টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল, বিনয়ী শিবচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। উচ্চ পোতার উপর বিদ্যালয়ের উপযোগী একখানি একতলা পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিতে সেই অপেক্ষাকৃত সুলভ মাল মসলার দিনেও যে, তিন চারি হাজার টাকার কম ব্যয় হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে, এবং আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই ব্যয়ভারের একটি গণনীয় অংশ শিবচন্দ্র নিজে বহন করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রই প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইহা তাঁহার একটি অক্ষয়কীর্ত্তি। এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি কোন্নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নিচয়ের যে কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১২৬১ সালের ১৯শে বৈশাখ তারিখে (ইং ১লা মে, ১৮৫৪ সাল) এই বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ হয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রথমে ইহা গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনওরূপ সাহায্য পায় নাই; ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর হইতে ইহা একটি গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য-কৃত বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত এবং প্রায় প্রথম হইতে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

কোন্নগরের ইংরাজি বিদ্যালয় অল্পদিনের মধ্যেই যে এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহার একটি মুখ্য কারণ এই যে, শিবচন্দ্রের অমায়িক ও নিরপেক্ষ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া অনেক কৃতবিদ্য যুবক অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে এই বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষকের বা তন্নিম্নস্থ শিক্ষকের পদ সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইহাদের মধ্যে কতিপয়ের মাত্র নামোল্লেখ করিব। বাবু গঙগাধর আচার্য্য (যিনি পরে মেদিনীপুর কলেজের (হাইস্কুলের) অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন), বাবু কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী (যিনি পরে হাওড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও পরিশেষে সাব-জজ হইয়াছিলেন), বাবু কাশীপ্রসন্ন মিত্র (যিনি ইংরাজি কাব্য সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং কোন্নগরেই যাঁহার অকাল মৃত্যু হয়) এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত (যিনি পরে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন) ক্রমান্বয়ে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; "অমৃতবাজার পত্রিকার" স্থাপয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বাবু শিশিরকুমার ঘোষ ও আগ্রা কলেজের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহার শাস্ত্রাধ্যাপক বাবু নীলমণি ধরও কিয়ৎকাল এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহাদের ন্যায় সুদক্ষ ও সহৃদয় শিক্ষক অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। ইঁহাদের কত ছাত্র উত্তরকালে উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ, সাব-জজ প্রভৃতি হইয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

কোন্নগরের ইংরাজি বিদ্যালয়ের উন্নতির আর একটি প্রধান কারণ এই যে, কোন্নগরের উৎকৃষ্ট সাধারণ পুস্তকালয় বিদ্যালয়-গৃহেই স্থাপিত ছিল বলিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণের পাঠ্য-পুস্তকের অতিরিক্ত পুস্তক পাঠের যেরূপ সুবিধা ছিল, পল্লীগ্রামের অতি অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়েই সেরূপ সুবিধা ঘটে।

কোন্নগরের ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার সাত আট বৎসর পূর্ব্বে, লর্ড হার্ডিংএর আদেশানুসারে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীগ্রামে যে সকল বাঙগালা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল, কোন্নগরের গবর্ণমেণ্ট বাঙগালা পাঠশালা তাহাদের অন্যতম। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে গবর্ণমেণ্ট এই পাঠশালা উঠাইয়া দেন; কিন্তু শিবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের চেষ্টায়, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুনে কোন্নগরে নব প্রবর্ত্তিত বন্দোবস্ত অনুসারে একটি গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত বাঙগালা পাঠশালা স্থাপিত হয়। এই পাঠশালার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন লোপ পাইয়াছে। শিবচন্দ্রের আমলে ইহা বহুবার বাৎসরিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বঙ্গের সমস্ত পাঠশালার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সে সময়ে ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন; পাঠশালার প্রাগুক্ত উন্নতি দর্শনে তৎকালীন বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক, এইচ, উড্রো সাহেব, তাঁহার প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি ইংরাজি ভাষায় কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেই তাঁহাকে ডেপুটি ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত করিবেন, এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী উড্রোসাহেবই কোন্নগরের ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কান্তিবাবুকে হাওড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন এবং পরে তাঁহারই সুপারিশে কান্তিবাবু মুনসেফের পদ প্রাপ্ত হন।

কোন্নগরে একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইলে, শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে, এই ভাবিয়া, ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার অল্পদিন পরেই শিবচন্দ্র উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল হইলেন। তিনি প্রথমে গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, প্রস্তাবিত পুস্তকালয়ের গৃহনির্ম্মাণ ও পুস্তকাদি ক্রয় কল্পে অন্যূন এক সহস্র টাকা ব্যয় হইবে; তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া যদি পাঁচশত টাকা সাহায্যস্বরূপ দান করেন, তাহা হইলে তিনি নিজে গ্রাম হইতে চাঁদা তুলিয়া অবশিষ্ট পাঁচশত টাকা দিবেন। চব্বিশ পরগণার কালেক্টর, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে, একখানি পত্র লিখিয়া তৎসহ শিবচন্দ্রের পত্রখানি নদীয়া বিভাগের (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের) কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহার পর যে কি হইয়াছিল তাহা আমাদের ঠিক জানা নাই; মোট কথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোনও সাহায্য করেন নাই। কিন্তু শিবচন্দ্র ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সাধারণের নিকট চাঁদার বহি পাঠাইয়া প্রস্তাবিত পুস্তকালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই সময়েই ইংরাজি বিদ্যালয়ের দোতালায় পুস্তকালয়ের জন্য দুইটি গৃহ নির্ম্মাণও আরম্ভ করিয়া দিলেন। গৃহ নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল যে, সংগৃহীত চাঁদার মোট ১০০১ টাকা (বলা বাহুল্য যে ইহার একটি গণনীয় অংশ শিবচন্দ্রের নিজের প্রদত্ত চাঁদা) সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছে এবং উক্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য আরো ৩৫০ টাকা লাগিবে। তখন শিবচন্দ্রকে সাধারণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আবার চাঁদার বহি পাঠাইতে হইল—বহি পাঠাইবার পূর্ব্বে তিনি উহাতে স্বয়ং পঞ্চাশ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এইরূপে, শিবচন্দ্রের বহুদিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেলে কোন্নগর সাধারণ পুস্তকালয় প্রথম খোলা হয়। সংগৃহীত সমস্ত অর্থ কেবল গৃহনির্ম্মাণেই নিঃশেষিত হওয়ায়, পুস্তক সংগ্রহের জন্য কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এই অভাব মোচনার্থ শিবচন্দ্র নিজের ব্যবহারের জন্য বহু বৎসর ধরিয়া যে সকল মূল্যবান্ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, নব-প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয়ের বীজস্বরূপ তৎসমুদয় সাধারণের ব্যবহারার্থ দান করিলেন।

পুস্তকালয়ের স্থাপনকাল হইতেই শিবচন্দ্র উহার ধনরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম বৎসরের মাসিক আয় গড়ে পঁচিশ টাকার অধিক ছিল না; এই সামান্য আয়ের কিয়দংশ কর্ম্মচারীগণের বেতনাদিতে ব্যয় হইত, অবশিষ্ট টাকায় শিবচন্দ্র সাধ্যমত পুস্তকালয়ের জন্য উত্তম উত্তম পুস্তক সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি কত গ্রন্থকার ও সম্পাদককে তাঁহাদের রচিত বা সম্পাদিত পুস্তকাদি পুস্তকালয়ে দান করিতে অনুরোধ করিয়া স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন সেক্রেটারী অ্যাশ্‌লি ইডেন সাহেব (যিনি পরে বঙ্গের

লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন) শিবচন্দ্রের অনুরোধে উক্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত গেজেট ও অন্যান্য গ্রন্থাদি কোন্নগরের পুস্তকালয়ে নিয়মিতরূপে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শিক্ষাবিভাগের পরিচালকও শিবচন্দ্রের অনুরোধ শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টাদি কোন্নগরের পুস্তকালয়ে পাঠাইতে স্বীকৃত হন। এইরূপে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা" নামক মহামূল্য গ্রন্থাবলীও শিবচন্দ্রের অনুরোধে বিনামূল্যে কোন্নগরের পুস্তকালয়ে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত হইত।

পুস্তকালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুনে পুনর্গঠিত হয় এবং সেই সময়ে শিবচন্দ্র পুস্তকালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে শারীরিক অসুস্থতা ও দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার সম্পাদকতায় পুস্তকালয়ের বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায়, পুস্তকালয়, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি হইতে কয়েক বৎসর অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুস্তকালয়ের জন্য পুস্তক নির্ব্বাচনে তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেন; সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পুস্তকাদির বিবরণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন এবং কোনও উত্তম অথচ সুলভ মূল্যের গ্রন্থের সংবাদ পাইলেই তাহা আনাইতেন। কেবল সমালোচনা পাঠ করিয়া পুস্তকের গুণাগুণ নির্ণয় তাঁহার মনঃপূত হইত না; এজন্য তিনি প্রাচীন বয়সেও পুস্তকালয়ের জন্য নির্ব্বাচিত কোনও পুস্তক নিজে পাঠ বা পরীক্ষা না করিয়া পুস্তকালয়ভুক্ত করিতেন না; পাছে কোনও দুর্নীতিমূলক গ্রন্থ পুস্তকালয়ে স্থান পায়, এজন্য বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। ফলতঃ তাঁহার যত্নে কোন্নগরের সাধারণ পুস্তকালয়ে কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক ইংরাজী ও বাঙ্গালা সদ্‌গ্রন্থের অভাব ছিল না। পুস্তকালয়ের গ্রাহকগণকে এক কালে একখানি পুস্তক লইবার জন্য মাসিক চারি আনা চাঁদা দিতে হইত। এতদ্ভিন্ন শিবচন্দ্র প্রমুখ কতিপয় পরিপোষক পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ মাসে মাসে বিশিষ্ট চাঁদা দিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শিবচন্দ্র যখন হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন হইতেই স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি কিরূপ অব্যবসায় সহকারে তাঁহার বালিকা স্ত্রীর শিক্ষা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালে তাঁহার কন্যাগণের শিক্ষার্থ তিনি বাটীতেই এক জন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভার্থ তাঁহার চতুর্থী কন্যাকে কলিকাতায় জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট রাখিয়াছিলেন। কোন্নগরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করেন যে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট যদি পাঁচশত টাকা দান করেন, তাহা হইলে তিনিও

সমসংখ্যক টাকা দিতে প্রস্তুত। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট মাসিক ৪৫ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং গ্রাম হইতে মাসিক ১৫ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিবার ভার নিজে গ্রহণ করেন। প্রায় দুই বৎসর কাল যাবৎ পত্রলেখালেখির পর, গবর্ণমেণ্ট শিবচন্দ্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তখন শিবচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনও সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেল, নিজ গৃহেই একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং ছাত্রীদিগের শিক্ষার্থ নিজ ব্যয়েই একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। কিয়ৎকাল গত হইলে, গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক অর্থ দান মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তদনন্তর, শিবচন্দ্র স্বকীয় একখণ্ড ভূমির উপর বালিকা-বিদ্যালয়ের উপযোগী একখানি বাটী নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া বিদ্যালয়টি তথায় স্থাপিত করিলেন। শিবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয় এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে প্রতি বৎসর ইহা হইতে কতিপয় ছাত্রী বাঙ্গালা ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইত। কোন্নগরের বালিকা-বিদ্যালয়টী এখনও বর্ত্তমান।

আমরা এতক্ষণে, শিক্ষার জন্য শিবচন্দ্র স্বগ্রামে যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাকথঞ্চিৎ সমাপ্ত করিলাম। এই বিদ্যালয়গুলির তিনি কেবল জন্মদাতা পিতা ছিলেন না; কিন্তু আজীবন ইহাদের পালনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৺গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয় শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত তিনটি বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসংক্রান্ত গুরুতর চিঠিপত্র ও বাৎসরিক কার্য্য বিবরণাদি শিবচন্দ্র স্বহস্তে লিখিতেন। বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় গৃহসংস্কারাদিও তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করিতেন এবং তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে অনুক্ষণ সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি নিজে আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না বটে, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে শ্রীরামপুরের সিবিলিয়ান জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে এবং নিজের পরিচিত বিদ্যোৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেন; ইঁহারা কেহ কেহ শিবচন্দ্রের অনুরোধে অপর সময়েও বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এসূত্রে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ইনস্পেক্টার উড্রো সাহেব, প্রজাবন্ধু পাদরি লং সাহেব, "ফ্রেণ্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ পত্রের সুপণ্ডিত সম্পাদক ডাক্তার জর্জ স্মিথ সাহেব প্রভৃতি কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তির এবং হপ্‌কিন্‌স্, বক্সওয়েল, কার্‌ষ্টেয়ার্স, হ্যাগার্ড, কলিয়ার প্রভৃতি শ্রীরামপুরের কতিপয় পারস্পরিক

জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটের নামোল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাদরি লং এবং ডাক্তার স্মিথের সহিত শিবচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের অমায়িক সহধর্ম্মিণীরাও আসিতেন এবং শিবচন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তথায় মিষ্টমুখ ও মিষ্টালাপ করিতেন। ডাক্তার স্মিথ্ কোন্নগরের বিদ্যালয়ত্রয় দেখিয়া এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাহাদিগকে স্বীয় সংবাদপত্রে "শিক্ষার প্রায় চূড়ান্ত বন্দোবস্ত" ("an almost perfect educational system") বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার ডফের জীবনী-লেখক, সুবিখ্যাত দার্শনিক সার উইলিয়াম হ্যামিল্টনের শিষ্য এবং ডভ্‌টন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, ডাক্তার জর্জ স্মিথের লেখনী বিনিঃসৃত এরূপ প্রশংসার মূল্য বড় সামান্য নহে। উড্রো সাহেবও কোন্নগরের বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে মুক্তকণ্ঠে শিবচন্দ্রের লোকহিতৈষিতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে যারপর নাই কুণ্ঠিত ও অতিষ্ঠ করিতেন। এই উপলক্ষে শিবচন্দ্রের বাটীতে একটি ভোজের আয়োজন হইত। কলিকাতা হইতে উৎকৃষ্ট পাচক ব্রাহ্মণ আনাইয়া, তিনি সমাগত ভদ্রলোক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইতেন।

ভারত-নারীর অকৃত্রিম বন্ধু, কুমারী মেরী কার্পেণ্টার, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কোন্নগরের বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। উক্ত পূতশীলা মহিলা শিবচন্দ্রের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কোন্নগরের বালিকা বিদ্যালয়, ইংরাজি বিদ্যালয় ও বাঙ্গালা পাঠশালা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বালক-বালিকাদিগকে ভূগোলশাস্ত্রে ও অন্যান্যবিষয়ে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তাহার পর শিবচন্দ্রের বাটীতে গিয়া তাঁহার পত্নীর সহিত অর্দ্ধঘণ্টাকাল কথোপকথন করিয়া, তাঁহার কন্যাদের শিল্পকর্ম্ম দেখিয়া এবং তাঁহার শিশু দৌহিত্রীদিগকে আদর করিয়া, বিধিমতে সৌজন্য দেখান। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার স্বরচিত "ভারতে ছয়মাস" ("Six months in India") নামক গ্রন্থে এই পরিদর্শনের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

"লর্ড রিপণ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সুপ্রণালী সঙ্গত বিবিধ শাসন কার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষের মহৎ উপকার সাধন করিয়া স্বদেশযাত্রা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে" ১৮৮৪ সালের ৭ই ডিসেম্বরে শিবচন্দ্র কোন্নগরনিবাসীদিগকে একটি সভায় আহ্বান করেন। উক্ত সভায় লর্ড রিপণের স্মৃতিরক্ষার্থ চাঁদা তুলিবার প্রস্তাব গৃহীত ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতির ১৪ই ডিসেম্বরের একটি অধিবেশনে শিবচন্দ্র ধনরক্ষক নিযুক্ত হন এবং তৎপরে আর একটি অধিবেশনে ধার্য্য হয় যে অন্ততঃ

দুইশত টাকার চাঁদা তুলিয়া তাহার সুদ হইতে প্রতি বৎসর কোন্নগরের ইংরাজি বিদ্যালয়ের যে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইবে তাহাকে একখানি রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। শিবচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় কয়েক মাসের মধ্যে ২১২৷৷০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনি নিজে ২০৲ টাকা, তাঁহার পুত্র ৫৲ টাকা ও তাঁহার স্ত্রী ২৲ টাকা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধ রাজা দিগম্বর মিত্রের ত্যক্ত সম্পত্তির এক্‌জিকিউটর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু উক্ত সম্পত্তি হইতে ৫০৲ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। চাঁদা সংগৃহীত হইলে পর, স্মৃতিরক্ষা-সমিতির প্রার্থনানুসারে গবর্ণমেণ্ট একটি স্থায়ী অর্থ সংস্থানের জন্য, চাঁদার টাকা হইতে শতকরা ৪৲ টাকা সুদের ২০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিবার অনুমতি দিয়া, হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই উদ্দেশ্যে উহার এডমিনিষ্ট্রেটর বা অছি নিযুক্ত করিলেন যে, প্রতি বৎসর কোন্নগরের ইংরাজি বিদ্যালয়ে যে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইবে তাহাকে যেন উক্ত কাগজের সুদ হইতে "রিপণ মেডাল" নামে একখানি রৌপ্য পদক দেওয়া হয়। ১৮৮৬ সাল হইতে এই মেডাল প্রতি বৎসর প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ইহার মূল্য ৮৲ টাকা ছিল, এখন সুদের হ্রাস হওয়াতে, ইহার মূল্য ৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপে, শিবচন্দ্র, মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, স্বপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজি বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের জন্য, পুণ্যস্মৃতি লর্ড রিপণে নামে, একটি বাৎসরিক পুরস্কার প্রদানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া যান। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর, ইংরাজি বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য প্রদত্ত ভূমি (মায় ইমারত) সম্বন্ধে তিনি একখানি ট্রষ্ট-ডীড্ বা অর্পণ নামা প্রস্তুত করিয়া, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু সত্যপ্রিয় দেব, এই তিনজনকে ট্রষ্টী বা অছি নিযুক্ত করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন গতাসু হইয়াছেন। কোন্নগর ইংরাজি বিদ্যালয়ের পুরাতন গৃহ সম্প্রতি ভূমিসাৎ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। হুগলির খ্যাতনামা ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্র্যাড্‌লি-বার্ট সাহেব, বিগত ৩০শে জুন তারিখে, নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। নূতন গৃহনির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয় ৩৭,০০০ টাকায় ধার্য্য হইয়াছে—তন্মধ্যে ১২,০০০ টাকা বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকিল ৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শেষ নিয়োগপত্র দ্বারা বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও ১২,০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং অবশিষ্ট টাকা স্থানীয় চাঁদা হইতে সংগৃহীত হইবার আশা আছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শিবচন্দ্রের অমর কীর্ত্তির এই নূতন অধিকরণের কুশল কামনা করি।

আমরা এইবার, শিবচন্দ্র কোন্নগরের আরো কি কি অভাব মোচন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

যখন লৌহবর্ত্মের সৃষ্টি হয় নাই, তখন ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কোন্নগর গ্রাম হইতে রাজধানী কলিকাতায় বা জেলার সদর-ষ্টেশন হুগলি নগরে যাইতে হইলে নৌপথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও সুলভ ছিল। কিন্তু নৌযাত্রা ঝড় তুফানের সময়ে ঘোর বিপৎসঙ্কুল ছিল এবং অন্য সময়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইলেও, অনেক সময়ে প্রতিকূল জোয়ার ভাঁটা ও বায়ুর গতি নিবন্ধন বিস্তর কালবিলম্ব ও তজ্জনিত অসুবিধা ঘটিত। যখন রেলপথ ছিল না, তখন নৌপথের সকল অসুবিধা, সকল বিপত্তি লোকে নীরবে ভোগ করিত; কারণ, তখন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যখন প্রথম রেলপথ খোলা হইল, তখন লোকে রেলযাত্রার সহিত নৌযাত্রার তুলনায় সমালোচনা করিয়া রেলযাত্রার সুবিধাজনকত্ব বেশ বুঝিতে পারিল এবং নৌযাত্রার বিভীষিকা ও অসুবিধাসমূহ সম্বন্ধে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ উদাসীন থাকিতে পারিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি যখন সাধারণের ব্যবহারার্থ হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রথম রেল খোলেন, তখন লাভালাভ কিরূপ হইবে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া উক্ত দুই ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি প্রধান প্রধান স্থানে ষ্টেশন স্থাপিত করিয়া তথায় গাড়ি থামাইবার বন্দোবস্ত করেন।

এই বন্দোবস্ত অনুসারে বালীগ্রামে ও শ্রীরামপুরে ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু উহাদের মধ্যবর্ত্তী কোন্নগর গ্রামে কোনও ষ্টেশন স্থাপিত হয় নাই; এজন্য কোন্নগরনিবাসীদিগকে রেল ধরিতে হইলে তিন মাইল পথ হাঁটিয়া হয় শ্রীরামপুর নতুবা বালী যাইতে হইত; সুতরাং তাহারা রেলযাত্রার সুবিধা ভোগে একপ্রকার বঞ্চিত হইয়াছিল। কোন্নগরে যাহাতে একটি ষ্টেশন স্থাপিত হয় তজ্জন্য শিবচন্দ্র, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট বা কর্ম্মকর্ত্তার নিকট আবেদন করেন এবং তৎসহ কর্ম্মোপলক্ষে প্রত্যহ কলিকাতা-যাত্রী প্রায় দেড় শত কোন্নগরবাসীর নামের একখানি তালিকা দেন। ২৪-পরগণার কালেক্টার উক্ত আবেদন ও তালিকা, শিবচন্দ্রের অনুরোধ রেলওয়ের এজেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই আবেদনের ফলে, রেলওয়ে কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ষ্টেশন সমূহের তালিকায় কোন্নগরের নাম নিবিষ্ট ও ভাড়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু ইহার পর কিয়ৎকাল গত হইলেও ষ্টেশনগৃহ নির্ম্মাণের কোনও সূচনা না দেখিয়া, শিবচন্দ্র, কোন্নগর নিবাসীগণের নামে একখানি পত্র লিখিয়া এজেণ্টকে বর্ষার পূর্ব্বেই ষ্টেশন গৃহ নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা দিতে অনুরোধ করেন এবং বুঝাইয়া দেন যে, কোন্নগরে ষ্টেশন খোলা হইলে, নিকটবর্ত্তী রিষড়া, কোতরঙ্গ, বাঁশাই, নপাড়া, কানাইপুর, জনাই, পানিহাটী, আগড়পাড়া ও সুখচর গ্রামের লোকেরাও বিশেষ প্রকারে উপকৃত হইবে।

কোন্নগরের ষ্টেশনগৃহ ১৮৫৬ সালের এপ্রেল মাসের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু জুলাই মাসের পূর্ব্বে খোলা হয় নাই। এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া

শিবচন্দ্র রেলওয়ে কোম্পানিকে দুইবার (৩রা এপ্রেল ও ১৬ই জুন) পত্র লিখিয়াছিলেন, বাহুল্যভয়ে আমরা তন্মধ্যে কেবল একখানি পত্র এই জীবনীতে সন্নিবেশিত করিলাম ও তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রকটিত করিলাম; অপরগুলি হইতে কেবল কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়াছি। কোন্নগরে প্রথম ষ্টেশন খোলা হইবার পর, যাহাতে বহুসংখ্যক লোক রেলপথে যাতায়াত করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে, শিবচন্দ্র, ১৮৫৬ সালের ২১শে জুলাই তারিখে, উক্ত পত্রখানি [৯ চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির কার্য্যপরিচালককে লিখিয়াছিলেন; উহার স্থূল মর্ম্ম এই—

"কোন্নগরে একটি ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা (কোন্নগর ও তৎসান্নিধ্যের নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিবাসীগণ) রেলওয়ে কোম্পানিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি এবং তৎসঙ্গে আপনাকে নিবেদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি যে, বহুসংখ্যক লোক, যাহারা অন্যথা দৈনিক ট্রেনের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিত, নিম্নোক্ত কারণে সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

প্রথমতঃ—উর্দ্ধাভিমুখ ও নিম্নাভিমুখ দূরগামী ট্রেনসমূহ এই ষ্টেশনে থামে না। কোন্নগর ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহ যে জেলার অন্তর্গত, হুগলিই সেই জেলার দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বসম্বন্ধীয় শাসনের কেন্দ্র; অতএব এ অঞ্চলের লোকের বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় যাইবার যেরূপ প্রয়োজন হয় হুগলি যাইবারও প্রায় সেইরূপ প্রয়োজন হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ট্রেনসমূহ কোন্নগরে থামে না বলিয়া লোকে ভ্রমণের এই সুবিধাজনক ও দ্রুত উপায় অবলম্বন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—ষ্টেশন হইতে নদী পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে তাহার অপকৃষ্ট অবস্থাও আর একটি কারণ, যে জন্য অল্পসংখ্যক লোক প্রত্যহ ট্রেনে চড়িয়া কলিকাতা গমন করে। গ্রামখানি গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং ষ্টেশন হইতে গঙ্গা প্রায় এক মাইল দূরে; লোকে যৎপরোনাস্তি কর্দ্দমাক্ত পথের উপর দিয়া এতদূর হাঁটিতে চাহে না; কারণ, তাহারা অনায়াসে নৌকাযোগে কলিকাতায় যাইতে পারে—বিশেষতঃ বৎসরের এই সময়ে, যখন নদীর নিম্নাভিমুখ স্রোত অত্যন্ত প্রবল। উক্ত রাস্তাটি যদি কিঞ্চিৎ প্রশস্ত ও পাকা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস এই যে, এখন যাহারা নৌপথে কলিকাতায় যায় তাহারা সানন্দে রেলপথ অবলম্বন করিবে।

তৃতীয়তঃ—তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীগণের জন্য যে ভাড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহা তাহাদের অনেকের আর্থিক অবস্থার পক্ষে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ধরা হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা অন্যরূপ হইলে, উল্লিখিত অপকৃষ্ট রাস্তাজনিত অসুবিধা কোন্‌কালে দূরীভূত

হইত! কোন্নগর হইতে হাবড়া একবার মাত্র যাইবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর বর্ত্তমান ভাড়া দুই আনা এবং এই শ্রেণীর আরোহীদিগকে যাতায়াতের টিকিট দেওয়া হয় না, সুতরাং প্রতিদিন যাতায়াতের খরচ চারি আনা পড়ে; তদ্ভিন্ন হাবড়ায় নদী পার হইবার জন্য এক পয়সা দিতে হয়। প্রতি মাস হইতে রবিবার ও ছুটির দিনের জন্য গড়ে ছয় দিন বাদ দিলে মাসিক খরচ প্রায় সাড়ে ছয় টাকা দাঁড়ায়। আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, অধিকাংশ গ্রামবাসীর মাসিক আয় ১৫্ কি ২০্ টাকার অধিক নহে এবং নৌযাত্রায় তাহাদের মাসে ২্ কি ৩্ টাকা খরচ হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রেলযাত্রার মাসিক খরচ তাহাদের অবস্থার অতিরিক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগকে যদি যাতায়াতের টিকিট দেওয়া হয়, তাহা হইলে বহুসংখ্যক লোক ট্রেনের সুবিধা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে।

পরিশেষে, আমাদের নিঃসংশয় ধারণা এই যে, রেলওয়ে কোম্পানি যেরূপ উদারভাবে বঙ্গদেশে এই সৎকীর্ত্তির বিস্তার করিয়াছেন, সেইরূপ ঔদার্য্য-প্রণোদিত হইয়া আমাদের এই সসম্মান আবেদনের বিচার করিবেন।"

রেলওয়ের এজেণ্ট, শিবচন্দ্রের উপরোক্ত পত্রের উত্তরে, ২রা আগষ্টে লিখিলেন—

"প্রথমতঃ—দূরগামী ট্রেন সমূহ কোন্নগরে থামাইলে যাত্রীর সংখ্যা যে বিশেষ বাড়িবে রেলওয়ে কোম্পানি এরূপ মনে করেন না, সুতরাং উক্ত ট্রেনসমূহ থামাইবার বন্দোবস্ত আপাততঃ করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে গ্রাম হইতে ষ্টেশন যাইবার রাস্তা প্রশস্ত ও মেরামত করিবার জন্য লেখা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে রাস্তার কষ্ট দূরীভূত হইবে।

তৃতীয়তঃ—তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগকে যাতায়াতের টিকিট দেওয়ার সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি আছে।"

অতঃপর, শিবচন্দ্র উল্লিখিত রাস্তা মেরামতের কথা রেলওয়ে কোম্পানিকে দুইবার (১৮৫৬ সালের ২৫শে নবেম্বরে ও ১৮৫৭ সালের ১৩ই এপ্রেলে) স্মরণ করাইয়া দিবার পর, উক্ত কোম্পানি, ১৮৫৭ সালে, রেলযাত্রীদিগের সুবিধার জন্য, রাস্তাটি নিজ ব্যয়ে প্রশস্ত ও পাকা করিয়া দেন। তৎপরে, ১৮৬০ সালে, শিবচন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, রেলওয়ে কোম্পানি উক্ত রাস্তার আংশিক জীর্ণসংস্কার সম্পন্ন করেন। ১৮৬২ সালে, বহুদিনের বেমেরামতিতে রাস্তাটির আবার শোচনীয় অবস্থা ঘটাতে, শিবচন্দ্র উক্ত সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরে একখানি পত্র লিখিয়া রেলওয়ের এজেণ্টকে রীতিমত রাস্তা-মেরামতের আদেশ দিতে অনুরাধ করেন। এই পত্রের শেষভাগে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল যে, উল্লিখিত রাস্তাটি রেলপথের একটি পোষকবর্ত্ম

("a Railway feeder"), অতএব উহার সংস্কার কল্পে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা জেলার ফেরি-ফণ্ড (পারঘাটের আয়) হইতে নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। এই ইঙ্গিত অনুসারে রেলওয়ে কোম্পানি ফেরি-ফণ্ড কমিটির সেক্রেটারিকে উক্ত রাস্তা উত্তমরূপে মেরামত ও প্রশস্ত করিতে অনুরোধ করেন। তদবধি উক্ত ফণ্ড কোন্নগরের গ্রাম হইতে ষ্টেশনগামী রাস্তা সংরক্ষণে ভার গ্রহণ করে। কিন্তু কেবল ফেরি-ফণ্ডের টাকায় রাস্তাটি উত্তমরূপে মেরামত ও প্রশস্ত করিবার ব্যয় সঙ্কুলান হইবে না এই আশঙ্কা করিয়া শিবচন্দ্র এ বিষয়ে উক্ত ফণ্ডের সাহায্যকল্পে গ্রাম হইতে প্রায় চারিশত টাকার চাঁদা তুলিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তিনি নিজে ৫০্ টাকা, তাঁহার বন্ধু বাবু দিগম্বর মিত্র ২৫্ টাকা এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু গিরিশচন্দ্র দেব ২০্ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন।

উর্দ্ধাভিমুখ ও নিম্নাভিমুখ দূরগামী দিবাভাগের ট্রেনগুলি যাহাতে কোন্নগরে খামে তজ্জন্য শিবচন্দ্র রেলওয়ে কোম্পানিকে আরো দুইবার (১৮৫৭ সালের ২৭শে এপ্রেলে ও ২রা জুনে) পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে উক্ত কোম্পানি শিবচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। কোন্নগরের যাত্রীদিগের ট্রেনের সুবিধার জন্য, শিবচন্দ্র রেলওয়ে কোম্পানিকে পত্র লিখিতে কখনও অবহেলা করেন নাই, যদিও সকল সময়ে সমানরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কোন্নগরে ডাকঘর ছিল না বলিয়া গ্রামবাসীরা বিশেষ অসুবিধা বোধ করিত। ডাকে চিঠি পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে, তাহাদিগকে হয় বালী, নয় শ্রীরামপুর, যাইতে হইত। এই অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে, শিবচন্দ্র, ১৮৫৮ সালের ১২ই এপ্রেলে, কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার জেনেরালকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন যে, কোন্নগরে বহুসংখ্যক লোকের বাস, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে বাণিজ্য-কার্য্যে ব্যাপৃত। এখানে একটি গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য-কৃত ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয় ও একটি সাধারণ পুস্তকালয় আছে, কিন্তু ডাকঘর নাই বলিয়া লোকে বিশেষ অভাব বোধ করে এবং এখানে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন থাকায় ডাকঘর বসান কঠিন বা ব্যয়সাধ্য হইবে না। মাসিক ১৫্ টাকা ব্যয়ে একটি ছোট ডাকঘর স্থাপিত হইতে পারে এবং প্রাপ্ত ও প্রেরিত চিঠির ডাকমাশুল হইতে উক্ত ব্যয়ের সঙ্কুলান হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায়। পরিশেষে শিবচন্দ্র পোষ্টমাষ্টার জেনেরালকে আপাততঃ তিন মাসের পরীক্ষায় কোন্নগরে একটি ডাকঘর খুলিতে অনুরোধ করেন এবং উক্ত পরীক্ষাকালে আয়ের অতিরিক্ত যদি কিছু ব্যয় হয় তজ্জন্য নিজে দায়ী হইতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে, উক্ত সালে, কোন্নগরে একটি ক্ষুদ্র ডাকঘর অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়া পরে স্থায়িত্ব লাভ করে। অধুনা কোন্নগরের ডাকঘর বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী এবং ইহার কার্য্যকলাপ সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

দাতব্য ঔষধালয়ের অভাব, কোন্নগরের একটি চিরন্তন অভাব। কোন্নগর হিতৈষিণী সভা হইতে এই অভাব মোচনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাবে সে চেষ্টা কার্য্যকরী হয় নাই।

এদেশে হোমিওপ্যাথি-নামক অভিনব চিকিৎসা-প্রণালীর অধুনা যেরূপ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তখন অতি অল্প-সংখ্যক লোকই এই মতের চিকিৎসায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। বহুবাজারের প্রসিদ্ধ দত্তবংশ-সম্ভূত ৺রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় (জন্ম-১৮১৮, মৃত্যু-১৮৮৯ খৃঃ অঃ) এদেশে হোমিওপ্যাথির প্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি যে সেকালের প্রসিদ্ধ গ্রীক বণিক্, শিলিজি সাহেব, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথির পরিচয় দেন। রাজেন্দ্র বাবুই প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ও মহাত্মা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এই মতাবলম্বী করেন, এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে নবাগত ডাক্তার বেরিণিকে আশ্রয় দেন। হোমিওপ্যাথির সেই প্রথম যুগেই শিবচন্দ্র উক্তমতের প্রতি আস্থাবান্ হন। তিনি ১৮৬৩ সালে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, নিজবাটীতে সমাগত রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করিতে ও ঔষধ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ঔষধার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি ১৮৬৬ সালের এপ্রেল মাস হইতে নিজব্যয়ে একজন কম্পাউণ্ডার বা ঔষধ-পরিবেশক নিযুক্ত করেন। এই বন্দোবস্ত ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। উক্ত সালে, কোন্নগরে একটি সাধারণ হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনোদ্দেশ্যে শিবচন্দ্র স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে একটি প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করেন। ঐ সভায় বাবু রাজেন্দ্র দত্ত সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উল্লিখিত দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। তদনুসারে ১৮৬৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, শিবচন্দ্র কর্ত্তৃক ঔষধালয়ের ব্যবহারার্থ প্রদত্ত একটি বাটীতে প্রস্তাবিত দাতব্য ঔষধালয়টি খোলা হয়। সে সময়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও বাবু রাজেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি হোমিওপ্যাথির পৃষ্ঠপোষক কতিপয় মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, সাধারণের সহায়তার অভাবে, ঔষধালয়টি পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে বন্ধ হয়, কিন্তু ঔষধবিতরণ একেবারে বন্ধ হয় নাই। শিবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে, তাঁহার নিজবাটীতে সমাগত রোগীদিগকে, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়ে, বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত বিতরিত হইত। শিবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শেযোক্ত সালের ডিসেম্বর মাসে স্বামী-গৃহে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার শেষ নিয়োগপত্রে ইহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করেন।

১৮৭৫ সালের শরৎকালে কোন্নগরে দেশব্যাপী জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বিস্তর লোক মারা যায়। সিউড়ির (পরে বর্দ্ধমানের) প্রসিদ্ধ উকিল ৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

মহাশয় ১৮ই নবেম্বরে শিবচন্দ্রের নিকট দরিদ্র রোগীদিগের জন্য ঔষধ ক্রয়ার্থ একশত টাকার একখানি নোট পাঠাইয়া তাঁহাকে ত্বরায় একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু শিবচন্দ্র ইহার পূর্ব্বেই, ৮ই নবেম্বরে, এই উদ্দেশ্যে একটি সভা আহূত করিয়াছিলেন। ঐ সভায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় স্থির হয় যে, কোন্নগরে একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হওয়া অত্যাবশ্যক এবং তজ্জন্য গ্রাম হইতে চাঁদা সংগ্রহ ও শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির নিকট মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করা হউক, তৎপরে গবর্ণমেণ্টের নিকট বিধিমত সাহায্যের জন্য আবেদন করা হউক, এবং এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এখন একটি কমিটি গঠিত হউক।

গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে, কোন্নগরের দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য স্থানীয় রাজকোষে মাসে মাসে ৪০্ টাকা (তন্মধ্যে ২০্ টাকা চাঁদা হইতে সংগৃহীত এবং ২০্ মিউনিসিপ্যালিটি হইতে সাহায্যস্বরূপ প্রদত্ত হইত) জমা দিতে হইত। গবর্ণমেণ্ট উক্ত ৪০্ টাকার নিম্নোক্তরূপ ব্যয় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন :—

	মাসিক।
একজন নেটিভ ডাক্তারের অর্দ্ধেক বেতন	১৫্ টাকা।
একজন কম্পাউণ্ডারের বেতন ...	১০্ টাকা।
একজন ভৃত্যের বেতন	৫্ টাকা।
বাজে খরচ	১০্ টাকা।
	মোট ৪০ টাকা।

নেটিভ ডাক্তারের বেতনের অপরার্দ্ধ গবর্ণমেণ্ট নিজে দিতেন এবং নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দমত বিলাতি ঔষধাদিও স্বীয় ঔষধ-ভাণ্ডার হইতে ঔষধালয়ের ব্যবহারার্থ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন; কিন্তু তদতিরিক্ত বিলাতি ঔষধাদির প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্টকে মূল্য দিতে হইত। বাজারের ঔষধসমূহ ঔষধালয়কে (চাঁদা হইতে) নিজব্যয়ে সংগ্রহ করিতে হইত।

উপরোক্ত দাতব্য ঔষধালয়টি প্রথমতঃ কতিপয় দিবসের জন্য, ডাক্তার কালিদাস বসু মহাশয়ের ভবনে স্থাপিত হয়; তৎপরে উহার ব্যবহারার্থ শিবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাঁচ বৎসরকাল কোন্নগর গ্রামকে ভীষণ দেশব্যাপী জ্বরের প্রকোপ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিল। উক্ত জ্বরের প্রাদুর্ভাবের কথঞ্চিৎ হ্রাস হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট, ১৮৮১ সালে, ঔষধালয়টি উঠাইয়া দিবার আদেশ দেন।

কোন্নগর হিতৈষিণী সভা স্থাপন কালে শিবচন্দ্রের একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কিসে গ্রামের রাস্তাঘাট ও জলনির্গমের পথ প্রভৃতির উন্নতিসাধন করিয়া এবং জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য ও শোভা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু গ্রামবাসীদিগের অনুৎসাহ ও ঔদাসীন্যপ্রযুক্ত তিনি তখন ইচ্ছানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে যখন তিনি দীর্ঘকাল শ্রীরামপুরের অন্যতম মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তখন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

১৮৬৪ সালের ৩ আইন অনুসারে, ১৮৬৫ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শ্রীরামপুরের একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত করেন। কোন্নগর শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ছিল, এখন রিষড়া ও কোন্নগর শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির বহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র যুক্ত-মিউনিসিপ্যালিটিতে পরিণত। মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের মধ্যে আংশিকভাবে নির্ব্বাচন-প্রণালী-প্রবর্ত্তনের জন্য যখন ১৮৭৬ সালের ৫ আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখন শিবচন্দ্রই শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে উক্ত আইন অনুসারে পুনর্গঠিত করিবার প্রস্তাব করেন। বঙ্গের তৎকালীন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর, সার জর্জ ক্যাম্বেল, শিবচন্দ্রকে একজন গবর্ণমেণ্ট-মনোনীত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তদনুসারে শেষোক্ত প্রকারেই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য পরিচালনায় অনলসভাবে যোগদান করিতেন এবং প্রয়োজনমত রাস্তাঘাট ও জলনির্গমের পথাদি স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন। একবার তিনি একমাসের জন্য (১৮৭২ সালের ১৮ই মার্চ্চ হইতে ১৮ই এপ্রেল পর্য্যন্ত) মিউনিসিপ্যালিটির সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রাচীন বয়সে ও দুর্ব্বল শরীরে শ্রীরামপুরে যাতায়াত করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইলেও, কর্ত্তব্যপরায়ণ শিবচন্দ্র নিয়মিত সময়ে মিউনিসিপ্যালিটির অধিবেশনসমূহে উপস্থিত হইয়া মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। যে সকল তরুণ-বয়স্ক সিভিলিয়ান ক্রমান্বয়ে শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইতেন, প্রায় তাঁহারাই মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি হইতেন এবং বৃদ্ধ শিবচন্দ্রের কার্য্যকারিতা ও সাধুতা দর্শনে তাঁহার প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হইতেন ও তাঁহার সকল সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতেন। এইরূপে শিবচন্দ্র যে ত্রয়োদশ বৎসর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন, সে সময়ে বিবিধ বিধানে কোন্নগরের কল্যাণসাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরিশেষে, স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, ১৮৭৮ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন এবং ৬ই মে তারিখে বঙ্গের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর শিবচন্দ্রের ইস্তফা গ্রহণ করেন।

পেন্‌সন গ্রহণ করিবার অনেক বৎসর পরেও তিনি একজন সুযোগ্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনার বলিয়া জেলার রাজপুরুষদিগের নিকট এরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন যে, হুগলির এক্‌টিং ম্যাজিষ্ট্রেট, এফ. এইচ, পেলিউ সাহেব, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১৮৭১ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে শিবচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া জানান যে, তিনি সর্ব্বদাই শিবচন্দ্রের যোগ্যতা ও কর্ম্মিষ্ঠতার সুখ্যাতি শুনিয়া আসিতেছেন, অতএব তাঁহাকে শ্রীরামপুরের সাবরেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে অনুরোধ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে শিবচন্দ্রের মত জিজ্ঞাসা করেন। এরূপ স্থলে পেলিউ সাহেবের খাতির এড়াইতে না পারিয়া শিবচন্দ্র তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদনুসারে, তিনি ১৮৭১ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে শ্রীরামপুরের সাবরেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু প্রত্যহ কোন্নগর হইতে শ্রীরামপুর যাতায়াতের কষ্টে তাঁহার স্বাস্থ্যের হানি হওয়ায় এবং তদনুরূপ পারিশ্রমিক লব্ধ না হওয়ায় তিনি পর বৎসর এপ্রিল মাসে উক্ত কর্ম্মে ইস্তফা দেন।

হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট, সার উইলিয়ম হর্শেলের অনুরোধে, গবর্ণমেণ্ট শিবচন্দ্রকে একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি অসুবিধা নিবন্ধন উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন কোন্নগর ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, (১৮৭০-৭৪ খৃঃ অঃ) তখন তিনি শ্রমজীবীদিগের জন্য কোন্নগরে একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পরে, শিবচন্দ্রের যত্নে এবং প্রধানতঃ তাঁহার অর্থ সাহায্যে. আর একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া অনেক দিন ছিল। কিন্তু শ্রমজীবীরা—যাহাদের শিক্ষাই উক্ত বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—ঐ সুবিধা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া, বিদ্যালয়টি পরিশেষে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

হুগলির সম্ভ্রান্ত ঘোষবংশ সম্ভূত সঙ্গীত শাস্ত্রবিশারদ ৺সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যখন ১৮৭৪ সালের ১লা মার্চ্চ কোন্নগরে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টিও স্থায়ী হয় নাই।

শিবচন্দ্রের ও কতিপয় শিক্ষিত যুবকের সমবেত চেষ্টায়, ১৮৮৪ সালের ২৯শে অক্টোবরে কোন্নগরে একটি রেট্‌পেয়ার্স্‌ এসোসিয়েশন (টেক্স-দাতার সভা) স্থাপিত হয় এবং কিয়ৎকাল স্থগিত থাকিয়া ১৮৮৭ সালে পুনর্জ্জীবিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত সকল বিষয় এই সভায় আলোচিত হইয়া থাকে।

আমরা এই সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদের উপসংহারে কেবল একটি মাত্র কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে, শিবচন্দ্রের ন্যায় আর একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক স্বগ্রামের এরূপ

সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আমরা এমন সংবাদ পাই নাই; তিনি নীরবে কোন্নগরের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, অনেক রাজা মহারাজাও তাহা করিতে পারিতেন কিনা, সন্দেহস্থল। তিনি রাজসম্মানের প্রার্থী হইয়া বা লোকরঞ্জন হইবেন বলিয়া কোনও কাজ করেন নাই। তিনি অনতিদুর্ল্লভ "রায় বাহাদুর" উপাধিও প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে, প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণোপলক্ষে, ভারত-রাজপ্রতিনিধির আদেশানুসারে, বঙ্গের লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর, হাবড়ার দরবারে, শিবচন্দ্রের "রাজভক্তি-সম্মত আচরণ ও মুক্তহস্তে বিদ্যালয়সমূহে সাহায্য প্রদানের নিদর্শন স্বরূপ ("in recognition of his Loyal conduct and liberal support to schools") তাঁহাকে একখানি সম্মান-সূচক প্রতিষ্ঠাপত্র (certificate of honour) প্রদান করেন। কিন্তু শিবচন্দ্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাপত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষুঃ রাজাধিরাজের দরবারে দেদীপ্যমান, যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী।

৺শিবচন্দ্র দেবের বাংলা হস্তাক্ষর।

হে পরমাত্মন্! আমরা সংসার যন্ত্রণায় তাপিত
হইয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন আমরা
তিতিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া তোমার অপার করুণার
প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত করিতে পারি তুমি আমা=
দিগকে এরূপ বল দেও এবং আমাদের আত্মাতে
নিত্য শান্তি প্রেরণ কর।

শ্রীশিবচন্দ্রদেব

৺শিবচন্দ্র দেবের ইংরাজি হস্তাক্ষর।

to the Railway Company for
the establishment of a station
in that village, but at the
same time we beg leave
to bring to your notice that
a great number of the people,
who would otherwise avail

Shibchunder Deb

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য-চর্চ্চা ও সভা সমিতিতে যোগদান

শিবচন্দ্র জীবন অধ্যয়নশীল ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যখন তিনি কোন্নগর সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি বহুবৎসর ধরিয়া সংগৃহীত নিজের পুস্তকসমূহ সাধারণের ব্যবহারার্থ দান করেন। কিন্তু তিনি পুস্তকপাঠে কখনও বিরত হন নাই; উক্ত পুস্তকালয়ের জন্য নির্ব্বাচিত অধিকাংশ নূতন পুস্তক তিনি অন্ততঃ আংশিকভাবে পাঠ করিয়া পুস্তকালয়ে পাঠাইতেন। ১৮৬১ সালের ২৫শে এপ্রেল হইতে ১৮৮৮ সালের ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা সাধারণ পুস্তকালয়ের (যাহা অধুনা ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিভুক্ত) একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি সদাসর্ব্বদা উক্ত পুস্তকালয়ে গিয়া পাঠের জন্য বহুসংখ্যক পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা লইয়া আসিতেন। তিনি, বেশির ভাগ, ভ্রমণকাহিনী, ইতিবৃত্ত, নীতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক—বিশেষতঃ দর্শন, ধর্ম্ম বিজ্ঞান ও স্পিরিচুয়্যালিজম্ (অধ্যাত্মবিজ্ঞান) সম্বন্ধীয় গ্রন্থ—পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন।

তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। সংস্কৃত ভাষাও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না; তিনি যখন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখন "সৎপদ্য রত্নাকরঃ" নামে একখানি শ্লোক সংগ্রহ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল; তিনি কোনও পণ্ডিতের দ্বারা উহার একখানি সুন্দর প্রতিলিপি করাইয়া লইয়াছিলেন; সংস্কৃত "কাব্য সংগ্রহঃ", "মেঘদূতম্" প্রভৃতি কতিপয় কাব্য গ্রন্থও আমরা তাঁহার গার্হস্থ্য পুস্তকালয়ে যত্নে সংরক্ষিত হইতে দেখিয়াছি। রাজকার্য্যের অনুরোধে তিনি এককালে উড়িয়া, হিন্দি, উর্দ্দু ও পার্সী ভাষারও অনুশীলন করিয়াছিলেন; ছয় বৎসর বালেশ্বর জেলায় কর্ম্ম করিয়া তিনি উড়িয়া ভাষায় বিশিষ্টরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে, দেশীয় ভাষায় নব্য সিভিলিয়ানদিগের

পরীক্ষা গ্রহণার্থ গঠিত পরীক্ষাসমিতির অন্যতম সভ্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি কিয়ৎকাল ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকালের জন্য ভার্ণাকিউলার লিটারেচার্ সোসাইটির (দেশীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে স্থাপিত সভার) কমিটিরও অন্যতম সভ্য ছিলেন। হুগলি জেলার শিক্ষাসমিতির সভ্য হইয়া শিবচন্দ্রকে কিছুকাল হুগলি যাইতেও হইয়াছিল। ইংরাজি উচ্চশিক্ষার প্রথম যুগে হিন্দু কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ছাত্র হইয়াও শিবচন্দ্র মাতৃভাষার চির অনুরাগী ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কলেজে অধ্যয়নকালে, তিনি ও তাঁহার বন্ধু ৺হরিমোহন সেন মহাশয় আরব্য উপন্যাসের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমরা বাল্যকালে ঐ অনুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম; দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এখন উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু "শিশুপালন" গ্রন্থ রচনা করিয়াই শিবচন্দ্র তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার সুললিত "সুরধুনী কাব্যে" এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া শিবচন্দ্রের পরিচয় দিয়াছেন—

"কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশু পালনের পিত, প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।"

এণ্ড্রু কোম্ব প্রভৃতি কতিপয় পাশ্চাত্য গ্রন্থকার বিরচিত শিশুপালন বিষয়ক পুস্তকের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শিবচন্দ্র "শিশুপালন" গ্রন্থের প্রথমভাগ প্রকাশিত করেন। তখন বাঙ্গালাভাষায় এরূপ পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল এবং শিবচন্দ্র এই অভাব পূরণ করিয়া বঙ্গমহিলার মহোপকার করিয়াছিলেন। গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নোদ্ধৃত নির্ঘণ্ট হইতে উপলব্ধ হইবে :—

প্রথম অধ্যায় — দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্তান জন্মিবার কারণ।
দ্বিতীয় " — গর্ভবতী স্ত্রীর কি ভাবে থাকা উচিত।
তৃতীয় " — ভূমিষ্ঠ হইবার সময় শিশুর শারীরিক অবস্থা।
চতুর্থ " — সূতিকাগৃহ কি প্রকার হওয়া উচিত।
পঞ্চম " — ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুকে কিরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।
ষষ্ঠ " — ভূমিষ্ঠ হইলে পর শিশুকে আহার দিবার নিয়ম।
সপ্তম " — ধাত্রী নির্ব্বাচন ও তাহার গুণাগুণ ও পথ্যাপথ্যের বিবরণ।

অষ্টম	”	—	শিশুকে হস্তদ্বারা আহার দিবার প্রকরণ।
নবম	”	—	স্তনপান ত্যাগ করাইবার প্রকরণ।
দশম	”	—	শিশুর গাত্র পরিষ্কার করণ, শরীর চালনা ও নিদ্রা।
একাদশ	”	—	দন্ত উঠিবার সময়ে শিশুকে কিরূপে পালন করিতে হইবে।
.দ্বাদশ	”	—	স্তন্য ত্যাগাবধি দ্বিতীয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু পালনের নিয়ম।
পরিশিষ্ট	”	—	প্রসবান্তে প্রসূতির কি ভাবে থাকা আবশ্যক।

আমরা গ্রন্থের নমুনাস্বরূপ, দ্বাদশ অধ্যায় হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

“অনেক লোক ভোজন সময়ে আপনার শিশু সন্তানকে নিকটে বসাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উত্তোলন পূর্ব্বক খাইতে দেন কিন্তু এ প্রকারে স্নেহ প্রকাশ করাতে অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার নাই। যে সকল দ্রব্য বালকের অহিতকর তাহা ভক্ষণ করিবার সময় বালককে নিকটে আনিতে দেওয়াই অকর্ত্তব্য যেহেতু যেমন আলোক দর্শনে নয়নের দর্শনৌৎসুক্য জন্মে ও যেমন দুঃখী ব্যক্তিকে দেখিলে দয়ার উদ্ভব হয় সেইমত ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিলে আহারের ইচ্ছা হয় অতএব শিশুকে প্রথমে খাদ্যদ্রব্যের নিকটে আনিয়া তাহার লোভ জন্মাইয়া পশ্চাৎ বঞ্চিত করা নির্দ্দয়ের কার্য্য ও ন্যায় বিরুদ্ধ হওয়াতে একেবারে তাহাকে না আনাই ভাল। কিন্তু ভোজনের সময় নিকটে আনিলে দেখাদেখি ইচ্ছা হইবে, অর্থাৎ আর আর সকল লোকে যে দ্রব্য খাইতেছে সে তাহা কি জন্য না খাইবে এই ভাবিয়া দ্রব্য খাইতে চাহে এবং না পাইলে অসন্তুষ্ট ও খিটখিটিয়া হয়।”

“কোন কোন শিশুর অধিক বয়স পর্য্যন্ত দিবসে নিদ্রা যাইবার আবশ্যক হয় কিন্তু কেবল কদভ্যাস বশতঃ কিম্বা জননীর অবকাশ নিমিত্ত শিশুকে অধিককাল পর্য্যন্ত নিদ্রাযোগে আরাম ভোগ করিতে দেওয়া অবিধেয়। সন্তান নিদ্রিত থাকিলে মাতা অবকাশ পাইবেন এইজন্য যাহাতে অধিকক্ষণ নিদ্রা যায় তদ্বিষয়ে অনায়াসে মাতার প্রবৃত্তি জন্মে এবং শিশুরও প্রথমাবস্থায় দিবসে নিদ্রা যাইবার অভ্যাস থাকাতে তাহা হইতে বিরহিত হইতে প্রথমে কিঞ্চিৎ অসুখ জন্মে কিন্তু প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া কিয়দ্দিন নিদ্রা রহিত করিলে ও রাত্রে নিয়মিত সময়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে নিদ্রা যাইতে দিলেই পুনরায় সুস্থির হইয়া নিদ্রা যাইবে ও শরীরে বল পাইবে এবং তাহার ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তিও বর্দ্ধিত হইবেক। যে সকল বালক দিবসে নিদ্রা না যায় তাহারা অন্য বালক অপেক্ষা প্রায় অধিক বলবান ও চঞ্চল হইয়া থাকে।”

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "শিশুপালন" গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। উহার ভূমিকায় শিবচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"দুই বা তিন বর্ষের শিশুকে যেরূপে জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা করান কর্ত্তব্য তাহারই বিবরণ এতদ্‌গ্রন্থে লিখিত হইল।" "শিশুপালনের" দ্বিতীয়ভাগ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত; আমরা নমুনাস্বরূপ ক্রমান্বয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষাংশ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;:—

"শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য এই যে মনুষ্য সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্যে আত্মজ্ঞানানুসারে তৎপর থাকিবে, নিজে স্বাধীন হইয়া সমাজের উপকার করিবে, এবং স্বয়ং আন্তরিক সুখে সুখী হইবে। যদিও এই উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য বুদ্ধি পরিপাক, কর্ম্মোপযোগী জ্ঞান লাভ, ও সমস্ত বৃত্তিকে স্ফুরিত করা আবশ্যক; কিন্তু ঐ সকল উপায় কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। কারণ কোন কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি না জন্মাইয়া কেবল সেই কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধা করিয়া দেওয়া বৃথা। অতএব শিশুর নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষা বিষয়ে প্রেমকে তাহার কার্য্যের প্রবর্ত্তক করা কর্ত্তব্য।

মাতার প্রতি সন্তানের যে প্রেম ও বিশ্বাস তাহা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির অন্তঃকরণের অতি পবিত্র ও মহৎভাবের ছায়া মাত্র; যে প্রেম ও বিশ্বাসের ভাব কোন ব্যক্তি বিশেষে পরিণত বা কোন অধম বিষয়ের সহিত মিশ্রিত হয় না; ফলতঃ তাহা অন্য সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠতর হয় ও মনুষ্যকে নম্রতা দ্বারা উন্নত করিয়া সর্ব্বস্রষ্টার প্রতি অর্পিত হয়।

অতএব উক্ত অভিপ্রায়ে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন কর। শিশুর দৈহিক বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি জন্মাইয়া দাও, কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি যে মানব প্রকৃতির নিকৃষ্ট অংশ তাহা ভুলিও না। তাহার বুদ্ধিকে উজ্জ্বল কর, কিন্তু মনে যেন থাকে যে নম্রতা ও মিতাচার জ্ঞানের প্রধান বীজ। বলের পরিবর্ত্তে প্রেম ও উপদেশের পরিবর্ত্তে দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুকে শাসিত ও তাহার অন্তঃকরণকে নির্ম্মিত কর। বিশেষতঃ মনকে সেই স্বর্গীয় ভাবাপন্ন করিবার উপযুক্ত কর। কেবল সেইভাব দ্বারাই মনুষ্যেতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছায়ার আবির্ভাব হইতে পারে।"

"মাতা ও সন্তান উভয়ের প্রতি উভয়ের বিশ্বাস থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যে স্থলে মাতা কেবল ব্যবস্থাপকের ন্যায় সন্তানকে কার্য্য করিবার বিধি দেন, এবং সে দোষ করিলে তাহাকে বিচারকের ন্যায় দণ্ডবিধান করেন, আর সে দোষী বলিয়া তাহার নিমিত্তে অন্তঃকরণে দয়া বা দুঃখ ভাবেন না, সে স্থলে উক্ত বিশ্বাস কদাচ জন্মিতে পারে না। 'তোমার রাগ দেখিয়া আমি দুঃখিত হইলাম।' 'তুমি সৎ হইবার চেষ্টা কর, আমি তোমার কথা শুনিব', 'চক্ষের জল মোছ, এবং কি জন্য বিরক্ত হইয়াছ তাহা আমাকে বল।' এবম্প্রকার মিষ্ট বচন দ্বারা যেমন সহজে শিশুর দোষের দমন কিম্বা কোপের শান্তি হইবে, কঠিন আজ্ঞা, অথবা নিরুৎসাহজনক বিরাগ প্রকাশ

করিলে তেমন কদাচ হইবে না। কারণ উক্ত মত ব্যবহার দ্বারা শিশুর দোষ অস্বীকার করা হয় না, অথচ শিশুর উপদ্রব নিবারণার্থ তাহাকে আদর করা কিম্বা ভুলান অথবা কোন দ্রব্য উৎকোচ দেওয়া প্রভৃতি যে কুরীতি আছে তাহাও অবলম্বন করিতে হয় না। দেখ, প্রায় সকল মনুষ্যেরই কখন কখন এমন সময় উপস্থিত হয় যে কোন কুকর্ম্ম করিয়া স্বীয় বন্ধু, যিনি নিশ্চয় তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইবেন, ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন ও ভরসা দিবেন, তাঁহার নিকট নিজ দোষ ব্যক্ত করিলে আত্মগ্লানির খর্ব্বতা ও সদনুষ্ঠানের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা জন্মে। আর কখন কখন এমনও ঘটে যে উক্ত প্রকার বন্ধুর অভাবে ও গুরুজনের তিরস্কার ও অবজ্ঞাপ্রযুক্ত দোষী ব্যক্তির হৃদয় এরূপ কঠিন হইয়া যায়, যে ঐ কুকর্ম্ম নিমিত্ত অনুতাপ না করিয়া বরং আরো দৃঢ়তররূপে বিপথগামী হয়। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ! যখন জ্ঞানবান্ মনুষ্য দুষ্ক্রিয়া করিয়া, স্বজন হইতে কৃপা ভিন্ন কেবল লাঞ্ছনা পাইলে, তাহার চরিত্র সংশোধন হয় না, তখন শিশুর আন্তরিক ভাবের কোমলকলিকা যে নির্দয়তারূপ নীহার দ্বারা শুষ্ক হইয়া যাইবে তাহাতে সংশয় কি? যে শিশু যথোচিত স্নেহবারিতে প্রতিপালিত হয় তাহার চরিত্র অতি রমণীয়! সে অপরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকটে যাইতে লজ্জিত বা ভীত হয় না; অন্যকে অভ্যর্থনা করিতে ও অন্য হইতে সমাদর পাইতে প্রস্তুত হয়; এবং সুখাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি হইতে প্রীতিলাভ করে; সর্ব্বদা আনন্দিত থাকিতে ইচ্ছুক এবং অতি তুচ্ছ বিষয় প্রাপ্ত হইলে পরম লাভ জ্ঞান করিয়া সুখী হয়। সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, অথচ এমত দয়াশীল যে অত্যন্ত আহ্লাদের সময়েও পরের সুখসাধন ও দুঃখমোচন করিতে বিস্মৃত হয় না। অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, অথচ তদ্বিষয়ে স্বার্থপর নহে। তাহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল ও সতর্ক থাকে, এবং তাহার সমুদায় চরিত্র, জ্ঞান ও সুখের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়।"

"শিশুপালন" গ্রন্থের দুইভাগই "হিন্দুপেট্রিয়ট" নামক তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় সংবাদপত্রে ক্রমান্বয়ে প্রশংসাপূর্ব্বক সমালোচিত হইয়াছিল। আমরা দ্বিতীয়ভাগের সমালোচনার কিয়দংশ, মর্ম্মার্থ সহ, উদ্ধৃত করিলাম :—

"The author is a quiet, unobtrusive gentleman, who does good by stealth, scarcely letting his left hand know what his right hand does. He takes a particular interest in infant education, and the thoughts and precepts which he has collected in this treatise are indeed of the most important character. The book is written in easy familiar style, full of matter, and will form an unexceptionable guide to infant treatment."

"গ্রন্থকার একজন শান্তপ্রকৃতি, আত্মগোপনশীল ভদ্রলোক, যিনি সংগোপনে সৎকর্ম্ম করেন—এমন কি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত যাহা করে তাঁহার বাম হস্তকে

তাহা জানিতে দেন না। তিনি শিশুশিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী এবং এই গ্রন্থে তিনি যে সকল চিন্তা ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতীব গুরুতর। পুস্তকখানি সরলভাবে লিখিত, সারগর্ভ এবং শিশুপালন বিষয়ে অনিন্দ্য পথপ্রদর্শক।"

১৮৬৪ সালে, "শিশুপালন" প্রথমভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, "শিশুপালন" এক সময়ে বেথুন বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৮২ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে, শিবচন্দ্র উক্ত গ্রন্থের সমগ্র স্বত্ব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করেন।

পুণ্যশ্লোক ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার মৃত্যুর পর যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশে "হেয়ার প্রাইজ্ ফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড বা অর্থসংস্থান স্থাপিত হয়। এই ফণ্ড হইতে নারীগণের চিত্তোন্নতিকল্পে বঙ্গভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট পুস্তক বা প্রবন্ধের পুরস্কার প্রদত্ত হইত। পুরস্কারযোগ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার নিম্নোক্ত মহোদয়গণের উপর ন্যস্ত ছিল :—

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
* বাবু রামগোপাল ঘোষ।
রেভারেণ্ড অধ্যাপক কে. এম. ব্যানার্জি।
বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র।

শিবচন্দ্র-রচিত "অধ্যাত্মবিজ্ঞান" নামক স্পিরিচুয়্যালিজম্ বিষয়ক একখানি পুস্তক হেয়ার প্রাইজ্ ফণ্ড হইতে পুরস্কার-প্রাপ্ত হইয়া ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থোৎপত্তির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল :—

"সোমপ্রকাশ পত্রে 'প্রেততত্ত্ব' শিরোনামযুক্ত যে সকল প্রস্তাব সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই কিয়দংশ এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। পুস্তকের নাম প্রেততত্ত্বের পরিবর্ত্তে 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' রাখা গেল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রাগুক্ত শব্দটি প্রাচীন কুসংস্কারবশতঃ লোকের হঠাৎ ঘৃণাস্পদ হইতে পারে; বিশেষতঃ যে সকল বিষয় এতদ্গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় উক্তশব্দ দ্বারা স্পষ্টরূপে বোধগম্যও হয় না; পাঠকবর্গকে ইহাও বিদিত করা যাইতেছে যে ইংরাজী বহুসংখ্যক পুস্তক হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রস্তাবিত বিবরণ সকল লিখিত হইয়াছে।"

পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পরামর্শে শিবচন্দ্র স্ব-রচিত-পুস্তকের উপরোক্ত নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

---

* ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভে বাবু রামগোপাল ঘোষের মৃত্যু হওয়ায়, শিবচন্দ্র তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

আমরা পূর্ব্ববৎ নমুনাস্বরূপ, এই পুস্তকেরও কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"যে যে বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনের সহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের সম্পর্ক।

৯। মনুষ্যের আত্মার ইহকাল ও পরকালিক উন্নতি ও মঙ্গল যখন উহার বিশ্বাস, প্রবৃত্তি, এবং শারীরিক স্বাস্থ্য, অভ্যাস, ও অবস্থার উপর আংশিকরূপে নির্ভর করে, তখন তাহার সর্ব্ববিষয়ক উৎকর্ষ সাধন অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রশস্ত সীমার অন্তর্গত জ্ঞান করা ন্যায়ানুগত হইতেছে। এইজন্য যত্নশীল ও সর্ব্বজনহিতৈষী সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীগত মতভেদ থাকাতেও পশ্চাল্লিখিত বিষয়ের উন্নতিকল্পে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করেন।

১০। শারীরিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় উৎকর্ষ সাধন। অর্থাৎ ভোজন, পান, পরিচ্ছদ, শ্রম, আচার বা উত্তেজনকারী দ্রব্য সেবন বিষয়ে যে সকল অনিষ্টকর অভ্যাস ও ভ্রমসঙ্কুল চিকিৎসা-প্রণালী আছে, তাহা এরূপে সংশোধন করা আবশ্যক, যাহাতে প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর অন্তরস্থ আত্মার উপযুক্ত মন্দির ও উহার কার্য্যের উত্তম যন্ত্র স্বরূপ হইতে পারে।

১১। শিক্ষা বিষয়ক উৎকর্ষ সাধন। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রণালী দ্বারা শরীর, মন ও আত্মাকে সমঞ্জসরূপে স্ফুরিত ও শিক্ষিত করা।

১২। বংশগত দোষ সংশোধন, যাহাতে সন্তান সকল সুস্থ শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক অনুকূল অবস্থায় সংসারে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

১৩। সমাজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার অন্যায় আচরণ হইতে স্ত্রীজাতিকে মুক্ত করা। যাহাতে তাহারা স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে ও মহৎ সন্তান প্রসবের উপযুক্তা হইতে সমর্থ হয়।

১৪। সকল মনুষ্যকে তুল্যরূপে জ্ঞানাপন্ন ও তন্নিবন্ধন চরমে স্বাধীন করা, এবং সকল প্রকার অন্যায়াচরণ, সামাজিক বৈষম্য, পারিবারিক নিষ্ঠুরতা, কিম্বা মন ও আত্মার উপর দৌরাত্ম্য রহিত করা কর্ত্তব্য, যেহেতু স্বাধীনতা সকল মনুষ্যেরই জন্মাধিকার, এবং প্রত্যেক উন্নতিশীল আত্মা স্বভাবতঃ তাহা পাইবার জন্য দৃঢ়রূপে চেষ্টা করে।

১৫। পারমার্থিক ও ধর্ম্মযাজন সম্বন্ধীয় উৎকর্ষ সাধন। যেহেতু ভ্রম ও উপদ্রব হইতে মুক্ত না হইলে আত্মার যথার্থ উন্নতি সম্ভাবিত নহে।

১৬। সমাজ সংস্কার পূর্ব্বক চরমে নূতন সমাজ স্থাপিত করা। যেহেতু বর্ত্তমান সমাজের স্বার্থপর ও বিরোধজনক সম্বন্ধ ও প্রথা সকল উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থার অনুপযুক্ত।

অতএব যাহাতে মানবজাতির অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে, প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

তাঁহার দুই পরমবন্ধু ৺প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাজা দিগম্বর মিত্রের ন্যায় শিবচন্দ্রের স্পিরিচুয়্যালিজমে অটল বিশ্বাস ছিল, যদিও তিনি নিজে কখনও কোনওরূপ পারলৌকিক সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি এই বিষয়ের রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং কয়েক দিবস নিজগৃহে কতিপয় বন্ধু লইয়া অধ্যাত্ম-চক্রেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাদৃশ সন্তোষজনক ফললাভ না হওয়ায়, উহা বন্ধ করিয়া দেন।

তিনি আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত "অশরীরী আত্মার ধর্ম্মবীজ" ("The Creed of the Spirits") ও "আধ্যাত্মিক দশ আদেশ ও কর্ত্তব্যের দশবিধি" ("Ten Spiritual Commandments and Ten Rules of Right") পাঠ করিয়া এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তদুভয়ের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু কোনও বিজ্ঞ বন্ধুর পরামর্শে পরিশেষে কেবল শেষোক্ত পুস্তিকাখানিই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ["১০" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ]। ইংরাজিভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ অননূদিত প্রথমোক্ত পুস্তিকাখানিরও প্রতিলিপি "১১" চিহ্নিত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

শিবচন্দ্র সচরাচর ইংরাজিতে চিঠিপত্র লিখিতেন, কিন্তু ঐ ভাষার কোনও পুস্তক রচনা করেন নাই।

শিবচন্দ্র পুত্রের জন্য ইংরাজি ভাষায় যে সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই জীবনীর শেষে সন্নিবেশিত হইল। তৎসঙ্গে তাঁহার রচিত "আত্ম-শিক্ষা", "জীবনের লক্ষ্য কি?", "থিওডোর পার্কারের ধর্ম্ম বিষয়ক মত" ও "মহাপুরুষ" শীর্ষক চারিটি বাঙ্গালা প্রবন্ধও প্রদত্ত হইল। শেষোক্ত প্রবন্ধদ্বয় পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত "সমদর্শী" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিনি বাগ্মী ছিলেন না বটে, কিন্তু দেশহিতকর বিবিধ সভা সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ সালের ১লা জুনে, মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুদিনের দ্বাদশ বার্ষিক স্মৃতি সভায় শিবচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে ডাক্তার এস. জি. চক্রবর্ত্তী, ভারতবাসীদিগের পক্ষে দেশভ্রমণে উপকারিতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বরে, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য, ডাক্তার এফ. জে. মাউয়াটের চেষ্টায় "বেথুন সোসাইটি" নামে কলিকাতায় যে সভা স্থাপিত হয়,

শিবচন্দ্র উহার একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া, কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বহুবৎসর "এগ্রি-হর্টিকল্‌চর‍্যাল সোসাইটি"র সভ্য ছিলেন এবং উক্ত সোসাইটির উদ্যান হইতে অত্যুৎকৃষ্ট আম্রের কলম সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কোন্নগরস্থ উদ্যানে রোপণ করিয়াছিলেন। ফুলের অপেক্ষা শিবচন্দ্রের ফলের বাগানের সখ বেশী ছিল। তাঁহার বাগানে যত প্রকার উৎকৃষ্ট আম্রের বৃক্ষ ছিল, তৎকালীন বঙ্গে আর কুত্রাপি সেরূপ ছিল না। তাঁহার যত্নে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সিংহল, মরিশস্‌ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে আনীত ন্যূনাধিক ১২৫ প্রকারের আম্র বৃক্ষ তাঁহার বাগানে ফলোৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট ফল তাঁহার উদ্যানে উৎপন্ন হইত। তিনি এই সকল ফলের বৃক্ষের নক্সা ও তালিকা প্রস্তুত করিয়া তালিকানুসারে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক বৃক্ষের সংখ্যা উহার তলদেশে প্রোথিত কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত করাইয়াছিলেন।

শিবচন্দ্র ৺প্যারীচরণ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুরাপান নিবারিণী সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং স্বগ্রামবাসীদিগের মধ্যে অনেককে সুরাপান হইতে বিরত থাকিবার অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন।

১৮৬৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বরে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার যখন "বেঙ্গল সোস্যাল্‌ সায়েন্স এসোসিয়েশন" (বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা) প্রথম স্থাপন করেন, শিবচন্দ্র সেই সময়ের উক্ত সভার সভ্য হন এবং উহার কার্য্যকলাপের প্রতি বিশেষরূপে মনোনিবেশ করেন। পাদরি লং সাহেব ও সভার স্থায়ী সম্পাদক বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের সহায়তায়, তিনি বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র প্রভৃতি কোন্নগরের কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রলোককে উক্ত সভায় যোগদান করিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সভার কয়েকটি বার্ষিক অধিবেশনে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যখন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া ১৮৭০ সালের ২৯শে অক্টোবরে "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন" (ভারত সংস্কার সভা) স্থাপন করেন, তখন শিবচন্দ্র উহার অন্যতম সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক হন।

সামাজিক উন্নতিকল্পে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" (National Indian Association in aid of Social Progress) নামক সভার পত্রিকার তিনি একজন গ্রাহক ছিলেন এবং উক্ত সভার উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তিনি কয়েকবার সভার বাৎসরিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সভা-সম্পৃক্ত মিসেস জে. বি. নাইট, মিসেস ই. লিণ্ডষ্টেট্‌, মিসেস উইন্স প্রভৃতি কতিপয় ইউরোপীয় মহিলার সহিত, নিজ পরিবারের কতিপয় মহিলা সমভিব্যাহারে, সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বঙ্গমাতার কতিপয় সুসন্তানের সমবেত চেষ্টায় ১৮৭৬ সালের প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের" কার্যকলাপে শিবচন্দ্রের চিত্ত সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তিনি উক্ত সভার সভ্য হইয়া সভার সকল কার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ ও বিশিষ্টরূপ সহায়তা করিতেন। ১৮৭৯ সালের ২৭শে অক্টোবরে, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া, কোন্নগর ইংরাজি বিদ্যালয়-গৃহে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে, সুরেন্দ্র বাবু সমাগত ভদ্রলোকদিগকে জানান যে, এদেশের রাজনৈতিক উন্নতিসাধন কল্পে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইংলণ্ডে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং যাহাতে উক্ত ব্যয়সাধ্য শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য কোন্নগরবাসীগণের নিকট বিশিষ্টরূপ অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয় এবং শিবচন্দ্রই উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই চাঁদা সংগ্রহ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই হাইকোর্টের অবমাননা করিয়াছেন, এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ১৮৮৩ সালের মধ্যভাগে বিচারপতি নরিস সাহেবের বিচারে সুরেন্দ্র বাবুর কারাদণ্ড হয় এবং উক্ত সংবাদে সমগ্র বঙ্গদেশে হাহাকার উত্থিত হয়। তখন শিবচন্দ্র হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে বিলাত আপিলের ব্যয়সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, উক্ত আপিল প্রিভিকৌন্সিলে অগ্রাহ্য হইয়াছে; এবং কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল যে, ১৮৮৩ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে ভারতসভার আমন্ত্রণে কলিকাতার বীডন ষ্ট্রীটে যে একটি মহতী সভা হইয়াছিল তাহাতে "ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে বৈধ উপায়ে আন্দোলন ও অপর প্রকার বিধিসঙ্গত উপায়ে এদেশের রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিবার প্রত্যাশায় একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার সংস্থাপন করা" ধার্য্য হইয়াছে। তখন, শিবচন্দ্রের প্রস্তাবানুসারে, সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমার আপিল জন্য সংগৃহীত চাঁদার মোট ১০০৲ টাকা (তন্মধ্যে ৫০৲ টাকা শিবচন্দ্র নিজে দিয়াছিলেন) "জাতীয় ভাণ্ডারে" অর্পণ করা হইল।

বলা বাহুল্য যে "কন্‌গ্রেস" ঘটিত সমস্ত ব্যাপারে উন্নতির চিরপক্ষপাতী শিবচন্দ্রের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে বিজ্ঞানের প্রতি শিবচন্দ্রের কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি ছয় বৎসর একটি উচ্চতম বৈজ্ঞানিক বিভাগে বৈজ্ঞানিক কার্য্যে লিপ্ত থাকায় সেই অনুরাগ আরো বদ্ধমূল হইয়াছিল। বস্তুতঃ, তিনি আজীবন জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রচার কামনা করিতেন। তিনি

বিজ্ঞানকে ঈশ্বরপ্রণীত পুরাণ বলিয়া জানিতেন; যিনি আমাদের হৃদয়ে স্বহস্তে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই কৃপায় বিজ্ঞানবলে তাঁহার মহিমার যৎকিঞ্চিৎ জানিতে সক্ষম হইয়াছি।

স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যখন, ১৮৭০ সালে, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (Indian Association for the Cultivation of Science) স্থাপনের সঙ্কল্প প্রথম প্রচার করেন, তখন হইতেই শিবচন্দ্র ঐ মহদনুষ্ঠানের একজন আন্তরিক সমর্থক হইয়াছিলেন। বঙ্গের তৎকালীন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন, ১৮৭৭ সালে, উক্ত সভা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন শিবচন্দ্রের আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি সাধ্যানুসারে উক্ত সভার সহায়তা করিতেন এবং অনেকবার উহার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

"উত্তরপাড়া হিতকরী সভার"ও শিবচন্দ্র একজন পরম হিতৈষী ছিলেন। তিনি কয়েকবার সভার বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। সভার অন্যতম সম্মানভাজন সদস্য (honorary member) নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি সভা-কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন।

হিন্দু-মেলা, কলেজ রি-ইউনিয়ন (মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "এমারেল্ড বাউয়ার" নামক উদ্যানে), বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা, বিদ্বজ্জন সম্মিলনী সভা (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে) প্রভৃতি নানা সম্মিলনী সভায় শিবচন্দ্র, নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এদেশে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন তাঁহার বন্ধু শিবচন্দ্রের নিকট এবিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র উক্ত সমাজ-সংস্কারের প্রথম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তজ্জন্য কোন্নগরে কিয়ৎকালের জন্য সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন—পরিশেষে রাজা দিগম্বর মিত্রের চেষ্টায় উক্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়।

গ্রামের স্বাভাবিক জল নির্গমের পথরোধই নিম্নবঙ্গে দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বরের প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ, রাজা দিগম্বর মিত্র যখন সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রকাশ করেন, তখন শিবচন্দ্র উহার সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিনিয়ত স্বগ্রামের জলনির্গমের পথসমূহের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি, এই উদ্দেশ্যে, কোন্নগর গ্রাম জরিপ করাইয়া ভূ পৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সমতা-নির্ণায়ক একখানি নক্সা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে ইহার অধিক আর কিছুই হয় নাই।

রাজা দিগম্বর মিত্র সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, নিম্নবঙ্গের অন্যত্র যেমন, সেইরূপ দেশব্যাপক-জ্বরাক্রান্ত জেলাসমূহেও, গ্রামের জল প্রথমে যেদিকে ঢালু সেইদিকে অবস্থিত নিকটবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্রে গিয়া পড়ে, সেখান হইতে বিল সমূহে গিয়া একত্রিত হয়, বিল হইতে খাল দিয়া তদপেক্ষা বড় নদীনালায় গিয়া পড়ে এবং তথা হইতে পরিশেষে নৌবাহ্য নদীসমূহের সহিত মিলিত হয়। এই সকল জলনির্গমের পথের কোনও একটিতে বাধা পড়িলে, গ্রামের জলনির্গমের ব্যাঘাত ঘটে, এবং বাধার নৈকট্য বা দূরত্ব অনুসারে জলনির্গমের ব্যাঘাত জনিত কুফলের তারতম্য অনুভূত হয়। এদেশের ভূ-পৃষ্ঠ প্রায় সম্পূর্ণরূপে সমতল বলিয়া, জল সমগ্র ভূমির উপর দিয়া ঢালুর অভিমুখে গড়াইয়া পড়ে; সুতরাং ঢালুর আড়া-আড়ি রাস্তা নির্ম্মিত হইলে. জলনির্গমের ব্যাঘাত হইবেই হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, উভয় রেলওয়েই—এবং তাহাদের শাখাবর্ত্মসমূহও—গ্রাম্য জলপ্রণালীসমূহের উপর দিয়া যাওয়ায় গ্রামসমূহের জলনির্গমের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন স্বাস্থ্যের হানি হইয়াছে।

১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশব্যাপী জ্বরের বিষয় পুনরুত্থাপিত হওয়ায় বঙ্গের তৎকালীন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল্ পরামর্শের জন্য রাজাকে ডাকিয়া পাঠান। এই পরামর্শের ফলে, বালী, শিবপুর, কোন্নগর প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের জলনির্গমের ব্যাঘাত কিরূপে সংঘটিত হইয়াছে সবিশেষ বর্ণনা করিয়া রাজা একটি মন্তব্য প্রেরণ করেন এবং ঐ মন্তব্য পাইয়া, রাজার মতের সত্যাসত্য পরীক্ষার্থ, সার রিচার্ড টেম্পল একটি কমিশন নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তিনি অল্পদিন পরেই গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইয়া বোম্বাই চলিয়া যান এবং তাঁহার পরবর্ত্তী লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর, সার অ্যাশ্‌লি ইডেনের উপর "ড্রেনেজ্ কমিটি" নিয়োগের ভার অর্পিত হয়। রাজা দিগম্বর মিত্র, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উক্ত কমিটিতে কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায়, সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হেমচন্দ্র কর তাঁহার পরিবর্ত্তে কমিটির অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। শিবচন্দ্রও, ১৮৭৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, উক্ত কমিটির একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ৫ই মার্চ্চে কমিটির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। যদিও শিবচন্দ্র কমিটিতে ছিলেন না, তিনি কমিটি হইতে একেবারে বিচ্যুত হন নাই এবং কমিটির কার্য্যকলাপে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমাদের বেশ স্মরণ হয়, বাবু হেমচন্দ্র কর, কমিটির কার্য্য সম্বন্ধে শিবচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য, কোন্নগরের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ সালের মার্চ্চ মাসে কমিটির

কার্য্য আরম্ভ হয় এবং জুলাই মাসে কমিটির রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে দাখিল হয়। রিপোর্টের বিশেষ ফল কিছুই হয় নাই। কমিটির সভাপতি, ডাক্তার লেথ্‌ব্রিজ্,—রাজার মতের বিরুদ্ধে বিস্তর হেতুবাদ করিয়াছিলেন। পরিশেষে, গবর্ণমেণ্ট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদিও রাজার মত সন্তোষজনকরূপে সপ্রমাণ হয় নাই, উহা একেবারে অগ্রাহ্য করিবার কারণ নাই।

শ্রীমতী অম্বিকা দেব

নবম পরিচ্ছেদ

পারিবারিক ও সামাজিক জীবন

আমরা এ পর্য্যন্ত শিবচন্দ্রের পরিচয় কেবল কর্ম্মক্ষেত্রেই পাইয়াছি; কি বিদ্যাভ্যাসে, কি রাজসেবায়, কি দেশসেবায়, কি সাহিত্য-সেবায়, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার নীরব কর্ম্মিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে চাহ যদি, তবে তাঁহার গৃহে প্রবেশ কর। দেখিবে, সে গৃহ, সুখ, শান্তি ও পবিত্রতার চির-নিলয়! সে গৃহে বহির্জগতের ধূলি, কোলাহল ও অশান্তির প্রবেশ নিষেধ! আমরা বহুবৎসর পূর্ব্বে যে শান্তিময় দৃশ্য নিত্য দর্শন করিয়া এই দুঃখবহুল সংসারে স্বর্গের আভাস পাইতাম, হায়! সে দৃশ্য এখন স্মৃতিপটসার হইয়াছে! সেই সহাস্যবদন, সৌম্যদর্শন গৃহস্বামীই বা কোথায়! এবং তাঁহার পতিপ্রাণা জীবন-সঙ্গিনীই বা কোথায়! আমরা সেই আদর্শ-দম্পতীর পারিবারিক জীবন নিরতিশয় সঙ্কুচিত চিত্তে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিবাহকালে শিবচন্দ্রের বয়স, পনেরো বৎসর এবং তাঁহার স্ত্রীর বয়স, নয় বৎসর মাত্র ছিল। শিবচন্দ্র স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে নিজ বিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“এই বাল্যবিবাহ, অবশ্য, উভয়পক্ষের পিতামাতার দ্বারা ধার্য্য হইয়াছিল—আমার মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কিন্তু আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, এই বিবাহে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আমি সর্ব্বদা আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করি যে এমন স্ত্রীলাভ করিয়াছি যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রণয় পাইবার যোগ্য। তাঁহার স্বাভাবিক সুবিবেচনা, তাঁহার ধর্ম্মশীলতা ও মদ্গতচিত্ততা প্রশংসার সীমাতীত।” এই বিবাহের ফলে, শিবচন্দ্রের ছয় কন্যা ও তিন পুত্র সন্তান হইয়াছিল—তন্মধ্যে দুইটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার স্বল্পদিন পরেই গতাসু হয়। অবশিষ্ট সন্তানগণের নাম, জন্মকাল ও জন্মস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নাম	জন্মকাল	জন্মস্থান
১মা কন্যা—শ্রীমতী কৈলাসকামিনী	১৯শে আষাঢ়, ১২৪২ সাল (ইং ২রা জুলাই, ১৮৩৫ সাল)	কোন্নগর

[অতঃপর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া তিনদিন মাত্র জীবিত ছিল।

নাম	জন্মকাল	জন্মস্থান
২য়া কন্যা—শ্রীমতী মোক্ষদা	৬ই মাঘ, ১২৪৬ সাল (ইং ১৮ই জানুয়ারি, ১৮৪০ সাল)	জামঝাড়ি (বালেশ্বর জেলা)

[অতঃপর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া দশদিন মাত্র জীবিত ছিল।

নাম	জন্মকাল	জন্মস্থান
৩য়া কন্যা—শ্রীমতী বিনোদা	৭ই ভাদ্র, ১২৫০ সাল (ইং ২২শে আগষ্ট, ১৮৪৩ সাল)	বালেশ্বর

[শিবচন্দ্রের জীবদ্দশায়, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নাম	জন্মকাল	জন্মস্থান
৪র্থা কন্যা—শ্রীমতী ক্ষীরোদা	৭ই চৈত্র, ১২৫২ সাল (ইং ১৯শে মার্চ, ১৮৪৬ সাল)	মেদিনীপুর
৫মা কন্যা—শ্রীমতী ক্ষেমদা	২রা পৌষ, ১২৫৪ সাল (ইং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৪৭ সাল)	মেদিনীপুর
৬ষ্ঠা কন্যা—শ্রীমতী রমাসুন্দরী	২৯শে কার্ত্তিক, ১২৫৬ সাল (ইং ১৩ই নবেম্বর, ১৮৪৯ সাল)	কোন্নগর
একমাত্র পুত্র—শ্রীমান্ সত্যপ্রিয়	৭ই শ্রাবণ, ১২৬৩ সাল (ইং ২২শে জুলাই, ১৮৫৬ সাল)	কোন্নগর

শিবচন্দ্রের চতুর্থা কন্যার জন্ম সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শিবচন্দ্রের পত্নী প্রথমে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন, তৎপরে একটি পুত্রসন্তান প্রসূত হইয়া সূতিকাগারেই বিনষ্ট হয়; সেইরূপ, দ্বিতীয়া কন্যার জন্মের পরও আর একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া দশদিন পরে মারা যায়। তৎপরে, যখন তিনি তৃতীয়বার একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন, তখন তিনি অদ্যাপি পুত্রবতী হইলেন না, সারি সারি তিনটি কন্যার জননী হইলেন, বলিয়া পৌরাঙ্গনারা তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিও লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া একান্ত চিত্তে পুত্রার্থিনী হইলেন। এইবার যখন তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল তখন তাঁহার মনে এই দৃঢ় ধারণা হইল যে পূর্ব্বে দুইবার যেমন

কন্যার পর পুত্র জন্মিয়াছিল, এবারেও তাহাই হইবে, কিন্তু কি উপায়ে পুত্রটি দীর্ঘজীবী হইবে ইহাই অহর্নিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে শিবচন্দ্র মেদিনীপুরের ডেপুটিকালেক্টার ছিলেন। ঘটনাক্রমে তথায় কোনও ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শিবচন্দ্রের গৃহিণী, পৌরজনের প্ররোচনায় ও পুত্রকামনায়, অনেক অর্থব্যয় করিয়া, উক্ত ব্রহ্মাচারী দ্বারা বিস্তর হোম, যাগ, যজ্ঞ করাইয়াছিলেন এবং নিজেও কঠোর ব্রত নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। পত্নীর অনুরোধে শিবচন্দ্রও অনেক উপবাসাদি করিয়াছিলেন; তিনি এ সকল কিছুই মানিতেন না, কিন্তু স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য, এ বিষয়েও কোনও আপত্তি করেন নাই। পৌরজনের সকলেরই বিশ্বাস যে এত অনুষ্ঠানের ফলে নিশ্চয়ই গৃহস্বামীর একটি পুত্রসন্তান হইবে। যে দিন তাঁহার স্ত্রীর প্রসব বেদনার উপক্রম হইল, সে দিন শিবচন্দ্র কাছারি যাইবার সময় ভৃত্যদিগকে বলিয়া গেলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহাকে যেন অবিলম্বে সংবাদ দেয়। শিবচন্দ্রের গৃহিণী যথাকালে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন এবং বাটীর সকলেই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শিবচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হন নাই। স্ত্রীর নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হওয়ার সংবাদ পাইয়া তিনি সংবাদবাহক ভৃত্যকে তাহার আশাতীত পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে তিনি আজ একজনের ভ্রম দূর করিলেন।" আমরা শুনিয়াছি যে, এই ঘটনার পর হইতেই না কি শিবচন্দ্রের পত্নীর প্রাচীন কুসংস্কারে বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়ে।

শিবচন্দ্র কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও বৃদ্ধ শ্বশুরকে বড় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার যৎপরোনাস্তি সেবাশুশ্রূষা করিতেন। আমরা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্রজকিশোর দেবমহাশয়ের ৯৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বার্দ্ধক্যনিবন্ধন সময়ে সময়ে শয্যাতেই অসামাল হইয়া পড়িতেন। একদিন তিনি শয্যায় মলত্যাগ করিয়া গায়ে মাখিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই সব পরিষ্কার করিতে প্রবৃত হইলেন। বাটীর সরকার মহাশয়, গঙ্গানারায়ণ বসু, যিনি শিবচন্দ্রের ভগ্নীপতি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা, এই ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, "রাম! রাম! ছোট গিন্নির হাতে আর খাব না, ডান হাতে শ্বশুরের গু মুক্ত করিতেছেন!" কিয়ৎক্ষণ পরে, ছোট বউ গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন এবং সেখানে স্নান করিতে করিতে তাঁহার নাকের নোলকটি হারাইয়া গেল। বাটী ফিরিয়া আসিলে, প্রাগুক্ত বসুজ মহাশয় তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন, "শ্বশুরের সেবা করে বড় পুণ্য করিলেন তাই গঙ্গায় নোলক হারাইয়া আসিলেন!" কিন্তু তাহার পরদিন, ব্রজকিশোর দেবমহাশয়ের মেজ বউ গঙ্গার তীরে বসিয়া আহ্নিক করিতে করিতে সেই নোলক কুড়াইয়া পাইলেন। তখন ছোট বউ বলিলেন, "এ কি আমার শ্বশুরের পুণ্য নয়?"

শিবচন্দ্রের দুই তিনটি কন্যা সন্তান হইবার পর, তিনি পিতাকে জানাইলেন যে, ক্রমশঃ বংশবৃদ্ধি হইলে পৈতৃক বাটীতে তাঁহার পরিবারবর্গের স্থান সঙ্কুলান হইবে না, অতএব তিনি একখানি স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং তজ্জন্য পিতার অনুমতি ও একখণ্ড ভূমি প্রার্থনা করেন। পিতা পুত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে ভূমি নির্ব্বাচন করিতে বলিলেন। ব্রজকিশোরের কোন্নগর গ্রামে গঙ্গাতীরে এবং অন্যত্র অনেক ভাল ভাল জমি ছিল, কিন্তু শিবচন্দ্রের পত্নী, স্বামীকে পৈতৃক ভবনের সন্নিহিত একখণ্ড ভূমি মনোনীত করিতে এই অভিপ্রায়ে পরামর্শ দেন যে, তথায় বাস করিয়া তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারিবেন। এই পরামর্শানুসারে শিবচন্দ্র পৈতৃকবাটীর পার্শ্ববর্ত্তী তিন বিঘা পরিমিত একখণ্ড ভূমি নির্ব্বাচন করেন এবং পিতার মৃত্যুর তিন চারি বৎসর পরে তথায় একটি শান-বাঁধানো ঘাট ও চাতালবিশিষ্ট পুষ্করিণী ও উদ্যান সম্বলিত সুবৃহৎ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করেন। ১২৫৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ১০ই তারিখে বুধবারে (ইং ২২শে মে, ১৮৫০ সালে) শিবচন্দ্র নূতন গৃহপ্রবেশ করেন এবং তৎপরে চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকেন। তাঁহার তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভৈরবচন্দ্র ১৮৩৩ সালে, মধ্যম মহেশচন্দ্র ১৮৭৬ সালে এবং তৃতীয় ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৫ সালে পরলোক গমন করেন। ইঁহাদের সকলের সহিত শিবচন্দ্রের আন্তরিক সৌভ্রাত্র ছিল। ব্রজকিশোর দেব মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্যামাসুন্দরীর কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইনি সধবা হইয়াও চিরদিন পিতৃগৃহবাসিনী ছিলেন। ইনি এবং ইঁহার স্বামী, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ (যাঁহাকে শিবচন্দ্র মেদিনীপুরের কাছারীতে কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন) বহু বৎসর শিবচন্দ্রের নূতন বাটীতে বাস করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত শিবচন্দ্র ভগ্নীর জন্য একখানি স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে সক্ষম না হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র ভগ্নী ও ভগ্নীপতির যথোচিত সমাদর করিতেন। ইনি যখন আলিপুরের ডেপুটি কালেক্টার ছিলেন, তখন সপ্তাহান্তে বাটী আসিয়া আগে "মেজদিদি! মেজদিদি!" বলিয়া ভগ্নীকে ডাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিয়া, তবে বাটীর আর সকলের সঙ্গে দেখা করিতেন; কখনও ইহার অন্যথা হইত না। বলা বাহুল্য যে, শিবচন্দ্রের পত্নীও ননন্দাকে গুরুজন বলিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ করিব। শিবচন্দ্রের বালিকা স্ত্রী যখন প্রথম শ্বশুর ঘর করিতে আইসেন, তখন তাঁহার কিছুই গহনা ছিল না বলিলেই হয়; সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গহনা ছিল—এক ছড়া চিক। সেই চিক ছড়াটি ননদের পছন্দ হইয়াছিল এবং তিনি উহা পরিতে ভালবাসিতেন বলিয়া, বালিকা সেই সময়েই উহা ননদকে দিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের কথা অধিক আর কি বলিব? পঁয়ষট্টি বৎসরে মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর এক দিনের তরেও পরস্পরের মধ্যে কথান্তর বা মনান্তর উপস্থিত

হয় নাই, এ কথা শুনিলে সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যে সকল কারণে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ফল ফলিয়াছিল, তাহা বিবৃত হইলে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই থাকিবে না। শিবচন্দ্রের দাম্পত্য জীবন যে নিরবচ্ছিন্ন সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার অসাধারণ চরিত্রবলই তাহার মুখ্য কারণ। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, প্রথম যৌবনেও তিনি তৎকালসুলভ রঙ্গরসে মত্ত না হইয়া অসীম অধ্যবসায় ও সংযম সহকারে তাঁহার বালিকা স্ত্রীকে শিক্ষাদান করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের মনের মত করিয়া লইয়াছিলেন। এই শিক্ষা-বীজ ঊষর ভূমিতে পতিত হয় নাই, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্বাতিনক্ষত্রচ্যুত বারিবিন্দু উপযুক্ত শুক্তিকাগর্ভে পতিত হইয়া এক অমূল্য মুক্তাফলে পরিণত হইয়াছিল। শিবচন্দ্রের অনুরূপা ভার্য্যা তাঁহার স্বামীকে কেবল স্বামী বলিয়া ভাল বাসিতেন না, কিন্তু আজীবন তাঁহাকে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু বলিয়া ভক্তি করিতেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহার নিকট উপদেশ-ভিক্ষা করিতেন ও তদনুসারে চলিতেন। আমরা প্রায় দেখিতে পাই যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে একটি ব্যবধান বা পার্থক্য আসিয়া পড়ে, যাহা স্বামী ও স্ত্রীর একত্ব সম্পাদনের প্রতিকূল। কিন্তু শিবচন্দ্র স্বভাবতঃই নারীজাতিকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন, এবং গুরুস্থানীয় হইয়াও তাঁহার পত্নীকে ক্ষণকালের জন্য সম্মান প্রদর্শন করিতে অবহেলা করেন নাই। অধিকন্তু, তিনি স্ত্রীকে ষোলআনা বিশ্বাস করিতেন; তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সংসারের কর্ত্রী করিয়া তাঁহার হাতে সংসার খরচের জন্য থোক টাকা মাসে মাসে দিতেন এবং উক্ত খরচের হিসাব লইতেন না। আর একটি কথা আছে—আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির অবনতির একটি প্রধান কারণ এই যে, উচ্চশিক্ষিত স্বামী অনেক স্থলে স্ত্রীকে স্বীয় উচ্চচিন্তা বা সঙ্কল্পের অংশভাগিনী করা আবশ্যক বোধ করেন না। কিন্তু শিবচন্দ্র তাঁহার সকল সদনুষ্ঠানে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন; কোনও বিষয় স্ত্রীর কাছে গোপন করিতেন না। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে, স্ত্রীও স্বামীর নিকট কোনও বিষয় গোপন করিতেন না, তাঁহাকে সকল কথা অকপটে বলিতেন; স্বামী বিশ্বাস করিয়া যে টাকা দিতেন তাহার এক কপর্দ্দকেরও অপব্যবহার না করিয়া, মিতব্যয়িতার ফলে সঞ্চিত অর্থ দ্বারা যথাসাধ্য স্বামীর প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতেন এবং নিজের বদান্যতাবৃত্তিও চরিতার্থ করিতেন। উভয়ের মধ্যে অহর্নিশি প্রেম ও সম্মানের আদানপ্রদান ও চিত্তবিনিময় অবাধে ও অকপটে চলিত বলিয়া কোনরূপ মনোমালিন্য এই দুইটি স্বচ্ছ হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পাইত না। স্ত্রীর অযথা বশীভূত স্বামীকে লোকে স্ত্রৈণ বলে; শিবচন্দ্র এ অর্থে স্ত্রৈণ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার গুণবতী ভার্য্যার সহিত বৃদ্ধ বয়সেও যে নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল আমরা অনুক্ষণ তাহার পরিচয় পাইয়া বিস্ময়মিশ্রিত প্রীতিরসে আপ্লুত হইতাম। সমস্ত দিন বহির্ব্বাটীতে নানা প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়াও, শিবচন্দ্র দিনের মধ্যে কতবার দুই চারি মিনিটের

জন্য অন্তঃপুরে আসিয়া স্ত্রী কি করিতেছেন অনতিদূর হইতে দেখিয়া বা কখন কখন স্ত্রীর সহিত দুই একটি কথা কহিয়া ফিরিয়া যাইতেন। স্বামীর ভালবাসার গভীরতা স্ত্রীর অজ্ঞাত ছিল না; আমরা ইহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব। একবার শিবচন্দ্রের পত্নীর কঠিন পীড়া হইয়াছিল। সে সময়ে শিবচন্দ্র পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন,—"এ সময় ইঁহার যদি কোনও ভাল মন্দ ঘটে, তাহা হইলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে অনেক অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে বটে, তথাপি আমাকে রাখিয়া ইনি আগে যাইলে ইঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ, নতুবা ইঁহাকে আমার শোক সহ্য করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর ক্রোড়ে মৃত্যুই মঙ্গল।" শিবচন্দ্রের পত্নী আরোগ্যলাভ করিয়া এই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন তাঁহার কন্যাগণের নিকট বলিয়াছিলেন,—"ওঁর ভালবাসা যে কত গভীর ও নিঃস্বার্থ, আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি; আমরা স্বার্থপর, তাই নিজের দুঃখের ভয়ে স্বামীর আগে যাইতে চাই।"

শিবচন্দ্রের পত্নী যেমন পতিপরায়ণা ছিলেন, তেমনি ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন; পূজা আহ্নিকে যত দিন বিশ্বাস ছিল, নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ক্রমে, স্বামীর সঙ্গগুণে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস লোপ পাইলে, তাঁহার স্বামীর কুলপুরোহিত বংশসম্ভূত পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়—যিনি বহু বৎসরকাল বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন—তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এইজন্য শিবচন্দ্রের পত্নী উক্ত শিরোমণি মহাশয়কে চিরদিন সম্মান ও ভক্তি করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বামীই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর, তিনি স্বামীর সহিত প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন; ইহাতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম যোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল, মৃত্যুও তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার দেবোপম স্বামীর উপদেশ ও দৃষ্টান্তের গুণে, পরিশেষে আধ্যাত্মিক উন্নতির এত উচ্চ শিখরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে, পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে, বলিয়াছিলেন,—"আমি এখন আমার সন্তানদিগকে রাস্তার মুটিয়ার সহিত সমদৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছি।" স্বামীর মৃত্যুর পর, একবার তিনি, তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের সমভিব্যাহারে, উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বড় লজ্জা পাইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "যে মেয়ে মানুষটি আসিয়াছেন, ইনি সাধারণ মেয়ে মানুষ নন, তোমরা ইঁহার পায়ের ধূলা লও। মুনি ঋষিরা কঠোর তপস্যা করিয়া যে ভগবান্‌কে লাভ করেন, ইনি মা, বাপ, শ্বশুর ইত্যাদি গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিয়া এবং স্বামী ভক্তি দ্বারা সেই

ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন।” বলা বাহুল্য যে, শিষ্যেরা গুরুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন।

বাস্তবিকই শিবচন্দ্রের পত্নীর ন্যায় পতিপ্রাণা রমণী অতীব দুর্ল্লভ; পতির ক্ষুদ্রতম অভাব পূরণের আয়োজন তিনি সেই অভাব অনুভূত হইবার পূর্ব্বেই করিতেন। পতিকৃত অঙ্গীকার পালনেও তিনি বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। একবার শিবচন্দ্র, পীড়ার চিকিৎসার জন্য, কলিকাতায় আসিয়া থাকিবেন বলিয়া একখানি বাটী ভাড়া লইতে প্রতিশ্রুত হইয়া বাটীর অধিস্বামীকে উহা খালি রাখিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে তাঁহার আসা ঘটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পত্নী স্বামীর কথা রক্ষার জন্য সেই বাটী একবৎসরের জন্য ভাড়া লইয়াছিলেন এবং তথায় দুই তিন মাস থাকিয়া একবৎসরের ভাড়া দিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার কোনও বিধবা আত্মীয় আসিয়া তাঁহার কাছে ছিলেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই, মাসখানেক থাকিয়া চলিয়া যান। শিবচন্দ্রের পত্নী তাঁহাকে এক শত টাকা দিয়াছিলেন; তিনি এইরূপে গোপনে কত দান করিতেন তাহার সংখ্যা নাই।

তাঁহার ন্যায় দয়াশীলা রমণী অতি অল্পই দেখা যায়। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বামীর অপেক্ষা কোনও অংশেই কম ছিলেন না। পরের দুঃখ দূর করিতে তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশিনীদিগকে তিনি নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। কোনও রুক্ষকেশার মস্তকে স্বহস্তে তৈল ঢালিয়া দিতেন; কোনও ক্ষুধার্ত্তাকে বসাইয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইতেন; কোনও বস্ত্রহীনাকে বস্ত্রদান করিতেন; কাহাকেও বা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেন। একবার তিনি কোন্নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সমস্ত কাঙ্গালদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন। কাঙ্গালীরা মাছের মুড়া খাইবে ইহা দেখিবার তাঁহার বড়ই সাধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই মহাভোজে তিনি যেরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, অনেকে আত্মীয় কুটুম্ব খাওয়াইবার জন্যও তত আয়োজন করেন না।

তাঁহার গৃহিণীপনার কথা কি বলিব? অতি প্রাচীন বয়সেও তাঁহার গৃহসজ্জা দেখিলে বিস্মিত হইতে হইত। যেখানে যে দ্রব্যটি রাখা উচিত তাহার অনুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যাইত না। তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। কোনওরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রতুল হইলে যতক্ষণ না সেই অভাব দূর হইত ততক্ষণ তিনি সুস্থির হইতে পারিতেন না। তাঁহার সংসারে কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলতা বা অপরিচ্ছন্নতা স্থান পাইত না। তিনি উপযুক্ত বিষয়ে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু কখনও কোনরূপ অপব্যয় করিতেন না। তিনি আমরণ স্ববশে ছিলেন, পরিজনের মুখাপেক্ষা করিয়া কখনও নিজের হস্ত পদ চালনা করিতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার শরীরে আলস্য ছিল না। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না।

বাটীতে কোনও প্রতিবেশিনী বেড়াইতে আসিলে সলিতা পাকান বা সুপারি কাটা প্রভৃতি কোনও কাজ হাতে লইয়া গল্প করিতে বসিতেন। প্রাচীন বয়সেও চশমা ধরিয়া, দৌহিত্রীগণের কাছে কার্পেট বুনিতে শিখিয়া কত জুতা, থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বৃথা গর্ব্ব তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, অথচ অন্যায্য হীনতাও সহিতে পারিতেন না। গৃহ-প্রাঙ্গণ, ঘর-দ্বার হইতে নিজ শরীর, সন্তান সন্ততি, গৃহসামগ্রী পর্য্যন্ত যাহাতে সর্ব্বদা যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত থাকে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। দাস দাসী অবধি কখনও মলিন বস্ত্রে তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহস করিত না। তিনি যেমন পবিত্রচেতা ছিলেন, তেমনি সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত হইয়া রাজরাণীর ন্যায় বিরাজ করিতেন। পরিবারবর্গ সকলেই যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, তজ্জন্য প্রত্যেকর স্বতন্ত্র গৃহ স্বতন্ত্র দ্রব্যাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার ন্যায় মিতাচারিণী, মিতব্যয়শীলা, অথচ উচ্চ প্রকৃতির রমণী, এখনকার দিনে প্রায় দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, অযথা বড় নজর করিয়া কত বড় বড় ঘর বাহ্যাড়ম্বরে অর্থ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে। সুখের সময়েও কেহ তাঁহাকে গর্ব্বিত দেখে নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে এই চিন্তা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন এবং বলিতেন,—“আমাদের এমন দিন চিরদিন থাকিবে না, মানুষের এ জগতে কাহারও চিরদিন সমান যায় নাই; আমার যে মাতুল স্বর্ণথালে আহার করিয়া সুরম্য পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যাইতেন, তাঁহাকেই শেষ দশায় কলাপাতে আহার করিয়া বালাণ্ডার মাদুরে নিদ্রা যাইতে দেখিয়াছি।” এদিকে এত মিতব্যয়ী হইলেও, যাহাতে সংসারে সৌষ্ঠব থাকে সে বিষয়ে তাঁহার বড় যত্ন ছিল। তিনি বলিতেন, —“ডোক্‌লামো দেখ্‌তে পারি না, ঘরওয়ানা ঘরের যথারীতি হওয়া চাই ত।” কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ে যেমন কৃপণতা ছিল না, তেমনি আবার কোনও তুচ্ছ দ্রব্যও নষ্ট হইতে দিতেন না। একদিন তাঁহার পুত্রবধূ মাসকাবারী বাজারের দ্রব্য সমূহ ভাণ্ডারে গুছাইয়া রাখিবার সময়, মসলা-বাঁধা কাগজ ও দড়িগুলি জঞ্জালের সহিত ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া, তিনি সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া বলিয়াছিলেন,—“কোনও জিনিস ফেলিতে নাই, মা! ‘যাকে রাখ, সেই রাখে’ আমার মা এই প্রবাদ বচনটি বলিতেন।”

শিবচন্দ্রও বোধ হয় উক্ত প্রবাদ বচনানুসারে অদরকারী পত্রাদির অলিখিত শেষার্দ্ধ ছিন্ন করিয়া তাঁহার হাত বাক্সে রাখিতেন; নিজের বা অপর কাহারও চিরকুট কাগজের প্রয়োজন হইলে, অবিলম্বে বাক্স হইতে বাহির করিতেন। ছুঁচ সূতা পর্য্যন্ত তাঁহার বাক্সে যত্নে সংরক্ষিত হইত।

শিবচন্দ্রের গৃহিণী অভিজ্ঞতায় সেকালের গৃহিণীদিগেরও শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন; কত যে গাছ গাছড়ার ঔষধ জানিতেন তাহার সংখ্যা নাই। শিশু চিকিৎসায় তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। শিবচন্দ্রের নিয়ম ছিল, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া রোদন করিলে পর ধাত্রী আসিয়া নাড়ীচ্ছেদ করিবে। এইরূপ নিয়মে ন্যূনাধিক সাতচল্লিশটি নাতি নাতিনী তদীয় পত্নীর হস্তে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। "শিশুপালনের পিতা" পত্নীকে পরিহাস করিয়া বলিতেন,—"ধাত্রীবিদ্যায় প্রসব কার্য্যে তোমাকে সার্টিফিকেট্ দেওয়া যাইতে পারে।" তাঁহার স্বামীর জ্ঞাতিবর্গ ও পাড়ার সকলে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলভোগ করিয়া তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিত।

শিবচন্দ্রের পত্নী সুযোগ পাইলেই গাছ গাছড়ায় ঔষধ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। একবার একটি বিস্ময়াবহ ঘটনায় তাঁহার এরূপ চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। ঘটনাটি এই। শিবচন্দ্র পেন্‌সন্ লইয়া কোন্নগরের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন একটি স্ত্রীলোক তদীয় পত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "মা! আমি ব্রাহ্মণকন্যা, বড় বিপদে পড়িয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি; আপনি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।" শিবচন্দ্রের পত্নী, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া, তাঁহার কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আমি একটি দুরারোগ্য স্ত্রী-ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছি। অনেক চিকিৎসাতেও রোগ আরাম হইল না। এমন কি, ক্রমে ক্রমে আমি লোকালয়ে যাইতেও লজ্জাবোধ করিতেছি, আমার এমন অবস্থা হইয়াছে। পরিশেষে আমি ৺বাবা তারকনাথের চরণে ধর্ণা দিলাম, তাহাতে আদেশ পাইয়াছি যে, কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব নিজে হাতে করিয়া আমাকে যাহা দিবেন আমি তাহাতেই আরোগ্য লাভ করিব।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী কাতরস্বরে পুনরায় বলিলেন,—"মা! এক্ষণে তোমার স্বামীকে বলিয়া আমায় রোগমুক্ত কর।"

শিবচন্দ্রের পত্নী ব্রাহ্মণীর কাতরতায় দয়ার্দ্রচিত্তে তখনই স্বামীর নিকট গমন করিয়া সকল কথা বলিলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—আমি কি দিব? আমি ঔষধ কিছুই জানি না, কি রোগ তাহাও জানি না। তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া ডাক্তার দেখাইতে বল।"

শিবচন্দ্রের গৃহিণী পুনরায় ব্রাহ্মণীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—"বাবা বলিয়াছেন, উনি হাতে করিয়া যাহা দিবেন আমি তাহাতেই আরোগ্যলাভ করিব। অতএব উনি যাহা ইচ্ছা করেন আমাকে হাতে তুলিয়া দিন।"

শিবচন্দ্রের পত্নী পুনরায় পতির নিকটে আসিয়া এ বিষয়ে বার বার জিদ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বাটীর ফটকের পার্শ্ববর্ত্তী

বাগান হইতে একমুঠা ঘাসমিশ্রিত আগাছা ছিঁড়িয়া আনিয়া ব্রাহ্মণীর হাতে দিলেন।

ব্রাহ্মণী সেই গাছগাছড়া হাতে লইয়া সন্তুষ্ট মনে শিবচন্দ্রের পত্নীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন। সে সময়ে, শিবচন্দ্রের পত্নী ব্রাহ্মণীকে এই অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে, উহাতে ব্রাহ্মণীর রোগ আরাম হইল কিনা তাহা তিনি নিজে আসিয়া বলিয়া যাইবেন।

ইহার কয়েক মাস পরে, সেই ব্রাহ্মণী একদিন কোন্নগরে আসিয়া উপস্থিত। তিনি সেই ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, এই কথা সকলকে বারবার বলিতে লাগিলেন এবং শিবচন্দ্রের পরিবারবর্গকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শিবচন্দ্র পত্নীর নিকট একথা শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন; ভাবিলেন, ভগবানের কৃপায় কিনা হইতে পারে?

পত্নী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি ঐ গাছ আবার চিনিতে পারেন কিনা? কারণ, তাহা হইলে ঐ গাছের নাম জানা থাকিলে উহা দ্বারা অপর কাহাকেও উক্ত রোগ হইতে মুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু শিবচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, —"কি গাছ আমি কিছুই জানিনা, যাহা হাতে উঠিয়ছিল তাহাই দিয়াছিলাম, এখন কি আর তাহা আমার মনে আছে?" বস্তুতঃ ঔষধ কোনও গাছগাছড়ায় ছিল না—ছিল রোগিণীর মনে—তাঁহার ঐকান্তিক বিশ্বাসে।

সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী শিবচন্দ্রের গৃহিণীর দুই তিনটি ভাণ্ডার ঘরে সর্ব্বদাই সংগৃহীত থাকিত। শম্ভু চক্রবর্ত্তী নামে শিবচন্দ্রের অনুগত জনৈক ব্রাহ্মণ প্রায়ই বলিতেন, "ব্রহ্মাণ্ডের জিনিষ ছোট খুড়ীর ভাণ্ডারে।" একবার কোন্নগরের কোনও মুমূর্ষু রোগীর হস্তপদ শীতল দেখিয়া কবিরাজ পুরাতন ফাগু মর্দ্দনের ব্যবস্থা দেন; গ্রামের প্রত্যেক দোকান, বাজার ও গৃহস্থের বাটী ঘুরিয়া উক্ত দ্রব্য পরিশেষে শিবচন্দ্রের অন্তঃপুরে পাওয়া গেল। একদিন তাঁহার কোনও কলিকাতাবাসিনী কুটুম্বিনী তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার মানসে হঠাৎ কোন্নগরে আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় ব্যর্থ হইল। তাঁহার আগমনের অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই নিঃশব্দে আহৃত নানাবিধ ফলমূল, সরবত ও মিষ্টান্ন যাহা পল্লীগ্রামের দোকানে পাওয়া অসম্ভব, এরূপ গৃহপ্রস্তুত রাশীকৃত খাদ্যসামগ্রী তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে, কুটুম্বিনী বলিলেন, —"এমন পাকা গিন্নিকে ঠকান কি সহজ কথা? হঠাৎ এত আয়োজন পল্লীগ্রামে ব'সে কি ক'রে হ'ল?"

সেকালের পুরন্ধ্রীবর্গ পুঁতিগাঁথা প্রভৃতি যে সকল শিল্পের জন্য এবং চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ প্রভৃতি যে সকল মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, প্রথম

বয়সে তাঁহারও তজ্জন্য বিশেষ প্রশংসা ছিল। পরে, "পাক রাজেশ্বর" প্রভৃতি গ্রন্থের উপদেশানুসারে তিনি আরো নানাবিধ মিষ্টান্ন, মোরব্বা ও আচারাদি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন। একদা তাঁহার বৈবাহিক ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়, কোন্নগরের বাটীতে নিজ পুত্রবধূকে (শিবচন্দ্রের চতুর্থা কন্যাকে) দেখিতে আসিয়া গৃহপ্রস্তুত মিষ্টান্ন জলযোগান্তে বাটী ফিরিয়া গিয়া নিজ গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন,—"বেহান ঠাকুরাণীর স্বহস্ত প্রস্তুত মিষ্টান্নগুলি অতি উপাদেয়, মোহনভোগ অবধি এমনি সুস্বাদু যে কি বলিব, কই রোজ ত বাড়ীতে মোহনভোগ খাই, এমন হয় না কেন?" মিত্রগৃহিণী বৈবাহিকাকে সেই কথা আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলায়,উত্তরে দেবগৃহিণী বলিয়াছিলেন যে, মন দিয়া করিলেই মোহনভোগ ভাল হইবে। তিনি সকল কাজই মনোযোগ দিয়া করিতেন। আমরা আজ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত গজার ও আনারসের মোরব্বার আস্বাদ ভুলিতে পারি নাই।

দেবগৃহিণী লোককে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন; অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থার লোককে খাওয়াইয়া তিনি অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন। একদিন বাটীতে কোনও ক্রিয়া উপলক্ষে অনেকগুলি মহিলার আহারের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; দেবগৃহিণী দেখিলেন আহারস্থানে পাচকগণ যে রমণীর অঙ্গে যত বেশী অলঙ্কার তাহার পাতে তত বেশী ভাল দ্রব্য পরিবেশন করিতেছে। তখন পাচকগণকে সকলের অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ ঠাকুর! যার হাতে পিতলের বালা দেখিবে, তার পাতেই মাছের মুড়া দিও।" কোনও নূতন দ্রব্য ঘরে আসিলে বা প্রস্তুত করা হইলে, তিনি উহা অল্প বিস্তর পরিমাণে সরকার, দারোয়ান, দাস দাসী হইতে মেথরকে অবধি দিতে আদেশ করিতেন; বলিতেন সকলকে "দিও কিঞ্চিৎ, না ক'রো বঞ্চিত"—এটি তাঁহার মা'র কাছে শ্রুত একটি প্রবচন।

শিবচন্দ্রও লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন; তিনি নিজে মিতভোজী হইলেও, নিমন্ত্রিতগণের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্যের প্রচুর আয়োজন করিতেন। তাঁহার বাগানের উৎকৃষ্টতম আম্রেরও এক চাকলার অধিক কখনও নিজে খাইতেন না, কিন্তু অতিথিগণের পাতে সেই সকল আম্র স্তূপীকৃত হইত। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বাস্থ্যের জন্যই হউক, বা অন্য কোনও কারণে, ফলের মধ্যে কমলা লেবু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল; তিনি উক্ত ফল বাজারে প্রথম দেখা দিলেই ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন (যদিও অম্লরসাধিক্যবশতঃ তখন উহা অনেকেরই অনুপভোগ্য) এবং যতদিন উহা বাজার হইতে অন্তর্হিত না হইত ততদিন তাঁহার জন্য প্রত্যহ সংগৃহীত হইত। অধুনা কলিকাতার বাজারে কমলা লেবু ত বার মাস পাওয়া যায়।

শিবচন্দ্রের গৃহিণীর এরূপ সদ্বিবেচনা ছিল যে, তাঁহার পরিবারভুক্তা কাহারও কোনও ত্রুটি হইলে, অপরের সাক্ষাতে তজ্জন্য কোনও কথা বলিতেন না। একদিন কোনও প্রতিবেশিনী দেববাটীতে বেড়াইতে আসিলে, দেবগৃহিণী কোনও আত্মীয়াকে তাঁহার জন্য বসিবার স্থান দিতে বলায়, আত্মীয়া তাঁহার মাদুরখানি পাতিয়া দেন। ভদ্ররমণীর বসিবার জন্য মাদুর পাতিয়া দেওয়া তাঁহার বাটীর রীতি-বিরুদ্ধ মনে হইলেও তিনি তখন কিছু বলিলেন না। প্রতিবেশিনী চলিয়া গেলে পর আত্মীয়াকে বলিলেন "এত গালিচা সতরঞ্চি থাকিতে আদর ক'রে আসিবামাত্র বসিতে কি মাদুর পেতে দেয়?" তিনি সেই অবধি শিক্ষা পাইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইলেন।

পল্লীগ্রামের গৃহিণীগণের গৃহকর্ম্মসমাপনান্তে ও আহারাদির পর শিশু সঙ্গে লইয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী গল্প করিতে যাওয়ার প্রচলন আছে। যদিও শিবচন্দ্রের অন্তঃপুরবাসিনীগণ কলিকাতাবাসিনীগণের ন্যায় থাকিতেন, বাটীর বাহির হইতেন না, তথাপি অপর বাটীর স্ত্রীগণ দেববাটীতে আসিতেন; আসিয়া, কার বউ কেমন, কে শ্বাশুড়ীর বশ, কে অবশ, কে কি খাইল, কে কি পরিল, এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তাহাতে দেবগৃহিণী হাসিয়া বলিতেন, "কেন? বউ কি গরু ছাগল, না কুকুর বিড়াল, যে দিন রাত্রি বশে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়? সকলকার শরীরেই ভগবান্ আছেন, যা'র যা উপযোগী সেই রকমে তা'কে তিনি চালাইতেছেন।"

তিনি কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ভালবাসিতেন না। তাঁহার পুত্রবধূ প্রভৃতির খাওয়া-পরা চাল-চলন সম্বন্ধে কখনও কোনও কথা ত কহিতেনই না, দাস দাসীদিগকে অবধি কখন পীড়ন করেন নাই; অথচ এমন নিয়ম প্রণালী ছিল যে তাঁহার সংসারের রীতিনীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। যে সকল স্ত্রীলোক দেববাটীতে বেড়াইতে আসিতেন, তাঁহারা প্রায়ই নিজ নিজ ভ্রাতৃজায়া বা পুত্রবধূগণের নিন্দাবাদ পাঁচমুখে করিতেন। তখন দেবগৃহিণী তাঁহাদের কাছে নিজ পুত্রবধূ, নাতি বউ প্রভৃতির প্রশংসা করিতেন, যথা—"বউ মা আমার দশভুজা, একহাতে একেবারে কত কাজ করতে পারেন," অথবা "ময়রার মেয়ে কি চমৎকার সন্দেশের পাক করেছেন," "নাতিবউ আমার কি পরিষ্কার লুচি রুটি বেলেন, যেন দুধের সর," ইত্যাদি। এরূপ বলিলেও, পাড়ার গৃহিণীগণ অভ্যাসবশতঃ নিজ নিজ বাটীর বধূদের নিন্দা করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। নিন্দার মাত্রা অতিরিক্ত হইলে, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া বলিতেন "ও কি গো! এমন দশের কাছে নিন্দা করিলে যে জন্মের মত ঝি বউয়ের ভাল কাজে উৎসাহ চলে যাবে।" তিনি নিজে ভাল ভাল বলিয়া মন্দকেও ভাল করিয়া তুলিতেন, এবং সেই কৌশল সকলকে শিক্ষা দিতেন।

তিনি কিছুরই বাড়াবাড়ি সহিতে পারিতেন না। বিধবার অতিরিক্ত বিচার সম্বন্ধে বলিতেন "সবই সীমার মধ্যে থাকা ভাল, সীমাবহির্ভূত হইলেই ফল বিপরীত হয়। একটি গল্প আছে—কোনও ঋষির উৎকট বিচার ছিল; তিনি জলাশয়ের জলপান করা অশুদ্ধাচার মনে করিতেন, কারণ তাহাতে মৎস্যাদি জীব বাস করে। এই হেতু তিনি বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য জল পান করিতেন না। একদিন তিনি বৃষ্টির জলের প্রতীক্ষায় মুখব্যাদান পূর্ব্বক উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার দৃষ্টিপথের অগোচরে একটা চিল উড়িতেছিল, সে হঠাৎ মলত্যাগ করায় উহা ঋষির মুখের মধ্যে আসিয়া পড়িল। অত্যন্ত বিচারে এই গতি হয়।"

একদিন কোনও ব্যক্তির প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, কোনও ব্রাহ্ম প্রচারকের পত্নী এমনি বৈরাগিনী যে একবার তাঁহার স্বামী তাঁহার জন্য চৌড়া-পেড়ে কাপড় আনিলে পর তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ পাড় ছিঁড়িয়া মুড়ি সেলাই করিয়া তবে পরিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তবে আর বৈরাগিনী হইলেন কই? বেশ সম্বন্ধে বিলক্ষণ অনুরাগিণী। যা যুটিল তাই পরিয়া খাইয়া আমরা দিন কাটাইব; অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত করিতে গেলেই সময় ও পরিশ্রম নষ্ট হয়। দক্ষিণেশ্বরে সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে তাঁহার চেলারা সার্ট ও কালাপেড়ে ধুতি পরাইয়া দিয়াছে, তাই পরিয়াই নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া আছেন, দেখিলাম যে দিকে কোনও খেয়ালই নাই; ধর্ম্ম কথা কহিতেছেন লোককে উপদেশ দিতেছেন। ইহাকেই প্রকৃত বৈরাগ্য বলে।"

তাঁহার রুচি সে কালের গৃহিণীদিগের ন্যায় ছিল না, অতি সদ্বিবেচনা-সঙ্গত, পরিমার্জ্জিত ও উন্নত রুচি ছিল।

তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে, তিনি অহোরাত্র রোগী বা রোগিণীর শুশ্রূষা করিতেন. তাঁহার কন্যাগণও জননীর এই গুণ পাইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃই ধীর ও গম্ভীর ছিল, কিন্তু তিনি বিলক্ষণ পরিহাসরসিকা ছিলেন, এবং নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে কখনও ইতস্ততঃ করেন নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিবচন্দ্র কন্যাগণের শিক্ষার জন্য বাটীতেই পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং একটি কন্যাকে কলিকাতায় রাখিয়া বেথুন-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার দুহিতারা সকলেই তৎকালে সুশিক্ষিতা বলিয়া পরিচিতা হইয়াছিলেন—

"সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীয় ভাব।"

পিতার সুবন্দোবস্তে তাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে শিক্ষার গুণে তাঁহারা প্রত্যেকে সুশীলা, ধর্ম্মশীলা ও গৃহকর্ম্মকুশলা হইয়া নিজ নিজ স্বামীগৃহের

কুললক্ষ্মী হইয়াছিলেন, সে অমূল্যশিক্ষা তাঁহার তাঁহাদের আদর্শ জননীর নিকট পাইয়াছিলেন। জননী কন্যাদিগকে একদণ্ডের তরে দৃষ্টি-বহির্ভূত হইতে দিতেন না। তিনি যখন যে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, কন্যারা মাতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাহা লক্ষ্য করিত। মাতা কন্যাদিগকে মুখে মুখে কেবল মানসাঙ্ক শিখাইয়া সন্তুষ্ট হইতেন না; রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি নানাগ্রন্থ হইতে নীতিমূলক আখ্যায়িকা শুনাইয়া তাহাদিগকে নীতি-শিক্ষা দিতেন। কিসে তাহারা নৈতিক উন্নতি লাভ করিবে, কিসে তাহারা দয়া ধর্ম্ম অভ্যাস করিবে, কিসে তাহারা নম্রতা ও লজ্জাশীলতা শিখিবে, কিসে তাহাদের সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মিবে, জননী অনন্যমনা হইয়া অহরহঃ সেই চেষ্টায় থাকিতেন। একবার একটি কন্যা "ডেপুটিকালেক্টারের কন্যা" বলিয়া কাহারও নিকট নিজের প্রাধান্য জানাইতেছিল; মাতা তাহা শুনিতে পাইয়া, অবিলম্বে তাহার অবিনয়ের শাসন করিলেন। তিনি কখনও কোনও সন্তানের গায়ে হাত তোলেন নাই; কিন্তু তাঁহার স্থির, দৃঢ়, গম্ভীর তিরস্কারে দোষ জন্মের মত সংশোধন হইয়া যাইত।

কন্যারা যাহাতে সত্যপরায়ণা হয়, জননীর সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। দোষ করিয়া দোষ গোপন করিবার চেষ্টা না করিলে, তিনি সন্তানের সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেন। আমরা তাঁহার সত্যনিষ্ঠার একটিমাত্র উদাহরণ দিব। একবার কোন্নগরের বাটীতে একজন দৈবজ্ঞ সন্ন্যাসীর আগমন হইয়াছিল। অন্যান্য পুরাঙ্গনাদের সঙ্গে শিবচন্দ্রের গৃহিণীও ভাগ্য গণনার জন্য উক্ত সন্ন্যাসীকে হাত দেখাইয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সধবাবস্থায় মৃত্যু হইবে কি না? সন্ন্যাসী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, সে যদি প্রকৃত উত্তর দেয়, তাহা হইলে উহা অপ্রিয় সত্য হইলেও, তিনি তাহাকে তাহার প্রাপ্য পুরস্কার দিবেন। সন্ন্যাসী তখন তাঁহাকে বলিল যে তিনি বিধবা হইয়া মরিবেন। এই অমঙ্গলের কথা শুনিয়াও তিনি সন্ন্যাসীকে তাহার সত্যনিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ একটি টাকা দিয়াছিলেন।

তিনি নিজে কাহাকেও কটূক্তি করিতেন না এবং অপর কাহাকেও কটূক্তি করিতে দেখিলে, নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেন—

"পরমুখে কটু ভাষা সহিতে না পার।
তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর।।"

তিনি দাসদাসীর প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিতেন। যদি তাঁহার কোনও কন্যা স্বীয় দাসদাসীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বলিতেন "দেখ মা! লোকজনের প্রতি বিরক্ত হইও না। উহারা লক্ষ্মীর বরযাত্র। তোমাদের নিকট আছে, তুমি উহাদের রাখিতে পারিয়াছ বলিয়া। উহাদেরও আমাদের মত রক্ত মাংসের

শরীর; কোনও কারণ বশতঃ উহাদেরও রাগ দুঃখ হইতে পারে।” একবার অর্জ্জুন নামে তাঁহার বাগানের জনৈক মালী, দেববাটীর পাকশালায় প্রবেশ করিয়া, হাঁড়ি হইতে অন্নের ভাইল চুরি করিয়া খাইতে ছিল; একজন পরিচারিকা তাহা দেখিতে পাইয়া চোরকে ধরাইয়া দেয়। দেবগৃহিণী, অপরাধীকে ডাকাইয়া তাহার অপরাধের গুরুত্ব তাহাকে ধীরভাবে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, “তুই ধরা না পড়িলে আমাদের সকলকে ত তোর উচ্ছিষ্ট খাইতে হইত; তুই কেন এ কাজ করিলি, সত্য করিয়া বল্, আমি তোকে কিছুই বলিব না।” এই অভয়বাক্য পাইয়া সে বলিল “মা ঠাক্‌রুণ! আমি উহা গুড়ের পায়স মনে ক'রে লোভ সাম্‌লাইতে পারি নাই।” দেবগৃহিণী এই কথা শুনিয়া মালীকে বলিলেন “তোর যদি গুড়ের পায়েস খাইবার এত ইচ্ছা হইয়াছিল তবে আমাকে বলিস্ নাই কেন? যা হোক্, এমন কাজ আর কখনও করিস্ না।” অতঃপর, অর্জ্জুন মালী একদিন পেট ভরিয়া পায়স খাইতে পাইয়াছিল।

শিবচন্দ্রও আদর্শ প্রভু ছিলেন। কোনও কার্য্যের প্রয়োজন হইলে তিনি ভৃত্যদিগকে এত ধীর ও শান্তভাবে এবং মিষ্টস্বরে আদেশ করিতেন যে, তাহারা যে ভৃত্য এবং তিনি যে প্রভু এ কথা, বোধ হয়, তাঁহার মনে উদয় হইত না—তাহারা যেন দয়া করিয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া দিবে। কিন্তু তাঁহার সৌম্য সৌজন্যের কি এক আশ্চর্য্য মহিমা ছিল যে ভৃত্যেরা সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য ব্যগ্র হইত! তিনিও তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। একবার শীতকালে আলস্য বশতঃ তাহাদের জন্য লেপ বাহির করা হয় নাই শুনিয়া তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া তদ্দণ্ডেই লেপ বাহির করাইয়া দিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্র ধনীর সহিত কুটুম্বিতা করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন; তিনি ছয় কন্যাকেই বর্দ্ধিষ্ণু বনিয়াদী বংশে ও কৃতবিদ্য সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। জামাতারা এবং বৈবাহিকেরা সকলেই শিবচন্দ্র ও তদীয় পত্নীকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

দ্বিতীয়পক্ষের বরে কন্যা সম্প্রদান করা শিবচন্দ্রের একেবারেই অনভিমত ছিল; তিনি বলিতেন যে, প্রথম বিবাহই প্রকৃত বিবাহ। তিনি আর একটি কথা বলিতেন যে, কন্যার বিবাহ শহরে দিলে সে সুখে থাকে এবং পল্লীগ্রাম হইতে বধূ আনিলে সে সুশীলা, লজ্জাশীলা ও কর্ম্মিষ্ঠা হয়। কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলেই শিবচন্দ্রের গৃহিণী ঘটক ঘটকীদিগকে বলিয়া দিতেন যে, পাত্রের অনেকগুলি ভাই না থাকিলে তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন না। তিনি নিজে যেমন পাঁচজনের সহিত ঘর করিয়া গৃহধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার একান্ত

ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার কন্যাগণও সেই শিক্ষা পায়—নতুবা তাহারা স্বার্থপর হইবে।

শিবচন্দ্রের জামাতৃবৃন্দের নাম ও পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জ্যেষ্ঠ জামাতা—কলিকাতা সীমুলীয়া নিবাসী ৺কাশীনাথ ঘোষের পৌত্র ও ৺রামধন ঘোষের তৃতীয় পুত্র, "বেঙ্গলী" সংবাদ পত্রের সুবিদ্বান্ ও সুবিখ্যাত প্রথম সম্পাদক এবং মিলিটারি পে-এক্‌জামিনার আফিসের রেজিষ্ট্রার, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

দ্বিতীয় জামাতা—কলিকাতা আহীরীটোলা নিবাসী ৺গুরুচরণ মিত্রের চতুর্থ পুত্র ও হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশীয় ৺রামজয় দত্তের দৌহিত্র, শ্রীযুক্ত অমরলাল মিত্র।

তৃতীয় জামাতা—জেলা চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী ইছাপুর নিবাসী ৺বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র, এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রাধিকানারায়ণ ঘোষ।

চতুর্থ জামাতা—কলিকাতা নিমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত "আলালের ঘরের দুলাল" রচয়িতা ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র, শ্রীযুক্ত চুনীলাল মিত্র।

পঞ্চম জামাতা—কলিকাতা ঝামাপুকুর নিবাসী ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের তৃতীয় পুত্র, ঢাকার প্রসিদ্ধ সরকারী উকিল ও তমাদি-আইনের প্রামাণিক গ্রন্থ রচয়িতা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ. বি. এল।

কনিষ্ঠা জামাতা—কলিকাতা ঠনঠনিয়া নিবাসী ৺শঙ্কর ঘোষ-বংশীয় ৺হরধর ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র, কলিকাতার সুপরিচিত ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ, এল. এম. এস.।

শিবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র তাঁহার মধ্যবয়সের সৰ্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান এবং তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার কন্যাগণের সকলেরই নয় দশ বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার বিশাল অট্টালিকা শিশুগণের মধুর কলরবে সৰ্ব্বদাই মুখরিত থাকিত। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের পূৰ্ব্বে কোন্নগর কলিকাতা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিকতর স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, অতএব শিবচন্দ্রের বিবাহিতা কন্যারা মধ্যে মধ্যে স্বামীগৃহ হইতে সদ্য পীড়ামুক্ত সন্তানসহ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পিতৃগৃহে প্রেরিত হইতেন; আপন্নসত্ত্বারাও মাতৃসন্নিধানে প্রসব হইবার জন্য আসিতেন—শিবচন্দ্রের নাতি-নাতিনীরা এইজন্য প্রায় সকলেই কোন্নগরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এইরূপে অনেক সময় শিবচন্দ্রের দুই তিনটি কন্যা এককালে সসন্তান বাস করিয়া তাঁহার আনন্দ-নিকেতনের আনন্দবৰ্দ্ধন করিতেন। তাঁহার দ্বিতীয় জামাতাও কলিকাতা অপেক্ষা কোন্নগরে বেশি দিন থাকিতে ভালবাসিতেন। যে কারবারের তিনি একজন অংশীদার ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মূলধন খাটিত মাত্র, কিন্তু নিজে কোনও কাৰ্য্য করিতেন না, সুতরাং স্বেচ্ছামত

কোন্নগরে থাকিবার তাঁহার কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না এবং শিবচন্দ্রও তাঁহাকে এইজন্য পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন।

শিবচন্দ্রের বিদুষী কনিষ্ঠা কন্যার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিবার শুনিবার কোনও নিকট আত্মীয়া ছিলেন না। এইজন্য, যখন তাঁহার স্বামী, আরা ও রাজমহলে কয়েক বৎসর অতীব সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডাক্তারি করিয়া, পরিশেষে সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন শিবচন্দ্র, যতদিন পর্য্যন্ত জামাতার পসার উত্তমরূপ না জমিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাণসমা তনয়াকে একাদিক্রমে কয়েক বৎসর নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। জামাতা যখন পৈতৃক বাটীর অংশ পরিত্যাগ করিয়া একখানি স্বতন্ত্র বাটী ক্রয় করেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্র, তৃতীয় জামাতার কলেজের সমস্ত খরচ যোগাইয়া তাঁহাকে ইঞ্জিনিয়ার করিয়াছিলেন। উক্ত জামাতা যখন ইঞ্জিনিয়ার হইয়া বিদেশে চাকরি করিতেন, তখন তিনি কর্ম্মস্থান হইতে তাঁহার মাতাকে টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু নিয়মিতরূপে মাসে মাসে পাঠাইতেন না—যখন মনে হইত, তখন পাঠাইতেন। শিবচন্দ্র বেহানের অনুরোধে ঠিক মাসে মাসে নিজের টাকা হইতে টাকা লইয়া, নৌকা করিয়া ইছাপুরে গিয়া বেহানের হাতে নিজে টাকা দিয়া আসিতেন। জামাতার দীর্ঘ প্রবাসকালে, তদীয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদ্বয় কোন্নগরে অবস্থান করিতেন। শিবচন্দ্রের যত্নে কন্যা দুইটি সুশিক্ষিতা ও "সদ্ভর্ত্তৃ-প্রতিপাদিতা" হইয়াছিলেন। প্রথমাটি নাগপুরের প্রসিদ্ধ সরকারী এডভোকেট্ এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য সার্ বিপিনকৃষ্ণ বসু, সি. আই. ই-র গৃহিণী; দ্বিতীয়টির স্বামী—ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বাবু বরদাদাস বসু।

শিবচন্দ্র যদিও কন্যাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাদের স্বামী ও সন্তানগণকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া পারিবারিক জীবন চরিতার্থ করিতেন, তথাপি তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই একমনে তাঁহার পুত্রকামনা করিতেন। তাঁহার কন্যাদেরও একান্ত অভিলাষ ছিল যে তাঁহারা যেন একটি পিতৃবংশধর ভ্রাতার মুখচন্দ্র দেখিতে পান। সেজন্য, শিবচন্দ্রের পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে যখন একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তখন সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে, হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। শিশুটি আট মাস গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল—চলিত কথায় যাহাকে "আটাশে ছেলে" বলিয়া থাকে; দেখা গেল, উহার নিমীলিত নয়ন দুইটি একবারও উন্মীলিত হইতেছে না। প্রসূতি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, এতকালের পর যদি বা ভগবানের কৃপায় তিনি একটি পুত্র

সন্তান প্রসব করিলেন, পুত্রটি কি শেষে জন্মান্ধ হইল! কিন্তু "শিশুপালনের পিতা" ধীরভাবে শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণে উপদেশ দিলেন ও বন্দোবস্ত করিলেন। সকলকে বিষণ্ণ দেখিয়া সূতিকাগৃহের পরিচারিকা একদিন বলিয়াছিল,—"ওগো! তোমরা কেন মিছে ভয় করিতেছ? ছেলে কানা নয়, দিনের আলোয় চোখ চাইতে পারে না, রাত্রে প্রদীপের আলোয় চোখ খুলে দেখে, আমি বেশ ক'রে দেখেছি।" শেষে পরিচারিকার কথাই ঠিক হইল; দুই মাসের মধ্যেই নবকুমারে বেশ চোখ ফুটিল। ক্রমে অন্নপ্রাশনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েরা ধরিয়া বসিলেন যে উক্ত সংস্কারটি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। শিবচন্দ্র সকলপ্রকার আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কন্যাদের সনির্ব্বন্ধ উপরোধ এড়াইতে পারেন নাই। নৃত্যগীত ও ভোজাদি উৎসবের সকল অঙ্গের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল।

যথাকালে শিবচন্দ্র পুত্রের নাম "সত্যপ্রিয়" রাখিলেন।

ক্রমে, পুত্রের বয়োবৃদ্ধি সহকারে, শিবচন্দ্র তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রথমে শিশুর দেহ-চালনার জন্য চারিপার্শ্বে রেলিং বেষ্টিত একটি সুন্দর দারুময় দোলনা নির্ম্মিত হইয়াছিল; তৎপরে, উহার পরিবর্ত্তে ঠেলাগাড়ি (Perambulator) এবং পরে একটি বৃহৎ দোলনা-ঘোড়া (rocking-horse) শিশুর আরোহণের জন্য ক্রীত হইয়াছিল; পরিশেষে, শিশুর যখন বয়স সাত আট বৎসর, তখন তাহার জন্য একটি খর্ব্বকায় টাটু ঘোটক কেনা হইয়াছিল এবং কিয়ৎকাল গতে, তদপেক্ষা বৃহত্তর একটি অশ্ব খরিদ করা হইয়াছিল। শিশুপুত্রের বস্তু-পরিচয়ের জন্য পিতা একখণ্ড স্পঞ্জ, একখণ্ড রবার, একখণ্ড চা-খড়ি, ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ ছোট ছোট কাঠের কৌটা সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক বস্তুর গুণ বুঝাইয়া দিতেন। অধিকন্তু, "ইলষ্ট্রেটেড্ লন্ডন নিউস্" প্রভৃতি সচিত্র সংবাদপত্রাদি হইতে নানাজাতীয় পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদির ছবি স্বহস্তে কাঁচি দিয়া কাটিয়া লইয়া বস্ত্রনির্ম্মিত খাতায় (স্ক্র্যাপ-বুকে) আঁটিয়া পুত্রকে দিতেন এবং প্রত্যেক ছবির বিবরণ ব্যাখ্যা করিতেন।

বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য পুত্রকে স্বপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, গৃহ-শিক্ষার জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান পণ্ডিত ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নিজ ভবনে বাসা দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইলে পরে, পুত্রকে স্বপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া, গৃহে ইংরাজি শিক্ষার জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষককে এবং সংস্কৃতশিক্ষার জন্য ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সতীর্থ ৺মধুসূদন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

পুত্রের ব্যায়ামের জন্য মুদ্গর ও ডম্বেল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং নিজ বাটীতে জিম্‌ন্যাষ্টিকের সমস্ত সরঞ্জাম সংস্থাপিত করিয়াছিলেন ও পুত্রকে তদুপযোগী পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত কিনিয়া দিয়াছিলেন। পুত্রের সঙ্গীত শিক্ষার জন্য কৈশোরেই তাহাকে একটি হার্ম্মোনিয়ম ও তদ্বিষয়ক পুস্তকাদি কিনিয়া দিয়াছিলেন এবং কিয়ৎকালের জন্য একজন ফিরিঙ্গি সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তিনি প্রতি সপ্তাহে শ্রীরামপুর হইতে কোন্নগরে আসিয়া শিক্ষা দিয়া যাইতেন।

পুত্র যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, শিবচন্দ্র তখনও তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। আমরা তাঁহাকে বৃদ্ধবয়সে চশমা ধরিয়া পুত্রের সহিত সেক্সপীয়ারের নাটকাবলী পাঠ করিতে দেখিয়াছি। তিনি পুত্রের জন্য এরূপ কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, আমরা তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি না। আমরা কখনও তাঁহাকে উপদেশ ভিন্ন পুত্রকে শাস্তিদান করিতে দেখি নাই। শিবচন্দ্রের গৃহিণীও তাঁহার অঞ্চলের নিধিকে কখনও আদর ভিন্ন শাসন করিতে পারিতেন না। তিনি একবার স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"তুমি পুত্রকে শাসন কর না বলিয়া সে তোমাকে মোটেই ভয় করে না।" তদুত্তরে শিবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"আমি ইচ্ছা করি না যে সে আমাকে ভয় করিবে, আমি তাহার ভালবাসা চাই।" বস্তুতঃ, শিবচন্দ্র পুত্রের নিকট ভালবাসা ভিন্ন কখনও আর কিছুর প্রত্যাশা করেন নাই।

পুত্রকে সুখী করিবার জন্য তিনি অনুক্ষণ সচেষ্ট থাকিতেন। পুত্র নিজের উপার্জ্জনের টাকায় ও পিতার আংশিক সাহায্যে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে পুরাতন সংস্করণের গৌরবের অনেক লাঘব হয়, এইজন্য আমরা এরূপ পুস্তক ক্রয়ে অধিক অর্থব্যয় করা মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিতাম না। কিন্তু শিবচন্দ্র পুত্রের সুখেই সুখী হইতেন; তিনি কখনও এবিষয়ে পুত্রের ইচ্ছার প্রতিরোধ করেন নাই। অধিকন্তু, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার নিজের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, সুতরাং পুত্রকে উহার অনুশীলন করিতে দেখিয়া তিনি আন্তরিক আনন্দ বোধ করিতেন।

১৮৭৬ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে, বিংশতি বৎসর বয়সে, শিবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সত্যপ্রিয়, কলিকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত বসুবংশীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুলিশ কর্ম্মচারী ৺কালীনাথ বসু মহাশয়ের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া প্রথমা কন্যা কুমারী শরৎকুমারীর, ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে, পাণিগ্রহণ করেন। পাত্রীর পিতামহ, খ্যাতনামা সবর্ডিনেট্ জজ ৺লোকনাথ বসু মহাশয়, শিবচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, সুতরাং এই বৈবাহিক সম্বন্ধে তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ মত ছিল। তথাপি

তিনি পুত্রের স্বাধীনতায় কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং বিবাহের পূর্ব্বেই পাত্রীর সহিত পাত্রের পরিচিত হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। নববধূ কোন্নগরের বাটীতে আসিবার পূর্ব্বেই, শিবচন্দ্র বাটীর সকলকে বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, অলঙ্কার বা দানসামগ্রী লইয়া কেহ যেন কন্যাপক্ষের কোনওরূপ নিন্দাবাদ না করেন—যেন প্রশংসাই করেন। বলা বাহুল্য যে, শিবচন্দ্র ও তাঁহার গৃহিণী তাঁহাদের একমাত্র পুত্রবধূকে যৎপরোনাস্তি আদর ও যত্ন করিতেন। এ প্রসঙ্গে পুত্রবধূ তাঁহার পরলোকগত শ্বশুর মহাশয় সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"তাঁহার অপরিসীম দয়া ও স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই ভক্তিরসে আপ্লুত হই। কতবার পিতৃভবনে যাইবার বাধা পাইয়া আমার বিমর্ষ মুখ দেখিলে যে কোন উপায়ে হউক আমাকে দু-দিনের তরে পিতৃ-মাতৃ-সন্নিধানে বেড়াইয়া আনিয়া তবে সুস্থির হইতেন। তিনি আমার কাতরতা বা বিমর্ষতা কখন সহিতে পারিতেন না; এখন সংসারযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া জন্মদাতা পিতার অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক সময় মনে করিয়া আকুল হই।"

পুত্রের বিবাহ দিয়া শিবচন্দ্র একটি পৌত্রী ও একটি পৌত্র লাভ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণকালে পৌত্রীটির বয়স তেরো বৎসর ও পৌত্রটির বয়স পাঁচ বৎসরমাত্র ছিল।

শিবচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকেও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মহেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, গিরীশচন্দ্রকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। গিরীশবাবু হিন্দুকলেজ হইতে "সিনিয়র স্কলারশিপ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেয়ার স্কুলের অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ৺প্যারীচরণ সরকার মহাশয় যে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন, সেই সময় হইতে তাঁহার স্থলে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে বহু বৎসর সুখ্যাতির সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন। পেন্‌সন গ্রহণের সময় তাঁহার মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা ছিল। তিনি সকল বিষয়ে তাঁহার পিতৃব্যের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনি পিতৃব্য সদনে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে না পারিলে তৃপ্তি বোধ করিতেন না; পিতৃব্যও আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। পিতৃব্যের সকল সদনুষ্ঠানে তিনি আজীবন সহযোগী ছিলেন। শিবচন্দ্র তৃতীয় ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিস্তর যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের আলস্য ও অমনোযোগ বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গোপালচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের

অধীনে কয়েকবৎসর বিদেশে ডাক্তারি করিয়া পরিশেষে কাশ্মীরাধিপতি মহারাজা রণবীর সিংহের প্রধান ডাক্তার নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রবাসকালে. শিবচন্দ্র তাঁহার দেশস্থ কর্ম্মকর্ত্তা, ধনরক্ষক ও হিসাব-রক্ষক ছিলেন।

শিবচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রদিগেরও পরম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তন্মধ্যে ৺শ্যামাচরণ দেব, ৺চন্দ্রশেখর দেব ও বাবু সাতকড়ি দেব তাঁহার অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

আটান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিবচন্দ্রের পারিবারিক জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাটিয়াছিল। ১৮৬৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বরে তাঁহার মস্তকে সহসা এক নিদারুণ শোকের অশনিপাত হইল। ঐ দিবস, সূর্য্যোদয়ের ৩।৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে, তাঁহার প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ জামাতা, বেলুড়ের বাগান বাটীতে, চল্লিশ বৎসর বয়সে, স্ত্রী, ছয়টি পুত্র (তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের বয়ক্রম তখন পনেরো বৎসর এবং কনিষ্ঠের বয়স পাঁচ মাস মাত্র) ও তিনটি কন্যা (তন্মধ্যে দুইটি অবিবাহিতা) রাখিয়া, সান্নিপাতিক জ্বরবিকারে দেহত্যাগ করেন। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরেই শিবচন্দ্র জামাতার সংবাদ লইবার জন্য কোন্নগর হইতে বেলুড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। জামাতার অগ্রজ তাঁহার শোকাকুলা বৃদ্ধা জননীকে লইয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। শিবচন্দ্রের পতিশোকবিধুরা কন্যাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একটি মাত্র আত্মীয় স্বজন সেই বিজন কাননে উপস্থিত নাই।

শিবচন্দ্র এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের চক্ষুর জল সম্বরণ করিয়া ও আত্মস্থ হইয়া, রোরুদ্যমানা অনাথাকে দুই চারিটি কথায় স্থির হইতে বলিলেন। সংযমী মহাপুরুষ সেই দুর্ব্বিষহ শোকেও বিচলিত না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ জামাতার মৃতদেহের যথারীতি সৎকারের বন্দোবস্ত করিলেন, তৎপরে, বাটীর যেখানে যাহা কিছু দ্রব্য সামগ্রী ছিল তৎসমস্তের ফর্দ্দ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন—এই ফর্দ্দে কোনও তুচ্ছ দ্রব্যও বাদ পড়ে নাই। সে সময়ে তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি বিপ্লব চলিতেছিল তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানেন।

সে দিন এইভাবে কাটিল। সন্ধ্যার সময় শিবচন্দ্রের বিধবা কন্যার ভাসুর ৺শ্রীনাথ ঘোষ মহাশয় ও মৃতের দুই এক জন বন্ধু কলিকাতা হইতে বেলুড়ের বাগান-বাড়ীতে আসিলেন। তখন সকলে মিলিয়া অনাথ পরিবারের ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথ বাবু কেবল তাঁহার পঞ্চদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্রটির কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হইবে বলিয়া তাহাকে নিজের কাছে রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শিবচন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, সমগ্র অনাথ পরিবারের ভার গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, এবং শেষে তাহাই স্থির হইল। পরদিবস, শিবচন্দ্র মৃত

জামাতার ঘরের গাড়ী করিয়া, দাসী ও সরকার সঙ্গে দিয়া, কন্যা এবং দৌহিত্র দৌহিত্রীদিগকে কোন্নগরে প্রেরণ করিলেন।

কন্যাকে পাঠাইয়া দিয়া, শিবচন্দ্র জিনিস পত্র ফর্দ্দ করিয়া নৌকাযোগে কোন্নগরে পাঠাইতে লাগিলেন। দুইখানা নৌকা বোঝাই মাল এইরূপে দশ দিন কোন্নগরে যাতায়াত করিয়াছিল। শিবচন্দ্র প্রত্যহ কোন্নগরের বাটী হইতে আহারাদি করিয়া বেলুড়ে আসিতেন এবং সমস্ত দিন জিনিসপত্র পাঠাইয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিতেন।

শিবচন্দ্রের পত্নী অত্যন্ত কোমলহৃদয়া ছিলেন; তাঁহার মায়া মমতা অতিরিক্ত পরিমাণে ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রথমা কন্যার শৈশবে একবার "বাল্‌সা" (শিশুর সামান্য পীড়া) হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ঐ সংবাদ পাইয়া দেব-গৃহিণী এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে তিনি সমস্ত রাত ঘর বাহির করিয়াছিলেন— কখন ভোর হইবে এবং কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া সংবাদ আনাইবেন। আমরা এই সামান্য ঘটনা হইতে অনায়াসে কল্পনা করিয়া লইতে পারি যে, যে দিন শিবচন্দ্র পীড়িত জ্যেষ্ঠ জামাতার সংবাদ লইবার জন্য প্রত্যূষে বেলুড় যাত্রা করিয়া রাত্রে গৃহে ফিরিলেন না, সে রাত্রি তাঁহার গৃহিণী কি যাতনায় কাটাইয়াছিলেন! জামাতার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি সে রাত্রি "ওমা! আমি পুড়ে ম'লুম!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলিনীর ন্যায় বাটীর ছাদে ও দালানে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এক বৎসর আমি যেন শূন্যে ছিলাম, আমার মাথার ঠিক ছিল না, শুধু দেহটা কলের পুতুলের ন্যায় কাজ কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত। তখন আমি কেবল এই বলিয়া ভগবানকে ডাকিতেন যে, 'হে ভগবান! দেখো যেন আমায় শেষে জ্ঞানহারা করিও না।' এখন আমার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, আর আমি শোকে কাতর হইব না।"

প্রথম জামাতার শোকে দেব-গৃহিণী বাস্তবিকই অমূল্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সালের ৬ই আগষ্ট যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা তদীয় ষোড়শ বর্ষীয় মধ্যম পুত্রের অকালমৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হইয়া "মা! আমার কি হইল!" বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন দেব-গৃহিণী অটল ধৈর্য্য সহকারে নিজের শোক দমন করিয়া কন্যাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "মা! তুমি আমাকে না ডাকিয়া সেই জগজ্জননীকে ডাক—তিনিই তোমায় শান্তি দিবেন।" এই সর্ব্বজনপ্রিয় দৌহিত্রের শোকে সংযমী শিবচন্দ্রও ক্ষণকালের জন্য মুহ্যমান হইয়াছিলেন।

এক বৎসর পরে, শিবচন্দ্রের সংসারে আবার একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটিল। ১৮৭৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরে তাঁহার তৃতীয়া কন্যার স্বামীগৃহে মৃত্যু হইল। এই

সংবাদ পাইয়া দেব-গৃহিণী কিয়দ্দিবস দুহিতৃশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বশিক্ষার প্রভাবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় তাঁহার শোকের উপশম হইয়াছিল। তিনি জামাতার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কোন্নগরে আনাইতেন।

অনাথা জ্যেষ্ঠা কন্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতদিন না উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত—অন্যূন আট বৎসরকাল—শিবচন্দ্র কন্যা ও তদীয় সন্তানবর্গের সমগ্র ভার বহন করিয়াছিলেন, নিজ ব্যয়ে একটি দৌহিত্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন (অপরটির শৈশবেই মৃত্যু হয়), কন্যাকে মৃতস্বামীর ভিটায় পুনঃস্থাপিত করিবার সময় পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন এবং তাহার পর যতদিন জীবিত ছিলেন (অন্যূন দ্বাদশ বৎসরকাল) কনিষ্ঠ দৌহিত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রতি মাসে দশটি টাকা দিতেন।

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে বিবিধ সংবাদপত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, শিবচন্দ্র সেই সকল প্রবন্ধ যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে, যখন তিনি পিতৃ-জীবনী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন, উক্ত প্রবন্ধগুলি তখন তাঁহার বিশিষ্টরূপ সহায়তা করিয়াছিল।

শিবচন্দ্রকে প্রাচীন বয়সে, পুনর্ব্বার দুর্ব্বিষহ জামাতৃ-বিয়োগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৮২ সালের ১০ই অক্টোবরে, তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে, স্ত্রী, দুইটি পুত্র (তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠর বছর তখন ২৩ বৎসর ও কনিষ্ঠের বয়স ১৮ বৎসর) ও দুইটি কন্যা (তন্মধ্যে একটি অবিবাহিতা) রাখিয়া, মানবলীলা সম্বরণ করেন।

অনাথা দ্বিতীয়া কন্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতদিন না উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত—অন্যূন ছয় বৎসরকাল—শিবচন্দ্র এই কন্যাকেও ও তাঁহার সন্তানবর্গকে কোন্নগরে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং এই কন্যাকেও মৃতস্বামীর ভিটায় পুনঃস্থাপিত করিবার সময় পাঁচ শত টাকা দিয়াছিলেন।

কন্যা ও জামাতার শোক ব্যতীত শিবচন্দ্রকে কতিপয় দৌহিত্র দৌহিত্রীর বিয়োগ দুঃখও সহ্য করিতে হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছিলেন যে "এ সকল দুর্দৈব মানবজীবনের আনুষঙ্গিক, সুতরাং ভগবান্‌কে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাদের এ সমস্ত সহ্য করা কর্ত্তব্য।"

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে যে, ১৮২৬ সালের এপ্রেল মাসে, তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী গোপালনগর গ্রামে, তত্রত্য বর্দ্ধিষ্ণু ঘোষ বংশ-সম্ভূতা একটি নবম বর্ষীয়া বালিকাকে শিবচন্দ্র, পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমে, বিবাহ করেন। প্রায় ৬০ বৎসর পরে, যখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের তারকেশ্বর-গামী শাখা রেল সেওড়াফুলি ষ্টেশন হইতেন

নূতন খোলা হয়, সেই সময়ে বৃদ্ধ শিবচন্দ্র একবার শ্বশুরালয় যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—তাঁহার স্থবিরা সহধর্ম্মিণী, পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্রী এবং তাঁহার কোনও কোনও দুহিতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও দৌহিত্রবধূ। দৌহিত্রেরা এ সময়ে "দাদামণি"কে কালাপেড়ে কোঁচান ধুতি পরাইয়া এবং কাণে আতর, গলায় ফুলের মালা ইত্যাদি দিয়া "জামাই বাবু" সাজাইবার জন্য পরস্পর কল্পনা জল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কেহ উহা করিতে সাহস করেন নাই। শিবচন্দ্রের এই সুদীর্ঘকালের পর শ্বশুরালয় গমন বড়ই আনন্দজনক হইয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে পর পুরাঙ্গনারা শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আলিপনা দেওয়া পীঁড়ায় বসাইয়াছিলেন; ফলতঃ নবাগত বরের ন্যায় তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী ও সহযাত্রিণীগণেরও তদনুরূপ সমাদরলাভ হইয়াছিল। কিন্তু শিবচন্দ্রের শ্বশুরালয়ে রাত্রিবাস হয় নাই, তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়াছিলেন। প্রতীচ্য দেশে ষষ্টি বৎসরকাল যাবৎ পরিণীত দম্পতীর যেরূপ হীরক পরিণয় (Diamond wedding) হইয়া থাকে, শিবচন্দ্র ও তাঁহার জীবনসহচরীর একপ্রকার তাহাই হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়।

আমরা শিবচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের যথা কথঞ্চিত বিবরণ এইখানেই সমাপ্ত করিলাম। এক্ষণে তাঁহার সামাজিক জীবনের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শিবচন্দ্র স্বগ্রামের জন্য যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তিনি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বরচিত জীবনীতে "সামাজিক প্রসঙ্গ" (Matters Social) শীর্ষকের নিম্নে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সমাজের হিতসাধনই প্রকৃত সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য; এ হিসাবে আমরা শিবচন্দ্রের প্রকৃত সামাজিক জীবন পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক জীবন বলিলে আমরা তাঁহার স্বীয় সমাজভুক্ত অপর ব্যক্তিবর্গের সহিত কিরূপ আহার ব্যবহার, কিরূপ আচরণ, সচরাচর তাহাই বুঝি। এই অর্থেও, শিবচন্দ্র বড় সামাজিক ছিলেন; তিনি সমাজের ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেন; কাহারও প্রতি কখনও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হন নাই। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন বলিয়া স্বগ্রামবাসীদিগের কোনও পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে নিজে যোগ দিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু তৎসংক্রান্ত সামাজিক নিমন্ত্রণ অল্পবয়স্ক পুত্র দৌহিত্রাদি আত্মীয় দ্বারা রক্ষা করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি দুর্গোৎসবে যোগ দিতেন না বলিয়া অধ্যাপক প্রমুখ ব্রাহ্মণদিগের প্রাপ্য বার্ষিক বন্ধ করেন নাই এবং আত্মীয় কুটুম্বের সদনে ঐ সময়ে উপঢৌকন প্রেরণ করিতেও বিরত হন নাই। বিজয়া দশমীর দিন প্রণামাশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গনাদির যে সুন্দর সামাজিক প্রথা আমাদের দেশে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাও তিনি কুসংস্কার-মূলক বলিয়া বর্জ্জন করেন নাই। তিনি ১৮৭২ সালের ৩ আইন

অনুসারে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু তদুপলক্ষে চিরন্তন প্রথানুসারে গ্রামবাসীদিগের মধ্যে তৈল তৈজসাদি "সামাজিক" বিতরণ করিয়াছিলেন। গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহাকে এই বিবাহের জন্য তাহাদের সমাজচ্যুত করিয়াছিল এবং বিধিমতে তাঁহার শত্রুতা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে বিদ্বেষের উদ্রেক করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে তিনি স্ব-রচিত জীবনীতে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আমার ধর্ম্মবিশ্বাস নিবন্ধন এবং বিশেষতঃ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে আমার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলাম বলিয়া, কোন্নগরের গোঁড়া হিন্দুরা আমাকে তাহাদের সমাজ বহির্ভূত করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, তাহারা সুযোগ পাইলেই আমাকে অপমান ও উৎপীড়ন করিতে সঙ্কুচিত হয় না। কিন্তু আমি এরূপ ব্যবহারের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি; কারণ, আমি ইহা পূর্ব্বেই জানিতাম এবং ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। পরমেশ্বর তাহাদিগকে এরূপ জ্ঞান দিউন যাহাতে তাহারা নিজের ভ্রম দেখিতে পায় ও আচরণ সংশোধন করে।"

শিবচন্দ্রের অমায়িক স্বভাবগুণে, আবালবৃদ্ধবনিতা, সকল শ্রেণীর লোক, তাঁহাকে নিজ নিজ দুঃখ বা অভাব জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিত না; তিনিও সাধ্যানুসারে তাহা মোচন করিবার চেষ্টা করিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিবাদের পরিবর্ত্তে শান্তি এবং মনোমালিন্যের পরিবর্ত্তে প্রীতি সংস্থাপন, তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি মধ্যস্থ হইয়া যে সকল বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিতে, বিবাদকারীরা রাজদ্বারে না গিয়া নিজেই তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়াছিল; এবং কতকগুলিতে তিনি রীতিমত আদালত কর্ত্তৃক সালিস নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত প্রকার মধ্যস্থতার প্রধান দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাবু অমরলাল মিত্র, কলিকাতা হাইকোর্টে, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁহার পুত্রগণের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন, তাহাতে শিবচন্দ্র উক্ত আদালত কর্ত্তৃক, বাদীর প্রাপ্য নিরূপণার্থ সালিস নিযুক্ত হইয়াছিলেন, বাদী ও প্রতিবাদী, উভয় পক্ষই তাঁহার নিকট আত্মীয়। এই অংশীদারী মোকদ্দমায় শিবচন্দ্রকে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিস্তর হিসাবপত্র দেখিতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। শিবচন্দ্র যে কোনও বিষয়ে মধ্যস্থ হইতেন, প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। প্রতিবেশীগণের বিপদাপদে শিবচন্দ্র আন্তরিক ব্যথা বোধ করিতেন এবং প্রাত্যহিক ভ্রমণকালে পীড়িত প্রতিবেশীগণের সংবাদ লইতেন।

শিবচন্দ্রের কলেজে অধ্যয়নকালীন বন্ধুগণের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তন্মধ্যে ৺হরিমোহন সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তিনি মধ্যে মধ্যে কোন্নগরের বাটীতে বন্ধুর সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহার অনুজ (মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের পিতা) ৺প্যারীমোহন সেন মহাশয়ও প্রায় তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিতেন। প্যারীমোহনবাবু দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতিও তদনুরূপ ছিল। কলেজের সহাধ্যায়ী আর দুইটি বন্ধু ৺প্যারীচাঁদ মিত্র ও ৺রামতনু লাহিড়ীর সহিত শিবচন্দ্রের বৃদ্ধ বয়সেও খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। মিত্র মহাশয়ের সহিত শিবচন্দ্রের হিন্দুকলেজের যে সৌহার্দ্দের সূত্রপাত হয় তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত এবং একটি বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইয়া পরস্পরের জীবনব্যাপী হইয়াছিল। উভয়ের ধর্ম্মমত এক ছিল এবং উভয়েরই স্পিরিচুয়্যালিজমে অটল বিশ্বাস ছিল; উভয়েই তুল্যরূপ বিদ্যানুরাগী এবং উভয়েই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শিবচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেই প্যারীবাবুর সহিত দেখা না করিয়া গৃহে ফিরিতেন না। প্যারীবাবুও প্রতি বৎসর অন্ততঃ ২।৩ বার কোন্নগরে গিয়া অনেকক্ষণ বন্ধুর সঙ্গ ভোগ করিতেন। প্যারীবাবু ১৮১৪ সালের ১২ই জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৩ সালের ২৩শে নবেম্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়; শিবচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ৩ বৎসর বড় ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ৭ বৎসর জীবিত ছিলেন।

সত্য ও সারল্যের মূর্ত্ত অবতার, ৺রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহিতও শিবচন্দ্রের আজীবন বন্ধুত্ব ছিল। আমরা লাহিড়ী মহাশয়কে বহুবার কোন্নগরে বন্ধু সহবাসে সমস্ত দিন কাটাইতে দেখিয়াছি। শিবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি ছিল। একবার তিনি আমাদের সমক্ষে শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠা দুহিতাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবাকে কলেজে আমরা সকলে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতাম, তিনি বয়সে বড় ছিলেন বলিয়া নহে—জ্ঞানে সকলের বড় ছিলেন বলিয়া।" ১৮১২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরে রামতনুবাবুর জন্ম হয় এবং ১৮৯৮ সালের ১৪ই আগষ্টে তাঁহার মৃত্যু হয়; তিনি শিবচন্দ্রের অপেক্ষা বয়সে এক বৎসর ছোট ছিলেন এবং বন্ধুর মৃত্যুর পর প্রায় আট বৎসর জীবিত ছিলেন।

রাজা দিগম্বর মিত্রও শিবচন্দ্রের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। শিবচন্দ্র যে বৎসরের শেষে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন তিনি সেই বৎসর তথায় প্রবিষ্ট হন, সুতরাং তিনি শিবচন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন না, কিন্তু শিবচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার জন্মস্থান কোন্নগরে বিশেষ টান ছিল। তিনি ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৯ সালের ২০শে এপ্রিলে তাঁহার দেহাত্যয় হয়; শিবচন্দ্রের অপেক্ষা তিনি বয়সে ছয় বৎসর ছোট ছিলেন এবং শিবচন্দ্রের মৃত্যুর দশ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। রাজা দিগম্বর মিত্র যতদিন জীবিত ছিলেন, শিবচন্দ্র কলিকাতায় আসিলে প্রায় তাঁহার বাটীতে আহারাদি করিতেন; আমরা রাজাকেও অনেকবার কোন্নগরস্থ বিদ্যালয়

সমূহের পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে শিবচন্দ্রের বাটীতে আহার করিতে দেখিয়াছি। দুই বন্ধুর জীবন-পথ সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন ছিল বটে, কিন্তু দুইজনেই তুল্যরূপ ক্রিয়া-সিদ্ধ (practical) ও কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন, দুই জনেই কুসংস্কার-বিহীন ও দেশহিতৈষী ছিলেন এবং উভয়েই অধ্যাত্মবাদী (spiritualist) ছিলেন।

শিবচন্দ্র যে সময় রাজসেবায় নিযুক্ত ছিলেন সে সময় তাঁহার সমসাময়িক বহু সংখ্যক রাজকর্ম্মচারীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল— সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেব ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটি কালেক্টার), এবং কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী ৺লোকনাথ বসু (সাবর্ডিনেট জজ) ও ৺অভয়াচরণ মল্লিক (ডেপুটি কালেক্টর) এবং মহারাজা সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইঁহাদের অন্যতম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শিবচন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে কোন্নগরে আসিয়া শিবচন্দ্রকে আপ্যায়িত করিতেন। মহর্ষি নদীবক্ষে বোটে চড়িয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসিতেন; কখন কখন বোট কোন্নগরের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তাঁহার বন্ধুসন্দর্শন স্পৃহা সহসা এরূপ বলবতী হইত যে তিনি তৎক্ষণাৎ বোট তীরে লাগাইবার আদেশ দিয়া কোনও অনুচর দ্বারা স্বীয় আগমন বার্ত্তা বন্ধু সমীপে প্রেরণ করিতেন। শিবচন্দ্রও শশব্যস্ত হইয়া গ্রাম মধ্যে মহর্ষির আগমন সংবাদ প্রচার করিতেন এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যেই একটি উপাসনাসভার আয়োজন করিতেন। মহর্ষির যখন শিবচন্দ্রের বাটীতে শুভাগমন হইত তখন সকলের আনন্দের সীমা থাকিত না। সে আজ অনেক দিনের কথা; একবার অপরাহ্ণকালে মহর্ষির এইরূপ অকস্মাৎ আগমনে শিবচন্দ্রের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি সভা হইয়াছিল। আমরা ভাগ্যক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলাম। মহর্ষি যখন বেদী হইতে "মগন হওরে অমৃত সাগরে" এই কয়টি কথা তাঁহার বীণা-নিন্দিত স্বরে উচ্চারণ করিলেন, তখন আমাদের ধমনীতে ধমনীতে তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়াছিল; এখনও সেই স্বর যেন আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে! মহর্ষির বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হইলেও, তাহা অমৃতময় উপদেশপূর্ণ ও নিরতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি সেই অল্প সময়ের মধ্যেই হাফেজের কত উৎকৃষ্ট কবিতা ও উপনিষদের কত প্রাণস্পর্শী শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন! আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে মহর্ষির সহিত শিবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ সম্বন্ধে আরো দুই একটি কথা বলিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় শিবচন্দ্রের একজন পুরাতন বন্ধু। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি যখন এদেশে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহার একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন এবং প্রথম

বিধবা-বিবাহে যোগদান করিয়া কিয়ৎকাল স্বগ্রামে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একজন অনাড়ম্বর, লোকহিতৈষী, দেশহিতৈষী ও শিক্ষা বিস্তারব্রতী মহাপুরুষ যে শিবচন্দ্রের গুণগ্রাহী হইবেন ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? বিদ্যাসাগর মহাশয় শিবচন্দ্রকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহার পরিচয় একটি সামান্য ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। শিবচন্দ্র কলিকাতায় অবস্থানকালে, বিশেষতঃ যখন "মেট্রোপলিটান" বিদ্যালয়ের সম্মুখবর্ত্তী একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তখন দুই বন্ধুর হাস্যপরিহাসোজ্জ্বল আলাপে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত। উক্ত বাটীতে অবস্থানকালে, একদিন দেব-পরিবার সহসা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, মিষ্টান্নের এক হাণ্ডীস্কন্ধে, ও "—দাদার জন্য সন্দেশ এনেচি" বলিতে বলিতে, আবির্ভাব-দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। [প্রকৃতপক্ষে, তিনি পাল্কী করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারবান হাঁড়ি বহন করিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়াছিল; কিন্তু তিনি এরূপভাবে দর্শন দিলেন, ও হাঁড়িটি উপস্থিত করিলেন, যেন তিনি হাঁড়ি-কাঁধেই সমস্ত পথ আসিয়াছেন!]

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺প্যারীচরণ সরকার, ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র, ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রাজেন্দ্র দত্ত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার এস. জি. চক্রবর্তী, ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে, ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী, ৺রমানাথ গোস্বামী প্রভৃতি বহুসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত শিবচন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন; তাঁহাদের নামের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব।

শিবচন্দ্র প্রাচীন বয়সেও যুবকের ন্যায় স্ফূর্ত্তিমান্, উৎসাহী, উদ্যমশীল ও উন্নতিশীল ছিলেন; এজন্য তিনি তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম-বন্ধুরা প্রায় সকলেই তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ছিলেন; আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের নামোল্লেখ করিব। এখানে আমরা কেবল তাঁহার দুইটি প্রতিবেশী যুবক বন্ধু ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺শিবচন্দ্র কুলভীর নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। পাঁচকড়ি বাবু প্রথমে হাবড়া ও উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং সেই সময়েই ক্রমান্বয়ে বি. এ. ও বি.এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে হুগলির জেলা আদালতে ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ ও ধর্ম্মভীরু শিক্ষক প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি তাদৃশ সুবিধা করিতে পারেন নাই। শিবচন্দ্রের মৃত্যুর দেড় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অকাল মৃত্যু হয়। তিনি শিবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; শিবচন্দ্র তাঁহার সারল্যে ও

সচ্চরিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। কুলভী মহাশয়ও ঠিক সেই কারণে শিবচন্দ্রের অত্যধিক প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত কলেজের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায়, কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কোন্নগরে চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করেন; তৎপরে মানকরের জমিদার ৺হিতলাল মিশ্র মহাশয়ের দাতব্য ঔষধালয়ের ও পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন এবং পরিশেষে উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হাবড়ার মুন্‌সেফী আদালতের নাজিরি পদ গ্রহণ করেন। বহু বৎসর নাজিরি করিয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌সন লইয়া হাবড়ার নিকট শালিখায় আসিয়া বাস করেন। কুলভী মহাশয় যেমন একজন সরলভক্ত ছিলেন তেমনি আবার অতি সুকণ্ঠ ছিলেন এইজন্য শিবচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিরসাপ্লুত, মধুর কণ্ঠোত্থিত ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। কুলভী মহাশয় শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পর পঁচিশ বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। তিনি আমাদিগের নিকট যখনই শিবচন্দ্রের কথা উত্থাপন করিতেন, তখনই তাঁহার নয়ন পল্লব অশ্রুসিক্ত হইত। মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দৃষ্টিহীন হইয়াছিলেন।

আমরা শিবচন্দ্রের চরিত্র পূর্ব্বেই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আরো দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। শিবচন্দ্রের অকৃত্রিম বিনয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়; তিনি তাহার কোনও স্থলে ঘুণাক্ষরেও আত্ম-প্রশংসা করেন নাই। উক্ত জীবনী তিনি তাঁহার এক মাত্র পুত্রের জন্য সঙ্কলন করিয়া তাঁহাকে ইংরাজি ভাষায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত করিলাম :—

"প্রিয় পুত্র! আমি আমার জীবনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই আশায় লিখিয়াছি যে, ইহা পাঠ করিলে তোমার উপকার দর্শিতে পারে।

তুমি উপলব্ধি করিবে যে, আমার কোনও রূপ অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি না থাকিলেও, আমি সংসারে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছি। ভগবানের কৃপায়, আমার নিয়মিত ও শ্রমশীল অভ্যাস সমূহ, আমার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, আমার ন্যায়পরতা ও সদভিপ্রায়ই আমার কৃতকার্য্যতার হেতু। আমি যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছি, তাহা সর্ব্বদা অব্যভিচারে পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সর্ব্বশক্তিমান্ ও দয়াময় পরমেশ্বর যেন তোমার জীবনে সার্থকতা বিধান করেন, তিনি যেন তোমাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করেন এবং তোমাকে সমাজের কার্য্যোপযোগী করেন, ইহাই তোমার স্নেহময় পিতা শিবচন্দ্রদেবের ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

কর্ম্মযোগী মহাপুরুষের জীবন-সন্ধ্যায় স্বীয় গত জীবনের এরূপ অমায়িক সমালোচনা এবং পুত্রের জন্য এরূপ স্বার্থশূন্য প্রার্থনার উপর আমরা আর কি টীকা টিপ্পনী করিব?

"অক্রোধেণ জয়েৎ ক্রোধম্"—এই মহাবাক্য শিবচন্দ্রের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। জীবনে তাঁহাকে কেহ কখনও ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। বাটীতে কোনও রূপ গণ্ডগোল বা বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে তিনি কেবলমাত্র ধীরে ধীরে এসব "অশান্তি, অশান্তি" এই বলিয়া নিরস্ত হইতেন। আমরা দুর্জ্জয় ক্রোধাবেশে কোনও কোনও লোককে নির্ব্বিরোধ শিবচন্দ্রকেও সময় বিশেষে অপমান করিতে ও তাঁহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু কখনও দেখি নাই যে তিনি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছেন বা সেই কটূক্তি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা জনৈক প্রতীচ্য তত্ত্বদর্শীর একটি সমীচীন উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"জগতের সুন্দর আত্মদিগের কি এক সাধুতা-রূপ স্পর্শমণি আছে, যদ্দ্বারা তাঁহারা তিক্ততাকে করুণায়, অপ্রীতিকর মানবীয় অভিজ্ঞতাকে কোমলতায়, অকৃতজ্ঞতাকে উপকার পরম্পরায়, এবং অপমান সমূহকে ক্ষমায় পরিণত করেন। এই পরিণতি এক সহজ ও অভ্যস্ত হওয়া উচিত যে দর্শকেরা যেন মনে করেন যে ইহা আপনা হইতে হইতেছে এবং ইহাতে কাহারও কোন গুণপনা নাই।"

শিবচন্দ্রের প্রতি কেহ কোনও রূপ অপ্রিয় ব্যবহার করিলে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যাইতেন; কিন্তু কেহ তাঁহার সামান্য উপকার করিলেও তিনি তজ্জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিতেন।

কৈশোরে যে ভগ্নীর আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি আজীবন মাসিক বৃত্তি দিতেন এবং প্রতি বৎসর পূজার সময় তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য বস্ত্র প্রেরণ করিতেন। প্রত্যেক ক্রিয়া কাণ্ডে শিবচন্দ্রের উক্ত ভগ্নী নিমন্ত্রিত হইয়া সপরিবারে কোন্নগরে আসিয়া কতদিন বাস করিতেন! গৃহে ফিরিবার সময় ভগ্নীকে শিবচন্দ্র নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন।

প্রতি বৎসর বিজয়ার পর শিবচন্দ্র এই ভগ্নীকে বিজয়ার প্রণাম করিতে কলিকাতায় আসিতেন। একবার তিনি বোটে করিয়া সপরিবারে ভগ্নীকে প্রণাম করিতে আসিয়া ছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ পাইয়া, ভগ্নী আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যথাসময়ে শিবচন্দ্র আহারে বসিলেন। সেই একদিন, যখন কিশোর শিবচন্দ্র এইরূপে ভগ্নীর নিকট খাইতে বসিতেন! আজ কত বৎসর পরে শিবচন্দ্র পুনর্ব্বার

ভগ্নীর গৃহে আহারে বসিয়াছেন! ইতিমধ্যে তাঁহার ভাগ্যের কতই না পরিবর্ত্তন হইয়াছে! কিন্তু শিবচন্দ্রের মহৎ স্বভাবের ত কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাই তিনি আজ ভগিনী-প্রদত্ত মোটা চাউলের অন্ন বালকের ন্যায় মহানন্দে আহার করিলেন। আহারান্তে তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে ভগিনীকে বলিলেন "সময়ে দুটি ভাত পাইয়া বড় তৃপ্তি হইল।" নিজ গৃহে যিনি দাদখানি চাউলের অতি সুসিদ্ধ অন্ন ভিন্ন অন্য অন্ন খাইতে পারিতেন না, তিনি আজ এই কঠিন, দুষ্পাচ্য, মোটা চাউলের অন্ন ভোজনে তৃপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া সকলের আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি নিজে কাহারও উপকার করিয়া কখনও প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করিতেন না, এবং পুত্রকন্যাদিগকেও বলিতেন "নিজে সাধ্যমত সকলের উপকার করিও, কিন্তু কাহারও নিকট কৃতোপকারের প্রত্যুপকার পাইবার আশা করিও না; যাহার যাহা করিবে, নিঃস্বার্থভাবে করিও।"

তিনি যাহাকে যাহা মাসে মাসে দান করিতেন, মাসের প্রথমেই তাহাকে তাহা দিতেন। যদি সে ব্যক্তি তখন আসিয়া উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে তিনি পত্র লিখিয়া অথবা লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা দিতেন। যদি কেহ অসময়ে তাহার মাসিক বৃত্তি লইতে আসিত এবং বাটীর কেহ বলিতেন, আজ সে ফিরিয়া যাউক, তাহা হইলে শিবচন্দ্র বলিতেন "দেখ, আমাদের সামান্য অসুবিধা হইবে বলিয়া ও লোকটা ফিরিয়া যাইবে? কিন্তু ও ব্যক্তি দরিদ্র, উহার কত ক্ষতি হইবে মনে কর দেখি? ওকে কষ্ট করিয়া আসিতে হইয়াছে, হয়ত পয়সা খরচ করিয়া দূরের পথ হইতে আসিয়াছে, আজ টাকা না পাইলে উহাকে পুনরায় পয়সা খরচ করিয়া আসিতে হইবে। তা ছাড়া, যাহাকে যাহা দিব, একেবারেই দিব, বারবার কষ্ট দিয়া দেওয়া কি উচিত?" শিবচন্দ্র ভৃত্যগণের বেতনও মাসকাবার হইলেই দিতেন, তাহাদের কাহাকেও উহা চাহিতে হইত না। তিনি নিজে রান্নাঘরে গিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে, গোয়ালঘরে গিয়া গরুর চাকরকে, আস্তাবলে গিয়া অশ্বপালকে, সদরদ্বারে গিয়া দ্বারবান্‌কে, দপ্তরখানায় গিয়া সরকারকে, বাগানে গিয়া মালীকে, ইত্যাদি সকলকে স্বহস্তে বেতন দিয়া আসিতেন। তাঁহার পত্নী যদি কখন বলিতেন, "উহাদের ডাকিলেই ত আসে, নিজে কষ্ট করিয়া যাওয়া কেন?" শিবচন্দ্র তদুত্তরে বলিতেন "উহাদের কাজের ক্ষতি করিয়া আসিতে হইবে, আমার কিন্তু ইহাতে কোনও ক্ষতি নাই, বরং খানিকটা বেড়ান হয়!"

বাটীতে কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম হইয়া গেলে, তাহার পর দিনই শিবচন্দ্র মুদী, ময়রা, মিঠাইওয়ালা প্রভৃতিকে ফর্দ্দ লইয়া আসিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইতেন। তাহারা বলিত "বাবুর কি ইহার জন্য রাত্রে ঘুম হয় নাই? ইহার জন্য আমাদের এখনও ফর্দ্দ প্রস্তুত হয় নাই, হিসাব করা হয় নাই, এখন কিরূপে যাইব? দুই দিন পরে যাইব;

আমাদের টাকা ত লোহার সিন্দুকে তোলা আছে, টাকার ভাবনা আমাদের নাই।" এই বলিয়া তাহারা শিবচন্দ্রের লোককে ফিরাইয়া দিত। কিন্তু তিনি স্থির হইতে পারিতেন না, পুনর্ব্বার অপরাহ্নে লোক পাঠাইতেন! এইরূপে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা চুকাইয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। এজন্য কেহ কিছু বলিলে, তিনি বলিতেন "যাহা করিতে হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ করা উচিত। আজ নয় কাল করিয়া কিছু ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। বিশেষতঃ পাওনাদারের পাওনা কখনও ফেলিয়া রাখিতে নাই।"

শিবচন্দ্র সঞ্চিত টাকায় কোম্পানির কাগজ কিনিতেন, কিন্তু কখনও সুদ লইয়া কাহাকেও টাকা ধার দিতেন না; তিনি নিজেও কখন ঋণ করেন নাই। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, টাকা কড়ি ধার দেওয়া বা লওয়া বড়ই বিপজ্জনক। ঋণ গ্রহণ কালে মহাজন বড় আপন হয়, কিন্তু ঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হইলেই বিবাদ না হইয়া যায় না। তিনি যে কাহাকেও ঋণ দেন না ইহা সকলেই জানিত, এজন্য কেহ কখনও তাঁহার নিকট ঋণ চাহিত না; যদি কেহ না জানিয়া চাহিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে কিছু টাকা দান করিয়া বলিতেন "আমি কাহাকেও ঋণ দান করি না। আমার যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ দিলাম।"

শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা কোনও সময়ে, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ, টাকা ধার করিতে বাধ্য হন। মহাজনের নিকট টাকা ধার করিলে জামাতাকে উচ্চ হারে সুদ দিতে হইবে, বলিয়া শিবচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী নিজ নিজ নামের কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া জামাতাকে প্রায় ছয় হাজার টাকা ঋণ দেন এবং তজ্জন্য উভয়েই বিক্রিত কাগজের সুদের হারের (অর্থাৎ শতকরা ৫ টাকার) সুদ জামাতার নিকট গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। এই ঋণ গ্রহণের ন্যূনাধিক সাত বৎসর পরে উক্ত জামাতার মৃত্যু হয়; তৎপূর্ব্বে তিনি সুদে আসলে উক্ত ঋণের প্রায় দুই হাজার টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন মাত্র। জামাতার মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পরে তাঁহার একটি ভূমিসম্পত্তি বিক্রীত হইলে পর, তাহার মূল্য হইতে ঋণের বাকি আসল টাকার শোধ হইয়াছিল; কিন্তু অন্যূন দশ বৎসরের সুদের মোট টাকা দুই হাজারের অধিক দাঁড়াইয়া ছিল, শিবচন্দ্র ও তাঁহার গৃহিণী তাহার একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। এস্থলে আর একটি ঘটনার উল্লেখ, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দেব-গৃহিণীর জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া কোন্নগরে পিতৃষ্বসার সহিত একদিন দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে আমরা সে সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। ভ্রাতুষ্পুত্র একথা সেকথার পর পিতৃষ্বসার নিকট সাত শত টাকা ঋণ চাহিলেন। কিন্তু দেবগৃহিণী ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রার্থনা পূরণ করিতে কোনওক্রমে সম্মত হইলেন না। সম্প্রতি তাঁহার

জামাতার মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহাকে যে ঋণ দিয়াছিলেন তাহারই শোধ হওয়ার আশা সুদূর-পরাহত, আবার ঋণ দিবেন কি? তা ছাড়া, তাঁহার নিজের হাতে তখন অধিক টাকা ছিল না। ইত্যবসরে, হঠাৎ এক কাণ্ড হইল। ভ্রাতুষ্পুত্র পিসিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিশায়ী হইলেন। ইংলণ্ড প্রবাসে অর্থাভাবে তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং সেই সময়েই তাঁহার এই মূর্চ্ছা রোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। করুণাময়ী পিসীমা এই ব্যাপার দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাইপো সংজ্ঞা লাভ করিবামাত্র তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং নিজের পুঁজিপাটা যেখানে যাহা ছিল কুড়াইয়া বাড়াইয়া ভাইপোর হাতে সাত শত টাকা গণিয়া দিলেন।

শিবচন্দ্র যেমন কাহারও প্রাপ্য টাকা দিতে কালবিলম্ব করিতেন না, তেমনি কাহারও পত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতেন। প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় যেরূপ পত্রই হউক না কেন, শিবচন্দ্র তাহার উত্তর দেওয়া একটা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিতেন। পত্র লেখক কোনও বড়লোক হউন বা কোনও দীন দুঃখী দরিদ্র লোক হউক, কাহারও সম্বন্ধে শিবচন্দ্রের এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সকল বিষয়েই প্রতীয়মান হইত।

শিবচন্দ্রের দয়া সর্ব্বজীবে সমভাবে ছিল। তিনি বাটীর ভৃত্যবর্গের সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা, রোগ শোক, সকল বিষয়ের যেমন অনুসন্ধান করিতেন, তেমনি আবার গোয়ালঘরে গিয়া গরুবাছুরের যত্ন হইতেছে কিনা তাহাও দেখিয়া আসিতেন। বাটীতে কোনও জীবজন্তু পোষা হইলে, তাহাকে আহার দেওয়া হইয়াছে কি না সন্ধান লইতেন। যদি বাটীতে কখনও কোন কুকুর বিড়াল চীৎকার করিত, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; কিসের জন্য সে চিৎকার করিতেছে নিজে গিয়া তাহা দেখিতেন। যিনি অপরাধীরও কারাদণ্ড বিধান করিতে ব্যথা বোধ করিতেন বলিয়া ড্যাম্পিয়ার সাহেবের নিকট ফৌজদারি বিচার কার্য্য হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই কোমল হৃদয় শিবচন্দ্র যে নিরপরাধ বন-বিহঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে মোটে ভাল বাসিতেন না এবং এজন্য তাঁহার বাটীতে কখনও কোন পাখি পোষা হইত না, ইহা আর বিচিত্র কি? একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সৈনিকপুরুষ—যিনি এক সময়ে আফ্রিদিদিগের সহিত পর্ব্বতের উপর যুদ্ধ করিয়া মেড্যাল পাইয়াছিলেন—আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মতে খাঁচায় বুদ্ধ করিয়া পাখি পোষা নিতান্ত নিষ্ঠুরের কর্ম্ম এবং এজন্য তিনি কখনও পাখি পোষেন নাই। কোনও ভিখারী কোন্ দিন ভিক্ষা পাইল বা না পাইল তাহাও শিবচন্দ্রের চক্ষু এড়াইত না। বাটীর দাস দাসী বা আর কেহ কোনও ভিখারীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিল কি

কটু বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিতেন এবং সেই লোককে সে জন্য অনুযোগ করিতেন।

ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও সন্তোষ শিবচন্দ্রের জীবনের নিত্য সহচর ছিল। তিনি অসন্তুষ্ট লোকদিগকে ইংরাজি ভাষায় সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন—"Have Patience" অর্থাৎ "ধৈর্য্যাবলম্বন কর।" তাঁহার এই উপদেশ কেবল মুখের কথা ছিল না—তিনি নিজে এই উপদেশের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল ছিলেন। শোকের সময় তিনি যে অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি; রোগের সময়েও ঠিক তাহাই। ১৮৬৫ সালে তাঁহার দক্ষিণ জানুতে একটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক (Carbuncle) উৎপন্ন হইয়াছিল; ১৮৭০ সালে তাঁহার বাম বাহুর উপরকার হাড় (radius) দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; ১৮৭৫ সালে তাঁহার মেরুদণ্ডের সন্নিকটে একটি পৃষ্ঠব্রণ হইয়াছিল; প্রতিবারই তিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। প্রতিবারই তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত দুকড়ি ঘোষের চিকিৎসায় সুস্থ হন। লোকে বৃদ্ধ হইলে বা অধিক দিন রোগে ভুগিলে একটুতেই বিরক্ত বা খিট্‌খিটিয়া হয়, কিন্তু পৌরাণিক ক্ষীরোদধির দুগ্ধের ন্যায় শিবচন্দ্রের শান্ত প্রকৃতি মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল।

শিবচন্দ্রের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আমরা একটিমাত্র উদাহরণ দিব। একবার তাঁহার বাটীর সংলগ্ন পুষ্করিণীতে সাঁতার দিতে দিতে তাঁহার এক তরুণবয়স্ক দৌহিত্রের হঠাৎ হস্ত পদ অবশ হওয়ায় তাঁহার জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শিবচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে তাঁহার একজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য মজ্জনোন্মুখ যুবাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি তাহাকে নিরস্ত করিয়া একটা লম্বা বাঁশ আনিতে বলিলেন; উহার এক মুখ ভৃত্য ধরিয়া রহিল, অপর মুখ অবলম্বন করিয়া দৌহিত্র অনায়াসে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া তীরে উঠিলেন। শিবচন্দ্র এই কৌশল উদ্ভাবন না করিলে, তাঁহার দৌহিত্র ও ভৃত্য পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া, উভয়েই জলমগ্ন হইত।

শিবচন্দ্র সর্ব্বদাই সহাস্যবদন থাকিতেন, কিন্তু তাঁহাকে কখনও উচ্চহাস্য করিতে দেখি নাই। বস্তুতঃ তাঁহার জৃম্ভণাদি সকল শারীরিক ক্রিয়া সুসংযত ও শিষ্টাচার সঙ্গত ছিল।

তিনি নিজে যেমন লাজুক ছিলেন, তেমনি স্ত্রীলোকের সমুচিত লজ্জাশীলতার যাহাতে হানি হয় তাহাও তাঁহার অনভিমত ছিল। তিনি স্ত্রীলোকের গামছা পরার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন "গামছা পরায় এবং উলঙ্গ থাকায় বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই।" এজন্য তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা কেহ গামছা পরিতেন না।

একবার তাঁহার বৃদ্ধা সহোদরা গামছা পরিয়া গোয়ালার নিকট হইতে দুধ লইতেছিলেন, এমন সময় তিনি কি প্রয়োজনে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নী ভয়ে ও লজ্জায় তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোয়ালা চলিয়া গেলে, শিবচন্দ্র হাসিতে হাসিতে ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মেজদিদি! তুমি আমাকে দেখিয়া লজ্জা বোধ করিলে, আমি তোমার সহোদর ভাই, আর ও একজন গোপ, উহার সম্মুখে গামছা পরিয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করিলে না?" ভগ্নী একথায় যেন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। সেই হইতে তিনি গামছা পরিয়া কাহারও সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। শিশুগণ একটু বড় হইলে তাহাদিগকে নগ্ন রাখাও শিবচন্দ্র পছন্দ করিতেন না।

শিবচন্দ্র গম্ভীর-প্রকৃতি ছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই প্রফুল্ল চিত্তে ও প্রসন্ন বদনে থাকিতেন এবং তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তাও বড় কম ছিল না। আমরা তাহার কতিপয় উদাহরণ দিব। একবার তাঁহার একটি শিশুদৌহিত্রীর জ্বর হইয়াছিল। জ্বরের উপশম হইলে, সে পথ্যের জন্য লালায়িতা হইয়া মাতামহকে হাত দেখাইতে গিয়াছিল। তিনি নাড়ীতে জ্বর নাই দেখিয়া এবং ভাবগতিকে নাতিনীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন তোমার নাড়ী দেখিতেছি খাই খাই করিতেছে।

আর একবার তাঁহার বাটীতে কোনও ক্রিয়া উপলক্ষে কতকগুলি কুটুম্বের সমাগম হইয়াছিল; তন্মধ্যে তাঁহার দুইটি প্রাচীন বৈবাহিক আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের গোঁফের চুল তাদৃশ পাকে নাই বলিয়া মেয়েরা কেহ কেহ তাঁহাদের বয়স্ তত বেশি নয় অনুমান করিতেছিলেন; শিবচন্দ্র তাহা শুনিয়া পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন "ওপ্‌ড়া গোঁফ!" অর্থাৎ গোঁফের পাকা চুল উৎপাটিত হইয়াছে। এই কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

আর একবার তাঁহার একটি দৌহিত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। কন্যা পক্ষ হইতে কন্যার একখানি ফটো আনাইয়া শিবচন্দ্রকে দেখিতে দেওয়া হয়। তিনি ফটোখানি দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ, মেয়ে মন্দ নয়, 'নাতি খাতি' হবে ভাল," অর্থাৎ, মেয়েটি কিঞ্চিৎ কৃশ, স্নান আহার করিতে করিতে উহার শ্রী ফিরিতে পারে। তাঁহার এই কৌতুকজনক উত্তর শুনিয়া একটা হাসি পড়িয়া গেল।

বালী নিবাসী ৺জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় কলিকাতা চীনাবাজারে দালালি করিতেন। তিনি শিবচন্দ্রের বিবিধ প্রয়োজনের সরবরাহকার ছিলেন এবং তজ্জন্য প্রায়ই কোন্নগরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। শিবচন্দ্র তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং বহুদিনের পরিচয়ে তাঁহাকে একজন সুরসিক জানিয়া তাঁহার সহিত প্রায়ই পরিহাস বিনিময় করিতেন। একবার তিনি অনেক দিন পরে কোন্নগরে আসিলে

পর, শিবচন্দ্র, নন্দরাণী যশোদার স্বর অনুকরণ করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "হ্যাঁরে গোপাল! তোকে যে অনেক দিন দেখি নি, গোপাল! আমাকে কি এমনি ক'রে ভুলে থাক্‌তে হয় রে গোপাল?" ইত্যাদি।

তৎকালপ্রচলিত অনেক নকল-সংস্কৃত শ্লোক শিবচন্দ্রের কণ্ঠস্থ ছিল; নমুনা স্বরূপ, জনৈক পণ্ডিত ও তাঁহার ভৃত্যের পরস্পর কথোপকথন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"প। সোমা! ঘৃতং নে যা।

ভৃ। কিং করিত্বা?

প। নব নব ভাণ্ডং।

ভৃ। শুকিষ্যতি।

প। তব পিতুঃ স্বাহা।"

Coleman's *Broad Grins* প্রভৃতি ইংরাজি হাস্যরসের কবিতাও তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

শিবচন্দ্র সমস্ত দিন নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, মধ্যে মধ্যে পাঁচ সাত মিনিটের জন্য বাটীর ভিতরে বা বাটীর সংলগ্ন উদ্যানে ঘুরিয়া আসিয়া অধিকক্ষণ একস্থানে বসিয়া থাকিলে শরীরের যে জড়তা আসিয়া পড়ে তাহা দূর করিতেন এবং তৎসঙ্গে বাটীর আবশ্যক তত্ত্বাবধান কার্য্যও সম্পন্ন করিতেন। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায়, শিবচন্দ্র দিবাভাগে প্রায় চেয়ারে ঋজুভাবে উপবিষ্ট হইয়া কাটাইতেন। তাঁহার বৈঠকখানার একার্দ্ধে অনুচ্চ ও বিস্তীর্ণ তক্তপোষের উপর কতিপয় তাকিয়া শোভিত সতরঞ্চি ও গড়া পাতা থাকিত এবং ঐ ফরাশ বিছানার এক প্রান্তে গৃহস্বামীর জন্য একখানি ছোট পাত্‌লা তোষক ও গুটি দুই তাকিয়া সংরক্ষিত হইত। বৈঠকখানায় অপরার্দ্ধের মধ্যস্থলে একটি বড় টেবিলের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি চেয়ার সাজান থাকিত; তন্মধ্যে একখানি গৃহস্বামীর ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একখানি চৌকিতে তাঁহার হাত-বাক্সটি রাখা হইত। শিবচন্দ্র চেয়ারে বসিয়া লিখন, পঠন, ও অভ্যাগত ভদ্র লোকদিগের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি দিনের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দিবাভাগে, তিনি পূর্ব্বোক্ত তোষকের উপর তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কেবল অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মাত্র বিশ্রাম করিতেন; অবশিষ্ট সমস্ত সময় চেয়ারে বসিয়া কাটাইতেন। সন্ধ্যার পর যতক্ষণ বৈঠকখানায় থাকিতেন, বিছানায় বসিয়া পুস্তকাদি পাঠ বা আত্মীয় বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেন। বিছানার একপার্শ্বে তখন একটি সেজ জ্বলিত। চেয়ারে অনুক্ষণ উপবিষ্ট থাকিতেন বলিয়া, তিনি কখনও আলস্যপরতন্ত্র হন নাই। তিনি অনেক কাজ ভৃত্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বহস্তে করিতেন বলিয়া খুব ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন; কাঁচি

দিয়া কাগজ কাটিয়া পরিপাটীরূপে ছোট বড় চিঠির খাম প্রস্তুত করিতেন; অল্প স্বল্প সূত্রধরের কাজও করিতে পারিতেন। ইমারতের কাজেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি নিজগৃহের ও বিদ্যালয়গৃহের প্রয়োজনীয় জীর্ণ সংস্কার নিয়মিতরূপে করাইতেন এবং ঐ কার্য্যে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ও তৎসম্মুখস্থ চাঁদনী-বিশিষ্ট ঘাট নির্ম্মাণে মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর কৃতী শিষ্য ও পেন্‌সন-প্রাপ্ত এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয় শিবচন্দ্রকে বিশিষ্টরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন; এজন্য শিবচন্দ্র তাঁহার নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ ছিলেন। এ সম্বন্ধে পোর্টকমিশনারদিগের সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার বাবু ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শিবচন্দ্রের অভিজ্ঞতার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; তাঁহার নাড়ী-জ্ঞানও বেশ ছিল।

আকাশে মেঘের আকার ও গতি দেখিয়া ঝড় বৃষ্টি হইবে কি না তাহাও তিনি ঠিক বলিয়া দিতে পারিতেন। একবার তাঁহার কন্যারা নৌকাযোগে মূলাজোড়, চানক, খড়দহ, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি কতিপয় স্থান দেখিতে যাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন নৌকা ভাড়া করা হইল। সমুদয় গোছগাছ করা হইল। খুব ভোরে উঠিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ভোরে উঠিয়া সকলে দেখিলেন যে, আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, প্রবল বাতাস বহিতেছে এবং বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ দেখিয়া সকলেই নৌযাত্রা সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। এদিকে শিবচন্দ্র শয্যা হইতে উঠিয়া, কাহারও যাইবার কোনও তাড়া নাই দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সকলে বলিলেন "এরূপ আকাশ দেখিয়া কিরূপে নৌকাপথে বাহির হইব?" শিবচন্দ্র তখন নিজে ছাদে গিয়া একবার আকাশের চারিদিক লক্ষ্য করিলেন। তারপর কন্যাদিগকে বলিলেন "আমি বলিতেছি, তোমরা স্বচ্ছন্দে যাও, কোনও ভয় নাই। এ ঝড় বৃষ্টি শীঘ্রই থামিয়া যাইবে এবং রৌদ্র উঠিবে।" পিতৃবাক্যে তাঁহারা তখন সানন্দে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে সেই কথাই সত্য হইল। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল এবং দিব্য রৌদ্র উঠিল।

শিবচন্দ্র সকল কার্য্য শৃঙ্খলাপূর্ব্বক করিতেন। যেদিন কলিকাতা যাইবার সঙ্কল্প করিতেন, তৎপূর্ব্ব দিন, কোথায় কাহার সহিত কখন দেখা করিবেন এবং কি কি কাজ করিবেন, তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেন। ঐ তালিকাটি সঙ্গে লইয়া তদনুসারে নিজের গতিবিধি ঠিক করিতেন; কোথাও অযথা কালক্ষেপ করিতেন না।

তিনি নিজে যেমন সময় নষ্ট করিতেন না, তেমনি অপরেরও যাহাতে সময় নষ্ট বা কাজের ক্ষতি না হয়, সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিতেন। কলিকাতায় তাঁহার বহুকুটুম্ব ছিল; সুতরাং কলিকাতা হইতে সর্ব্বদাই তত্ত্বতাবাস প্রেরিত হইত। যে লোক তত্ত্ব লইয়া কোন্নগরে আসিত, তাহাকে আহার করাইয়া যতক্ষণ না বিদায় করা হইত,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিবচন্দ্র কোন মতে সুস্থির হইতে পারিতেন না। যদি সে নৌকা না পায় অথবা রেলগাড়ী ধরিতে না পারে, পাছে তাহার কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয়, এই সব ভাবিয়া তিনি ব্যস্ত হইতেন এবং তাহার আহার হইল কিনা, আহারের আর কত বিলম্ব আছে, পুনঃ পুনঃ এ সকল সংবাদ লইতেন। যেদিন বাটীর কেহ কোথাও গমন করিবেন, সে দিন শিবচন্দ্রের আর নিস্তার থাকিত না। তিনি পুনঃ পুনঃ ঘড়ি দেখিতেন এবং তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বলিতেন।

শিবচন্দ্রের জীবন সর্ব্বাংশে সকলের অনুকরণীয়। কিন্তু তাঁহার নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শ অনুকরণ করা যেরূপ দুঃসাধ্য, তদপেক্ষা তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্বভাবতঃ দুর্ব্বল শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার অনুকরণ অনেক পরিমাণে অনায়াস-সাধ্য। তিনি এ সম্বন্ধে স্ব-রচিত জীবনীতে ৭৭ বৎসর বয়সে যাহা লিপিবন্ধ করিয়াছেন, আমরা প্রধানতঃ তাহা হইতে তাঁহার দৈনিক জীবনের নিম্নলিখিত বিবরণটি সঙ্কলিত করিলাম। তিনি পূর্ব্বোক্ত বয়সে, কি গ্রীষ্মকালে কি শীতকালে, প্রতিদিন ভোর পাঁচটার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি গ্রীষ্মকালে আরো এক ঘণ্টা প্রত্যূষে উঠিতেন। তাহার পর তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া, বাতি জ্বালিয়া সংবাদ পত্রাদি বা ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ করিতেন। ইতিমধ্যে গাভীর দুগ্ধ দোহন করা ও জ্বাল দেওয়া হইলে পর, সাড়ে ছয়টা বা সাতটার সময় এক পোয়া দুধ ও একখানি অ্যারারুট বিস্কুট খাইতেন। বহুবৎসর পূর্ব্বে তিনি কাফি খাইতেন; তখন এদেশের লোকেদের মধ্যে চা পান করার বড় একটা প্রচলন ছিল না। তৎপরে তিনি কাফির পরিবর্ত্তে চা খাইতেন। তারপর হোমিওপ্যাথির প্রভাববশতঃ চা'র পরিবর্ত্তে অনেক বৎসর কোকো খাইতেন। শেষ বয়সে, সব ছাড়িয়া দিয়া, কেবল দুগ্ধ পান করিতেন। এই লঘু প্রাতরাশের পর, তিনি পায়জামা চাপকান পরিয়া বাটীর অনতিদূরে বেড়াইতে যাইতেন; খালি পেটে কখনও বেড়াইতে যাইতেন না। শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ বেড়াইবার মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু শরীর অসুস্থ না হইলে, কখনও বেড়ান বন্ধ হইত না। বেড়াইয়া আসিয়া, তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন ও ভ্রমণের পোষাক ছাড়িতেন। তারপর, সাংসারিক কাজকর্ম্ম দেখিতেন এবং জনসাধারণ সম্বন্ধীয় কোন কাজ হাতে থাকিলে তাহাতেও মনোনিবেশ করিতেন।

স্নানের পূর্ব্বে শিবচন্দ্র আর একবার শৌচে যাইতেন। তথা হইতে আসিয়া নিজে বুরুস (flesh-brush) দিয়া গা হাত পা সব উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতেন। অতঃপর তৈল মাখিতেন ও বেলা দশটার সময় ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিতেন (মাথায় কেবল ঠাণ্ডা জল দিতেন)। স্নানের পর গা মুছিয়া ও কাপড় ছাড়িয়া একটি শাদা রঙের পাতলা ফ্লানেলের জামা পরিতেন ও কিয়ৎকাল ডম্বল ভাঁজিতেন; তিনি বার মাস

ফ্লানেলের জামা ব্যবহার করিতেন, দারুণ গ্রীষ্মেও কখনও খোলা গায়ে থাকিতেন না। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ, তিনি ডম্বল ভাঁজা বন্ধ করিয়াছিলেন। ডম্বল ভাঁজিবার পর, ক্ষণকাল শান্ত চিত্তে পারিবারিক উপাসনার বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া, বেলা এগারটার সময় তিনি আহারে বসিতেন। আহারের উপকরণ অতি সামান্য রকম ছিল—ডাল, ভাত, কিঞ্চিৎ তরিতরকারী, কিঞ্চিৎ মৎস্য, পোয়াটাক দুধ ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন। অতি অল্প পরিমাণ দাদখানি চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন এবং সচরাচর লোকে যাহাতে ঘৃত খায় এরূপ ছোট ছোট বাটি করিয়া ব্যঞ্জন দেওয়া হইত। তিনি সেই সকল বাটি হইতে দুইটি অঙ্গুলিতে যে পরিমাণ ব্যঞ্জন উঠে সেইটুকু মাত্র লইয়া আহার করিতেন। আহারের সময় তিনি কখনও জল খাইতেন না—তিন চারি ঘণ্টা পর খাইতেন। আহারের পর প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি কাজকর্ম্ম, বা পুস্তকাদি পাঠ, করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

অপরাহ্নে আর একবার শৌচে যাইতেন; তারপর বেলা পাঁচটার সময় পাঁচ ফোঁটা আফিমের আরক খাইতেন এবং তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ফল বা একখানি বিস্কুট ও বাতাসা জলযোগ করিতেন। ১৮৮১-৮২ সালে তিনি বহুদিন ধরিয়া আমাশয়, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ ভোগ করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতে তিনি ডাক্তারের পরামর্শে উক্ত ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হন। জলযোগের পর, তিনি পোষাক না পরিয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বেড়াইয়া আসিতেন এবং সে সময়ে বহির্ব্বাটীতে কোন ভদ্রলোক আসিলে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন।

সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময় তিনি সান্ধ্য ভোজনে বসিতেন। দুই খানি ফুলকো রুটি দুধে ফেলিয়া এবং একখানি জল-ঘি-মাখা রুটি ব্যঞ্জন দিয়া খাইতেন। রুটির পরিবর্ত্তে কখন কখন কয়েক টুক্‌রা পাঁউরুটি ব্যবহৃত হইত। এ বেলাও পোয়াটাক দুধ ও কিছু মিষ্টান্ন দেওয়া হইত।

আহারান্তে শিবচন্দ্র পুনর্ব্বার বৈঠকখানায় গিয়া বসিতেন এবং নয়টা বাজিলে অন্তঃপুরে শয়ন করিতে আসিতেন। শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অসুস্থতা নিবন্ধন মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি সন্ধ্যার পর অন্তঃপুরেই থাকিতেন এবং পরিবারবর্গের সহিত উপাসনা, সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া সময় কাটাইতেন; ঠিক নয়টা বাজিলে নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার ঘুম বড় সজাগ ছিল; কেহ তাঁহার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেই বা পাশের ঘরে কেহ চুপি চুপি কথা কহিলেও, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত।

বাটীতে বিপদ, আপদ, সম্পদ, রোগ, শোক, বিবাহ, উৎসব, ক্রিয়াকর্ম্ম, যাহাই হউক না কেন, শিবচন্দ্রের ঘড়ি-ধরা নিয়মের বা খাদ্যের কখনও কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিবচন্দ্রের শরীর স্বভাবতই দুর্ব্বল ছিল; তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে কয়েকবার উৎকট রোগভোগ করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাবী অর্শরোগে কষ্ট পাইতেন। তথাপি তিনি যত্ন সহকারে স্বাস্থ্য নিয়ম পালন করিয়া দীর্ঘজীবী ও নিরতিশয় কার্য্যক্ষম হইয়াছিলেন।

তিনি আমরণ স্ববশে ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অন্তরিন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় শিথিল বা অক্ষম হয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম-জীবন

শাক্ত বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, শিবচন্দ্র বাল্যকালে স্বভাবতঃই কুলধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিখিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে করিতেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর, তিনি পৈতৃক শাক্ত পদ্ধতি অনুসারে গুরুর নিকট সস্ত্রীক কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং যথারীতি প্রতিদিন গুরুদেবের উপদেশানুসারে পূজা আহ্নিক করিতেন। কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া যখন তিনি ডিরোজিওর সংস্রবে আসিলেন, তখন উক্ত শিক্ষকের পরিচালনায় কলেজে ও কলেজের বাহিরে ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল তর্ক বিতর্ক হইত, তাহার ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস লোপ পায় এবং তিনি একজন একেশ্বরবাদী হন। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা নিবন্ধন তিনি সে সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে পারেন নাই এবং বাধ্য হইয়া প্রচলিত হিন্দু ক্রিয়াবিধি পালন করিতেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইভাবে চলিয়াছিল। উক্ত সালে তিনি ডেপুটি কালেক্টররূপে বালেশ্বর হইতে মেদিনীপুরে স্থানান্তরিত হন। তথায়. একদিন "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" এক সংখ্যা তাঁহার হস্তগত হয়। উক্ত পত্রিকা ১৮৪৩ সালে (ভাদ্র মাসে) প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত ও বিশ্বাস বিষয়ক বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি এরূপ প্রীত হন যে সেই দিন হইতেই "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" গ্রাহক হইলেন এবং উক্ত পত্রিকাতে প্রদত্ত উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত শিবচন্দ্রের এই প্রথম পরিচয় নহে। তিনি ১৮৮৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে কুমারী এস. ডি. কলেট্‌কে ইংরাজি ভাষায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি পঠদ্দশায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক

স্থাপিত সাপ্তাহিক "উপাসনা সভায়" উপস্থিত হইতেন। আমরা উক্ত পত্রের কিয়দংশ, মর্ম্মার্থ সহ, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"I was not present at the opening of the 1st Brahma Samaj in 1828 or of the 2nd Brahma Samaj in 1830, but I attended the weekly Upasana Sabha or Prayer Meeting during the period between these two events, while I was a student in the late Hindu College. The Sabha was established in 1828 at a house on the Chitpore Road belonging to Kamal Lochan Bose, and the Divine Service was held every Saturday evening in the following manner. Just at sunset two Telugu Brahmans read the Vedas, and Pandit Utsabánanda Vidyábágis the Upanishads in a side room adjoining the Hall in which the congregation met. After the above reading, Pandit Rám Chandra Vidyábágis occupied a raised seat in front of the congregation, the latter sitting on a large carpet spread on the floor, and delivered a Sermon grounded on some text from the Upanishads, at the conclusion of which Hymns were sung, accompanied with music. Ram Mohun Ray was always present at these meetings, and sat amongst the worshippers without any distinction. In case any one of the congregation asked questions regarding some points touched by the Sermon, or expressed doubts about some religious doctrines the Raja was always ready to answer them, or clear their doubts by suitable explanation. In 1850, I joined the Adi Samaj formally, after having spent a long time in various parts of the country on official duties."

"প্রথম ব্রাহ্ম-সমাজ যখন ১৮২৮ সালে, অথবা দ্বিতীয় ব্রাহ্ম-সমাজ যখন ১৮৩০ সালে খোলা হয়, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু এই দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তীকালে প্রতি সপ্তাহে যে উপাসনা সভা হইত, তাহাতে আমি উপস্থিত হইতাম। তখন আমি ভূতপূর্ব্ব হিন্দু কলেজে পড়িতাম। চিৎপুর রোডের ধারে কমললোচন বসুর একখানি বাটীতে, ১৮২৮ সালে, উক্ত সভা স্থাপিত হইয়াছিল এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় নিম্নোক্ত প্রণালীতে উপাসনা হইত। ঠিক সূর্য্যাস্ত হইলে পর, যে হলে উপাসকেরা সমবেত হইতেন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘরে দুইজন তৈলঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেন এবং পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করিতেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে পর, হলের গৃহতলোপরিবিস্তৃত একখানি বড় গালিচায় উপবিষ্ট উপাসক মণ্ডলীর সম্মুখবর্ত্তী একটি উচ্চ বেদির উপর বসিয়া, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের কোনও শ্লোকমূলক একটি বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতার পর, বাদ্যযন্ত্রসহকারে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইত।

রামমোহন রায় প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং উপাসকগণের মধ্যে নির্ব্বিশেষে বসিতেন। উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে যদি কেহ বক্তৃতার অন্তর্ভূত কোনও

বিষয় সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতেন বা কোনও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে রাজা সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য, অথবা উপযোগী ব্যাখ্যা দ্বারা সেই সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে দেশের নানা স্থানে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে ১৮৫০ সালে আমি আদিসমাজের রীতিমত সভ্য হই।"

শিবচন্দ্রের পত্র পাইয়া, কুমারী কলেট্ উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন; তদুত্তরে শিবচন্দ্র ১৮৮৩ সালের ১০ই এপ্রেল তারিখের একখানি পত্রে পুনর্ব্বার যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"*Ram Mohun Ray's Prayer Meetings*—As far as my memory goes, I think the scripture readings in the side room were not audible to the congregation in the Hall. Of course some faint sounds of the reading were perceived, but they were not distinctly audible. I do not recollect any Brahmins were present at the reading. I think not, except perhaps one or two Pandits. The reading of the Upanishads was conducted in the same manner. In fact, the Scripture readings were generally concluded before the gathering of the congregation took place. I never witnessed any Bible Psalms being chanted in the Brahma Samaj services by Eurasian boys."

"রামমোহন রায়ের উপাসনা সভা—আমার যতদূর স্মরণ হয়, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যে বেদ-পাঠ হইত, হলে সমবেত উপাসকমণ্ডলীর তাহা কর্ণগোচর হইত না। কিছু ক্ষীণ শব্দ অবশ্য অনুভূত হইত, কিন্তু তাহা স্পষ্ট শুনা যাইত না। উক্ত পাঠের সময় কোনও ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিতেন বলিয়া আমার স্মরণ হয় না; আমার মনে হয়, থাকিতেন না—তবে হয়ত দুই একজন পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। উপনিষদ পাঠও ঐরূপে হইত। বস্তুতঃ, উপাসকগণ সমবেত হইবার পূর্ব্বেই বেদপাঠ সচরাচর শেষ হইত। আমি কখনও ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় ফিরিঙ্গি বালকদিগকে বাইবেলের ধর্ম্মসঙ্গীত গান করিতে দেখি নাই।"

১৮৪৬ সালে শিবচন্দ্র মেদিনীপুরে একটি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থান করেন; তথায় প্রতি রবিবার নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা হইত। ১৮৫০ সালের প্রারম্ভে শিবচন্দ্র জেলা চব্বিশ পরগণায় বদলি হওয়াতে, উক্ত ব্রাহ্ম-সমাজটি উঠিয়া যায়; কিন্তু কিয়ৎ কাল পরে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া তত্রত্য ব্রাহ্ম-সমাজটি পুনরুজ্জীবিত করেন এবং উহার বিশিষ্টরূপ উন্নতি সাধন করেন।

১৮৮৮ সালের প্রথমভাগে শিবচন্দ্র মেদিনীপুর ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে একখানি সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র প্রাপ্ত হন। সেই পত্রের উত্তরে শিবচন্দ্র

যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অকৃত্রিম বিনয় এরূপ পরিস্ফুট যে, আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উল্লিখিত পত্র ও তদুত্তর নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম :—

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

মেদিনীপুর,
২৩শে ফাল্গুন, ১২৯৪

শ্রদ্ধেয় মহাত্মন্!

মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় যে মেদিনীপুরে মহাশয় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ প্রথমে রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন আজ দ্বিচত্বারিংশ বৎসর পরে সেই মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ কৃতজ্ঞতার সহিত আজ মহাশয়কে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করিতে উপস্থিত। বিগত বার্ষিক অধিবেশনের নির্দ্ধারণ অনুসারে আনন্দের সহিত মহাশয়কে এই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ইহার একটি সুন্দর মন্দির রহিয়াছে—যাহাতে স্ত্রীলোকদিগেরও বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সভ্য সংখ্যা ৪০টি। এই সমাজের একটি রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়, একটি "ব্রাহ্ম বন্ধু সম্মিলনী" সভা ও একটি "সাধক মণ্ডলী" সভা আছে। সহরের উপরেই "পাহাড়ীপুর" নামক স্থান একটি "ব্রাহ্ম-সমাজ" রহিয়াছে। বিগত সাম্বৎসরিক উৎসব খুব প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। নিবেদন ইতি

বিনয়াবনত
শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

মেদিনীপুর ব্রাঃ সঃ
২৩শে ফাল্গুন ৯৪

উত্তর

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ—
মেদিনীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের সহকারী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার ২৩শে ফাল্গুনের পত্র প্রাপ্তে অবগত হইলাম যে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের গত বার্ষিক অধিবেশনে তথাকার ব্রাহ্মবন্ধুগণ উক্ত সমাজের বীজ প্রথমে আমা কর্ত্তৃক রোপিত হইয়াছিল বলিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। ইহাতে আমি তাঁহাদিগের নিকট অত্যন্ত বাধিত হইলাম। কিন্তু আমি সরল ভাবে তাঁহাদিগকে অবগত করিতেছি যে উক্ত সমাজ স্থাপনের মূল কারণ সেই এক পরমেশ্বর, তাঁহারই

কৃপাবলে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনিই ধন্যবাদের যথার্থ পাত্র, আমি উক্ত বিষয়ে এক ক্ষুদ্র উপলক্ষ মাত্র। যাহা হউক উক্ত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা অবগত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। পরমেশ্বরের সন্নিধানে আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে তাঁহার কৃপাবারি যেন চিরকাল ঐ সমাজের উপর বর্ষিত হইতে থাকে।

কোন্নগর }
২৮শে ফাল্গুন }

নিবেদক—
শ্রীশিবচন্দ্র দেব

চব্বিশ পরগণায় বদলি হইবার কিয়ৎকাল পরে, ১৮৫০ সালে, শিবচন্দ্র বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের একজন সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি যতদিন রাজসেবায় নিযুক্ত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত কেবল নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই করিতে পারেন নাই। যিনি বিধিমতে স্বগ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন তিনি যে কোন্নগরের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে চিরদিন উদাসীন থাকিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। ১৮৬৩ সালের প্রারম্ভে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই, শিবচন্দ্র এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল হইলেন। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন কল্পে তাঁহার নিজ নিকেতনে একটি সুন্দর ও সুবৃহৎ দালান নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যাহাতে উহা পরব্রহ্মের উপাসনার সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হয় তজ্জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে ত্রুটি করেন নাই। নব-নির্ম্মিত দালানে বাঙ্গালা সন ১২৭০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই তারিখে (ইং ২৮শে মে, ১৮৬৩ সাল) কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা হইতে সমাগত বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম যোগদান করিয়াছিলেন এবং গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণও শিবচন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তদীয় ভবনে সমবেত হইয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানাচার্য্য, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেদিতে আসীন হইয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তৎকালোপযোগী বক্তৃতা করিয়া সকলকে উৎসাহিত ও মোহিত করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শিবচন্দ্র "সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ ["১২" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] পাঠ করিয়া প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে একটি প্রীতিভোজ হইয়াছিল। শিবচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই ভোজ কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রত্যেক সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে পরম যত্নসহকারে অনুষ্ঠিত হইত এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যাহাতে উহা বন্ধ না হয় তজ্জন্য শিবচন্দ্র তাঁহার শেষ নিয়োগপত্রে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান।

কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মহর্ষি, ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি পত্রে, যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী" হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

"নৈনান, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৫

....বহু দূরের পথ হেতু কোন্নগরে সে দিবস তোমার যাওয়া ঘটে নাই। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস ও শীতল ও শ্রীনাথ বাবুরা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তথাকার সমাজে সে দিন উপাসনা করিয়া বোধ হয় তাঁহারা বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। সেই নূতন দালানে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু অতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমাদের সহিত এক হৃদয়ে, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং শুভকার্য্যেতে অনুরাগ বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। কোন্নগরে তাঁহার আবাস স্থানে তাঁহার পিতৃপুরুষের নিকেতনে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করা তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প। তিনি আমাকে সেদিন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় বলিলেন, যে কেবল পরব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্তে আমি এই দালান নির্ম্মাণ করিয়াছি। সপরিবারে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল। তিনি অতি শান্ত, গম্ভীর ও বিনীত স্বভাব, তাঁহাকে দেখিলে আমি বড় প্রীতি পাই। এখান হইতে সে দিন কোন্নগরে যাইতে সমস্ত দিবস গত হইল। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর ঘাটের অনতিদূরে নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল, সে আর এগোতে পারে না, পিছুতেও পারে না। সেখানে আমরা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বদ্ধ হইয়া রহিলাম। নানা কষ্টে বেলা অবসান হইলে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর আলয়ে উপস্থিত হইলাম। ক্রমে সে পল্লীগ্রামের শীতল ছায়া হইতে সেদিনকার দশমীর চন্দ্রের কিরণ প্রতিভাত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মদিগের হৃদয় হইতে উৎসাহ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই নূতন উপাসনা মণ্ডপ বর্ত্তিকার আলোকে প্রদীপ্ত হইল এবং সাধু ব্রাহ্মদিগের সমাগম দ্বারা তাহা অলঙ্কৃত হইল। বেদীতে আচার্য্যেরা আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু একটি লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন, এবং তথাকার ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপনের সংবাদ সকলকে অবগত করিলেন। উদ্বোধনের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং উৎসাহ অগ্নি উপাসনা মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। উপাসনা কিছু দীর্ঘকাল হইয়াছিল। কিন্তু উৎসাহেতে সে কালের দীর্ঘতা কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। পরে তত রাত্রিতে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু আমারদিগের আহার করাইলেন এবং প্যারীবাবুর সমভিব্যাহারে আমারদিগের নৌকাতে ফিরিয়া আইলাম। এ উদ্যানে আসিতে প্রভাত হইয়া গেল। আমি একাকী সেই নৌকার ছাদের উপর বসিয়া দশমীর চন্দ্রের অস্তমিত মহিমা দেখিয়া অনন্তের মহিমা অনুভব করিতেছিলাম।"

মহর্ষি যে "নৌকার" কথা লিখিয়াছেন তাহাকে সচরাচর বোট বা বজ্‌রা বলে। তিনি যখনই কোন্নগরে যাইতেন, এইরূপ বোটে চড়িয়া যাইতেন। ইহাতে অধিক

বিলম্ব হইত বটে, কিন্তু তিনি নদীবক্ষে অনেকক্ষণ থাকিতে ভালবাসিতেন বলিয়া, কাল বিলম্বে কষ্ট বোধ করিতেন না। তিনি যে "প্যারীবাবুর" নামোল্লেখ করিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, তাঁহার পরম বন্ধু ও "আলালের ঘরের দুলালের" প্রসিদ্ধ রচয়িতা, ৺প্যারীচাঁদ মিত্র।

মহর্ষি উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে বেদি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আমরা কৈশোরে সেই দেবোপম মূর্ত্তিকে ঐ উপলক্ষে বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে দেখিতাম। তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিবচন্দ্র-সদনে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এবং বৈঠকখানায় না বসিয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তী পুষ্করিণীর সান-বাঁধানো চাতালে ইষ্টক-রচিত অর্দ্ধগোলাকার আসনে উপবেশন করিতেন। বেহালা-নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, ৺অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রায় তাঁহার সঙ্গে আসিতেন। পুষ্করিণীর ধারে মহর্ষি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে পর, তাঁহার জন্য সদ্যোজ্বাল দেওয়া ন্যূনাধিক তিন সের দুগ্ধ একটি বড় জামবাটিতে করিয়া সেইখানেই আনা হইত। তিনি তাহা পান করিয়া রাত্রির আহার সমাধা করিতেন। শিবচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া উপাসনার শেষে যদি একবার ভোজন স্থানে বসিতেন, তাহা হইলে নামমাত্র কিঞ্চিৎ ফলমূল আস্বাদন করিয়া উঠিয়া পড়িতেন এবং বোটে গিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। মহর্ষির অগ্নিময়ী বক্তৃতা ও প্রসিদ্ধ গায়ক ৺বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের মধুময় সঙ্গীত শুনিবার জন্য উৎসব-ক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হইত। ঠাকুর-বাটী হইতে একটি বড় হার্ম্মোনিয়ম আনা হইত। বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষ্ণুর গানের সঙ্গে সঙ্গে অতীব নৈপুণ্যের সহিত সেই হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেন। ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংক্ষিপ্ত লিখন প্রণালী অনুসারে পিতৃদেবের মৌখিক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিতেন; পরে উহা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হইত। প্রথম বার্ষিক উৎসবে "লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের বিভিন্নতা ধর্ত্তব্য না করিয়া সমাজের মূল উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করাই বিধেয়" এই বিষয়ে শিবচন্দ্র একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ["১৩" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] পাঠ করেন।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন উহা কেবল একটি পাক্ষিক উপাসনা সভা ছিল মাত্র; এক রবিবার অন্তর, রবিবার সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইত। বাঙ্গালা সন ১২৭০ সালের মাঘ মাসের ২৬শে তারিখে (ইং ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৪ সাল) ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় সমূহের আলোচনার জন্য, পূর্ব্বোক্ত উপাসনা সভার আনুষঙ্গিক "ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৬৫ সালের ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত, এক রবিবার অন্তর, রবিবার প্রাতে উহার অধিবেশন হইত। ১২৭২ সালের ১২ই বৈশাখ (ইং এপ্রেল, ১৮৬৬ সাল) শেষোক্ত সভাটি

পুনর্জীবিত হইয়া "কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজ" নাম গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসের দ্বিতীয় রবিবারে উহার অধিবেশনকাল ধার্য্য হয়।

যদ্দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি ও জনসাধারণের হিত সাধন হয়, এরূপ কার্য্যনিচয় কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্দেশ্যে; তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা---

(ক) ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুশীলনের জন্য উপাসক সম্মিলন;

(খ) কোন্নগরের বাঙ্গালা ও ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য কতিপয় দরিদ্রছাত্রের মাহিয়ানা প্রদান;

(গ) দরিদ্র ও অসহায়দিগকে অর্থ সাহায্য ও বস্ত্র দান;

(ঘ) রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ;

(ঙ) সমাজ-সম্পৃক্ত একটি ধর্ম্মপুস্তকালয় স্থাপন।

ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রায় একবৎসরকাল যাবৎ শ্রদ্ধাস্পদ ৺অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং কখন কখন ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহারা উভয়েই আদি ব্রাহ্ম-সমাজের নিয়োগানুসারে কোন্নগরে আসিতেন এবং পরম যোগ্যতার সহিত উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তদনন্তর, ১২৭১ সালের ২২শে আষাঢ় (ইং জুলাই ১৮৬৪ সাল) হইতে শ্রদ্ধাস্পদ ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়, পূর্ব্বোক্ত নিয়োগানুসারে, প্রায় দশ বৎসর নিয়মিতরূপে কোন্নগরে আসিয়া উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর, পূর্ব্ববৎ, পাক্ষিক উপাসনা আদি ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইত। বেদান্তবাগীশ মহাশয় সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি "পঞ্চদশী" গ্রন্থের সুন্দর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু মৌখিক বক্তৃতা করা তাঁহার কখনও অভ্যাস ছিল না। তিনি মৌখিক বক্তৃতার পরিবর্ত্তে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের রচিত "বক্তৃতা" গ্রন্থ হইতে অথবা মহর্ষিকৃত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" হইতে একটি বক্তৃতা নির্ব্বাচন করিয়া পাঠ করিতেন। ছয় বৎসর এইরূপ চলিয়াছিল; তন্মধ্যে কেহ কোনওরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ১২৭৭ সালের ৯ই শ্রাবণে (ইং জুলাই ১৮৭০ সাল) কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন সভ্য ও উপাসক, সমাজের উন্নতিসাধন কল্পে, প্রস্তাব করেন যে "(১) পাক্ষিক উপাসনার পরিবর্ত্তে সাপ্তাহিক উপাসনা, (২) উপাসনার অন্তে মৌখিক একটি বক্তৃতা, (৩) সমাজ কোন প্রকাশ্য স্থলে ও (৪) প্রত্যেক মাসের শেষ রবিবার প্রাতে মাসিক উপাসনা কার্য্য হয়।" এই সকল প্রস্তাব আন্দোলন করিয়া কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজ ১৮৭০ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন :—

(১) পাক্ষিকের পরিবর্ত্তে সাপ্তাহিক উপাসনার নিয়ম হইল।
(২) উপাসনার অন্তে নূতন বক্তৃতা প্রার্থনীয়।
(৩) প্রকাশ্যস্থলে সমাজ হওয়া অতি আবশ্যক বটে, কিন্তু এক্ষণে উহা হইতে পারে না। যাহাতে সমাজ প্রকাশ্যস্থলে হয়, এখন হইতে তাহার চেষ্টা করা, সকল ব্রাহ্মের অবশ্য কর্ত্তব্য।
(৪) চতুর্থ প্রস্তাব তাদৃশ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না।

নূতন নিয়মানুসারে ১২৭৭ সালের ভাদ্র মাস (ইং আগষ্ট, ১৮৭০ সাল) হইতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় উপাসনা কার্য্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে সম্পন্ন হইবার বন্দোবস্ত হয়। ১৮৭৩ সালের ২৯শে মার্চ্চ হইতে উপাসনাকাল রবিবারের পরিবর্ত্তে শনিবার সন্ধ্যায় নিরূপিত হয়। ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে (ইং মে, ১৮৭৪ সাল) বেদান্তবাগীশ মহাশয় কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা কার্য্য হইতে বিরত হন; তৎপরে, প্রতি শনিবারের উপাসনা কার্য্য, সাধারণত, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক দ্বারা সম্পন্ন হইত। এই বন্দোবস্ত ১৮৭৬ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; তারপর অন্য বন্দোবস্ত হইয়াছিল, যাহার বিশেষ উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক।

উপরিবর্ণিত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত হইতে উপলব্ধ হইবে যে স্থাপনকাল হইতে প্রথম সাত বৎসর কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ ছিলেন। কেশব বাবুর অন্যতম প্রিয় শিষ্য, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, ১৮৬৯ সালের শেষভাবে কোন্নগর ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর তথায় অবস্থান করেন এবং কয়েক মাস পরেই তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্যে পর্য্যায় ক্রমে ব্রতী হন। সেই সময় হইতে, কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের উপর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব আদি ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক বলবত্তর হইয়াছিল, কিন্তু শেযোক্ত সমাজের সহিত প্রথমোক্ত সমাজের যোগ কদাপি বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের অবিদিত নাই যে ব্রহ্মানন্দ (কেশবচন্দ্র) মহর্ষির পুত্রাদপি প্রিয় ছিলেন। তিনি আট বৎসর মহর্ষির সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া ১৮৬৬ সালের ১১ই নবেম্বর আদি ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেন স্থাপন করিয়াছিলেন, এখানে তাহার সবিস্তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুরাতন সমাজের সহিত নূতন সমাজের প্রধান পার্থক্য এই যে নব্যমতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম না বলিয়া কেবল হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, এবং জাতিভেদ না উঠাইয়া দিয়া কেবল পৌত্তলিকতা উঠাইয়া দিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা হইবে না। উন্নত ও উদার

মতের চির-পক্ষপাতী শিবচন্দ্রের নব-প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং তিনি বরাবর উক্ত সমাজকে অর্থ দ্বারা ও অন্যরূপ বিধিমতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এদিকে আবার মহর্ষির প্রতি তাঁহার চিরদিন প্রগাঢ়তম ভক্তি ছিল; এজন্য কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন, সমাজের বাৎসরিক উৎসবে উভয় দলের নেতৃগণ সমান সমাদরে নিমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হইতেন এবং পর্য্যায়ক্রমে বেদি অধিকার করিতেন। কেশব বাবু বা প্রতাপ বাবু প্রায় প্রাতঃকালে বেদি অলঙ্কৃত করিতেন; সায়ংকালে মহর্ষি স্বয়ং বা ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার কোনও প্রতিনিধি বেদি উজ্জ্বল করিতেন। এইরূপ বন্দোবস্তে উভয় দলের পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

ব্রাহ্ম বিবাহ আইনসঙ্গত করিবার জন্য যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে চেষ্টা হয়, তখন আদি ব্রাহ্মসমাজ তাহার প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ তাহার পোষকতা করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কন্যার বয়স ন্যূনকল্পে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ ধার্য্য না হইয়া পূর্ণ ত্রয়োদশ বর্ষ ধার্য্য হওয়াই বিধেয় এবং বর ও কন্যাকে নিজ নিজ বয়স ইত্যাদি সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রারকে যাহা জ্ঞাপন করিতে হইবে তাহা বিবাহের পূর্ব্বে জ্ঞাপন না করিয়া ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইয়া গেলে পর জ্ঞাপন করিলেই ভাল হয়। ১৮৭১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভারতরাজ-প্রতিনিধির নিকট এই মর্ম্মে একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রস্তাবিত আইন ১৮৭২ সালের ৩ আইন বলিয়া বিধিবদ্ধ হইলে পর, সেই সালের ৪ঠা জুন হইতে শিবচন্দ্র, হুগলি জেলায় উক্ত আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহসমূহের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বার্দ্ধক্যবশতঃ, তিনি উক্ত কর্ম্মে ইস্তফা দেন এবং ১৮৮৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে গবর্ণমেণ্ট উহা মঞ্জুর করেন।

১৮৭৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক সংবাদপত্রে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী বিজ্ঞাপন দেন যে ব্রাহ্ম পরিবারের অনুষ্ঠেয় সামাজিক ক্রিয়াকলাপের বিধি বিষয়ক একখানি পুস্তক অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হইবে এবং তজ্জন্য প্রত্যেক মফস্বলস্থ সমাজকে জ্ঞাতব্য বিষয় ও মতামত জানাইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া ১২৮২ সালের ২১শে পৌষে (ইং জানুয়ারি, ১৮৭৬ সাল) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন :—

জাতকৰ্ম্ম,
নামকরণ,
বিবাহ,
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও
শ্রাদ্ধ।

এই অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রস্তুত করিবার জন্য কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন সম্পাদক পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়কে ও শিবচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা প্রযুক্ত ৺গৌরগোবিন্দ রায়, ৺ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ৺অঘোরনাথ গুপ্ত (সাধু অঘোরনাথ), ৺কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি উক্ত সমাজের অনেকের সহিত শিবচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া ছিল। ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৺আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি যাঁহারা পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে শিবচন্দ্রের সহযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত শিবচন্দ্রের প্রথম পরিচয়ও এই সূত্রে হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক কেশব বাবু শিবচন্দ্রের বহুদিনের পরিচিত; আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃদেব শিবচন্দ্রের পরমবন্ধু ছিলেন এবং কোন্নগরে শিবচন্দ্র-সদনে অনেকবার আসিয়াছিলেন। কেশব বাবু যখন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দেন এবং ধর্ম্ম জগতে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও একনিষ্ঠতার প্রভাবে নব প্রাণ সঞ্চারিত করেন, সেই সময় হইতেই তিনি শিবচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কেশব বাবুর টাউনহলে বক্তৃতা শুনিবার জন্য শিবচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সেও কলিকাতায় যাইতেন এবং কোন্নগরে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে কয়েকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র যখন ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দেন, তখন কেশববাবু সেই বিবাহে পুরোহিতের এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল। এই বিবাহের অল্পকাল পরে, ১৮৭৬ সালের শেষভাগে, শিবচন্দ্র যখন স্বাস্থ্যহেতু, কলিকাতা মির্জাপুরে একখানি বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে বাস করিতেন, সেই সময়ে উক্ত বাগান-বাড়ীতে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু রাজনারায়ণ বসু ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যাহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের মিলন হয় সেই উদ্দেশ্যে, শিবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইতেন।

কিন্তু হায়! তখন তাঁহারা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একবৎসর পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের কি শোচনীয় অধঃপতন ঘটিবে। কিন্তু যে সকল কারণে

সেই অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল, এই সময়েই তাহার সূত্রপাত দেখা দিয়াছিল। আমরা এস্থলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করি। কেশববাবুর দল বাঁধিবার ক্ষমতা অসাধারণ পরিমাণে ছিল, ইহা তাঁহার অতি বড় শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার বক্তৃতায়, তাঁহার ভাবভঙ্গীতে, কি একটি কুহক ছিল, যাহার প্রভাবে কি সুশিক্ষিত, কি অর্দ্ধশিক্ষিত, সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন; কেহ কেহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কেহই সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে কি একটি কমনীয়তা, কি একটি মধুরিমা বিজড়িত ছিল যাহার গুণে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যেন মনুষ্যদলের একজন নেতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার ঐকান্তিকতা, তাঁহার অমায়িকতা দেখিয়া লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিত; তিনিও প্রথম প্রথম নেতা হইবার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে নর-পূজার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহাতে যিনি কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা হন, অত্যধিক পূজিত হইয়া, তাঁহার ক্রমশঃ নৈতিক অবনতি না হওয়াই আশ্চর্য্য। কেশববাবুর ও তাহাই হইয়াছিল। বহুবৎসরের নেতৃত্বের ফলে তাঁহার একাধিপত্য করিবার স্পৃহা ক্রমশঃ এরূপ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজকে প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়মতন্ত্র শাসনায়ত্ত করা তাঁহার মোটেই অভিপ্রেত ছিল না এবং যাঁহারা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেন তাঁহারা তাঁহার বিরাগভাজন ও বিফলপ্রযত্ন হইতেন। সাধারণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত সমাজের নেতার এটি একটি গুরুতর দোষ। তাঁহার যে অকৃত্রিম ঈশ্বরানুরাগ ছিল যে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু ঐশ্বরিক বিধিপালনে আন্তরিক ইচ্ছার সহিত তাঁহার আত্মম্ভরিতা অতর্কিতভাবে মিশ্রিত হইয়া ঈশ্বরের "আদেশ" সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মতের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঈশ্বরের আদেশ বলিলে ব্রাহ্ম মাত্রেই সহজ জ্ঞান বা বিবেক বুঝিয়া থাকেন, কারণ ব্রাহ্মেরা বেদ কোরাণাদিকে ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কিন্তু কেশব বাবু, কুচবিহারের মহারাজার সহিত তাঁহার কন্যার অব্রাহ্ম বিবাহের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, বেদি হইতে এই অভিনব মত প্রচার করিয়াছিলেন যে বিবেক-বাণী ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ আদেশ সময়ে সময়ে ভক্তের কর্ণে ধ্বনিত হয়। তাঁহার ধারণা ছিল তিনি ঈশ্বরের স্বর চিনিতেন এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া যখন যে মত প্রকাশ করিতেন, তাহা যে তাঁহার স্বীয় মতের প্রতিরূপ মাত্র তাহা মনে করিতেন না এবং তদ্বিপরীতে কেহ কিছু বলিলে তাহা ঈশ্বরের আদেশবিরুদ্ধ

জ্ঞান করিতেন। যে সকল কারণে কুচবিহার বিবাহের পূর্ব্বেই কেশব বাবু নিজ দলের অনেকের শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান দুইটির উল্লেখ করিলাম—অর্থাৎ তিনি সাধারণের মত না লইয়া নিজের মতে চলিতেন এবং নিজের মতকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই দুই কারণ কুচবিহার-বিবাহের মূলেও নিহিত ছিল। কুচবিহার-বিবাহের পর যে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, সেই সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় "ইণ্ডিয়ান মিরার" সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া একখানি চিঠি ছাপাইয়াছিলেন। আমরা উপরে যাহা বলিলাম উক্ত পত্রখানি তাহার সমর্থক বলিয়া "১৪" চিহ্নিত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

শিবচন্দ্র তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে কেশব বাবু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে, একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা ও সংস্কারক বলিয়া, আমি এক সময়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম। কিন্তু ইদানীং অর্থাৎ কুচবিহার বিবাহের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে তাঁহার কতকগুলি কার্য্যকলাপ এবং ব্রহ্মমন্দিরে তৎপ্রদত্ত কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ আমি অত্যন্ত আপত্তিজনক মনে করিয়াছিলাম; এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তিত হয়। যখন শুনিলাম যে তিনি কুচবিহারের মহারাজার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন ঐ ব্যাপার আমার অত্যন্ত অমনোনীত হইল এবং আমি আমার বন্ধুগণের সহিত যোগ দিয়া উক্ত বিবাহের বিরুদ্ধে একটি প্রবল প্রতিবাদ পাঠাইলাম।"

১৮৭৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের "ইণ্ডিয়ান মিরার" সংবাদপত্রে কোচবিহারের অল্পবয়স্ক মহারাজার সহিত কেশব বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার ভাবী বিবাহের সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হইবামাত্র, সেই দিনেই শিবচন্দ্র প্রমুখ কলিকাতার তেইশ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, উক্ত বিবাহের প্রবল প্রতিবাদ কবিয়া কেশব বাবুকে পত্র লিখেন ["১৫" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] এবং সেই পত্রের প্রতিলিপি মফস্বলের সমাজ সমূহের সমীপে সেই দিনেই (২৮শে মাঘ ১২৮৪ সাল—ইং ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮ সাল) পাঠাইয়া তাঁহাদিগকেও প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করেন ["১৬" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ]।

কতিপয় দিবসের মধ্যে, বহুসংখ্যক প্রতিবাদ আসিয়া পড়িল। ব্যক্তিগত প্রতিবাদ ছাড়া, বঙ্গের ৮০টি প্রাদেশিক সমাজের মধ্যে ৫০টি সমাজ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ৩টি বিবাহের পক্ষে ছিলেন, ৪টি কোনও নিশ্চিত মত দেন নাই এবং অবশিষ্ট ২৩টি কোনও উত্তর দেন নাই।

এই সকল প্রতিবাদে বিচলিত না হইয়া, কেশব বাবু ৬ই মার্চ্চে কুচবিহারের মহারাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে স্থির সঙ্কল্প হইলেন।

প্রতিবাদকারীরা এক্ষণে একটি "সাময়িক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা" গঠন করা আবশ্যক বোধ করিলেন এবং শিবচন্দ্রকে উহার সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। প্রস্তাবিত বিবাহের প্রকাশ্য প্রতিবাদার্থ প্রতিবাদকারীরা অ্যালবার্ট হলে একটি সভা আহ্বান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উক্ত হলের সম্পাদক কেশব বাবুর নিকট হল ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অভিলষিত অনুমতি পাইয়া সাময়িক কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের একখানি পত্র দ্বারা ["১৭" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] মফস্বলের সমাজসমূহকে জানাইলেন যে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মদিগের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া উক্ত বিবাহের নিন্দনীয়তা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে, এবং তদ্বিষয়ে প্রত্যেক সমাজের মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

অ্যালবার্ট হলে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আহূত সভা কি জন্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রতিবাদকারীরা সে সময়ে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন ["১৮" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ]। ফল কথা এই যে, কেশব বাবু উক্ত হল ব্যবহারের যে অনুমতি দিয়াছিলেন তাহা যাহাতে কার্য্যকরী না হয় তজ্জন্য তাঁহার পক্ষ হইতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। প্রতিবাদকারীরা, অগত্যা টাউন হলে, ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে, একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিলেন। উক্ত সভায়, বর্ত্তমান সঙ্কটে ব্রাহ্ম সমাজের শুভসংরক্ষণার্থ ২১ জন নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্ম লইয়া "ব্রাহ্ম সমাজ সমিতি" নামে একটি সমিতি সংগঠিত হয় এবং শিবচন্দ্র ঐ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ইতিমধ্যে কুচবিহারের মহারাজার সহিত কেশব বাবুর কন্যার বিবাহের আয়োজন অবাধে চলিতেছিল। কলিকাতায় যখন সংবাদ আসিল যে ৬ই মার্চ্চ উক্ত বিবাহ হিন্দু মতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেশব বাবু এ পর্য্যন্ত নীরব ছিলেন, এখনও আত্মরক্ষার্থ কোনও কথাই বলিলেন না। পরিশেষে, তাঁহার অনুমতি ও পরিচালনা ক্রমে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং প্রচারক সভার সম্পাদক, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়, ১৬ই চৈত্রের (ইং ২৯শে মার্চ্চ) "ধর্ম্ম-তত্ত্বে" কুচবিহার-বিবাহের আদ্যোপান্ত বিবরণ দিয়া কেশব বাবুর দোষক্ষালনে প্রবৃত্ত হন। "ধর্ম্ম-তত্ত্বে" প্রকাশিত বিবরণের একটি ইংরাজি অনুবাদ প্রতাপ বাবু স্বয়ং কুমারী কলেটকে পাঠাইয়াছিলেন। আমরা তৎসম্পাদিত ১৮৭৮ সালের "ব্রাহ্ম ইয়ার-বুক" হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া "১৯" চিহ্নিত পরিশিষ্টে দিলাম।

আমরা সংক্ষেপে কেশব বাবুর উক্ত নিষ্কৃতিলাভ-প্রয়াসের সমালোচনা করিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটি কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক। কেশব বাবু যখন কন্যার বিবাহ

দিয়াছিলেন তখন তিনি উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের নেতা ও সমাজ-সংস্কারকদিগের অগ্রণী বলিয়া প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সুপরিচিত—তাঁহাকে যথার্থরূপে বিচার করিতে গেলে এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। তিনি যদি কেবল দেওয়ান রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু ভদ্রলোক হইতেন, তাহা হইলে তিনি তনয়াকে রাজরাণী করিবার আকাঙ্ক্ষা পূরণকল্পে যাহা করিতেন তাহাতে আমাদের কাহারও কিছু বলিবার কথা থাকিত না—হিন্দুরা অবশ্য অসবর্ণ রাজপুত্রের সহিত বৈদ্য-কন্যার বিবাহ কখনই অনুমোদন করিতেন না, কিন্তু উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের এরূপ বিবাহ সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করিবার কারণ থাকিত না; বরং হিন্দুদিগের মধ্যে যে কোনও কারণেই হউক, জাতিভেদ শিথিল হইলে তাঁহার সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইতেন না। কিন্তু কেশব বাবু উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের এবং সমাজ-সংস্কারকদিগের অগ্রগণ্য; তিনি ব্রাহ্ম বিবাহ বৈধ করিবার জন্য এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ যাহাতে বৈধ না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া যে রাজবিধি বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে বেদি হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে উহা কেবল রাজবিধি নহে, উহা ঈশ্বরের বিধি, তাঁহার আদেশেই সম্পন্ন হইয়াছে, সেই বিধি তিনি স্বীয় দুহিতার বিবাহে লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের এক অভিনব আদেশের দোহাই দিয়া কিরূপে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন? তাঁহার স্বাপক্ষ্যে উক্ত হইয়াছে যে তিনি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কখনও কোনও চিন্তা করেন নাই; যখন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ঘটনা ক্রমে এই বিবাহের প্রস্তাব তাঁহার নিকট প্রথম উপস্থিত হইল তখন তিনি ইহা ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্থির বুঝিলেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিলেন। তিনি নিজ হৃদয়কে কেবল এই প্রশ্ন করিলেন যে, ইহা করা উচিত কি অনুচিত? তাঁহার হৃদয় বলিল, ইহা করা উচিত, এবং ঘটনা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে ভগবান নিজে তাঁহার ভাবী জামাতাকে তাঁহার নিকট আনিয়া দিয়াছেন। এইরূপে তিনি ফলাফল চিন্তা না করিয়া, কেবল বিবেক-প্রণোদিত হইয়া এবং ঈশ্বরেচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা এই যে, যদি তিনি এই বিবাহ সম্পন্ন না করিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিবেকের নিকট অপরাধী হইতেন; এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক যদি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত, তাহা হইলেও তিনি এই কার্য্য হইতে বিরত হইতেন না; কারণ, ঈশ্বর মানুষের অপেক্ষা বড় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষের ইচ্ছার অপেক্ষা বড়।

কেশব বাবুর উপরোক্ত মত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা যেমন ভ্রান্ত, তেমনি ভয়ানক। যাহা বিনা চেষ্টায় আমাদের হস্তগত হয় তাহা ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিনা বিচারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এই মত অনুসারে চলিলে সংসারে অশেষবিধ অকল্যাণ

অবশ্যম্ভাবী। সংসারযাত্রায় পদে পদে কত শত প্রলোভন বিনা আহ্বানে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা আপাত-মনোরম হইলেও পরিণামে বিষময় ফল প্রসব করে; আমরা যদি ফলাফল চিন্তা না করিয়া, বিবেক-বাণী না শুনিয়া যাহা আমাদের প্রীতিকর বোধ হইবে তাহাই ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিয়া সেই প্রলোভনের বশীভূত হই, তাহা হইলে দুর্নীতির সীমা থাকে না। প্রলোভন যতই মনোরম ও সুবিধাজনক বোধ হইবে; ততই বিশেষ যত্ন সহকারে বিবেক-বুদ্ধির পরিচালনা করিতে হইবে; কারণ, মানুষ যখন অভীষ্ট সাধনের জন্য ব্যগ্র হয়, তখন বিবেকের ক্ষীণ স্বর সম্বন্ধে তাহার বধিরতা জন্মে। কেশব বাবুরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। তিনি রাজ-শ্বশূর হইবার গৌরবে অন্ধ হইয়া যে ঘটনায় ঈশ্বরের বিশেষ বিধান দেখিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহা তাঁহার জীবনের মধ্যে সৰ্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রলোভন—সৰ্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। যিনি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, নবীন যৌবনে সৰ্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস বৰ্জ্জন করিয়া, এমন কি, চাকুরি পৰ্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মধৰ্ম্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; যিনি ব্রাহ্মধৰ্ম্ম প্রচারই জীবনের ব্রত করিয়া, অসাধারণ উদ্যম সহকারে ও অলৌকিক প্রতিভাবলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়-পতাকা দেশবিদেশে উড্ডীন করিয়াছিলেন; যাঁহাকে সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণজ্ঞা অধীশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন; যিনি ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া "ভারত সংস্কার সভা" স্থাপন করিয়া সৰ্ব্বপ্রকার সংস্কার কার্য্যে ঐকান্তিক উদ্যমের সহিত ব্রতী হইয়াছিলেন; যিনি কুচবিহার-বিবাহের কয়েক মাস পূর্ব্বেও মোড়পুকুরের "সাধনকাননে" বৈরাগ্য সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন; তিনি যে সহসা রাজ-শ্বশুর হইবার সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র সেই প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিবেন না, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না, ইহা কেহই মনে করে নাই। কেশব বাবুর পক্ষসমর্থনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি তাঁহার বিবেকের আদেশানুসারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে যে বিবেকদ্বারা পরিচালিত হইতেন, এ বিবেক কি তাহা হইতে স্বতন্ত্র? নতুবা যে বিবেক তাঁহাকে বরাবর বলিয়া আসিয়াছে "যাহা অসত্য তাহা পালন করা অনুচিত; পৌত্তলিকতা মিথ্যা ধৰ্ম্ম, তাহার সংস্পর্শে থাকিও না; বাল্যবিবাহ সমাজের বিষম অপকারী, তাহাকে প্রশ্রয় দিও না" সেই বিবেক তাঁহাকে কিরূপে বলিল "হিন্দুকুলোদ্ভব, অব্রাহ্ম ও অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্রের সহিত তোমার বালিকা কন্যার বিবাহ দেওয়া বিধেয়"? ঈশ্বরই বা কি জন্য তাঁহাকে আদেশ দিবেন "ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তোমার কন্যার সহিত বিবাহের উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান না করিয়া তুমি এই পৌত্তলিক রাজবংশসম্ভূত, কিশোরবয়স্ক ও অগঠিতচরিত্র রাজপুত্রকে কন্যাসমর্পণ কর, কাহারও নিষেধবাক্যে কর্ণপাত করিও না।" ঈশ্বর কি ঐশ্বর্য্যের এতই পক্ষপাতী? কেশব বাবু ফলবাদী

ছিলেন না; তিনি এই বিবাহের ফলাফল গণনা করেন নাই; ইহাতে কুচবিহার রাজ্যের বা বঙ্গের মঙ্গল হইবে কি না তাহা তিনি ভাবেন নাই; ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার কন্যার জন্য মোটের উপর ইহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় বৈবাহিক সম্বন্ধ যুটিত কি না তাহাও তিনি ভাবেন নাই; তিনি কেবল বিবেকবাণী ও ঈশ্বরাদেশের বশবর্ত্তী হইয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সমস্ত পৃথিবীর লোক বিরোধী হইলেও তিনি এই ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্যসম্পন্ন করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। যিনি ধর্ম্মের জন্য আত্ম বলিদান করেন, যিনি বিবেক-প্রণোদিত হইয়া স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হন, এই মহতী উক্তি কেবল তাঁহার মুখেই শোভা পায়। কিন্তু যিনি কন্যাকে রাজরাণী করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ ব্রাহ্মের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া এবং নিজে বেদি হইতে পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, স্বকপোল কল্পিত ঈশ্বরাদেশের দোহাই দিয়া নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে এরূপ কথা কেবল শোচনীয় মতিভ্রমের পরিচায়ক।

কেশব বাবু, কন্যার বিবাহ কুচবিহারের মহারাজার সহিত না দিয়া যদি কোনও সদ্গুণসম্পন্ন ব্রাহ্ম যুবকের সহিত দিতেন, তাহা হইলে কন্যার পক্ষে ভাল হইত কি মন্দ হইত, চল্লিশ বৎসর পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছুক। কুচবিহারের বর্ত্তমান রাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবীকে আমরা সাতিশয় শ্রদ্ধা করি; তিনি প্রথম হইতেই তাঁহার উচ্চ পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং এখনও তিনি নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃতা। আমাদের বিশ্বাস এই যে কুচবিহার বিবাহে কেশব বাবুর পরিবারবর্গের সাংসারিক হিসাবে ইষ্ট বই অনিষ্ট হয় নাই। তিনি কেবল সমাজের ক্ষতি করিয়া নিজে কলঙ্কের ভাগী হইয়াছিলেন। কেশব বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কল্পে এক সময়ে যেরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া, কুচবিহার-বিবাহের সময় তাঁহার যে শোচনীয় মতিভ্রম ঘটিয়াছিল তাহার বিশ্লেষণে আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় নাই। কেবল সত্যের অনুরোধেও আমরা এই নিতান্ত অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই; কারণ আমরা ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে বসি নাই—আমরা শিবচন্দ্রের জীবনী লিখিতেছি মাত্র। শিবচন্দ্র লঘুচিত্ত ছিলেন না, তিনি চলচিত্ততা প্রযুক্ত এক সময়ে কেশব বাবুর একজন অনুরাগী ভক্ত হইয়া, পরে, সামান্য কারণে তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে দল বাঁধেন নাই, ইহা সপ্রমাণ করা শিবচন্দ্রের জীবনী-লেখকের অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়াই আমরা এই অনভিমত কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, কেশব বাবুর পূর্ব্বোক্ত নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াসের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কেশব বাবুর পক্ষ-সমর্থনে উক্ত হইয়াছে যে কুচবিহারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মহারাজার সহিত কেশব বাবুর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব মহারাজার অভিভাবক-স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে না আসিলে এবং গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী না হইলে, কেশববাবু উক্ত প্রস্তাব আদৌ গ্রহণ করিতেন না। আমাদের বিবেচনায়, এইখানেই তিনি একটি সাঙ্ঘাতিক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে মহারাজা হিন্দু হইলে কি হয়? তিনি ত সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের অধীন এবং গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাঁহার বিবাহ পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করাইতে পারেন। কিন্তু কেশব বাবুর ন্যায় একজন বিচক্ষণ লোকের নিতান্ত বুদ্ধি বিপর্য্যয় না হইলে, বুঝিতে বিলম্ব হইত না যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম্ম সংস্কারে বা সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন না। যে রাজবিধি অনুসারে ব্রাহ্ম বিবাহকে বৈধ করা যাইতে পারে তাহা কুচবিহার খাটে না, সুতরাং উক্তরাজ্যের হিন্দুকুলোদ্ভব অধীশ্বরের বিবাহ হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন না হইলে উহা অবৈধ ও অসিদ্ধ হইবে। এরূপ স্থলে রাজপুরুষেরা কেশববাবুর মতানুবর্ত্তন করিতে যতই ইচ্ছুক হউন না কেন, তাঁহারা হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির বৈধত্ব বজায় রাখিয়া উহাকে কিরূপে ব্রাহ্ম পদ্ধতি সঙ্গত করিতে সক্ষম হইবেন? কেশব বাবু সময় থাকিতে এই কথাটি বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহার বরাবর বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার কন্যার বিবাহ ঠিক ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে না হউক অন্ততঃ পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে, গবর্ণমেণ্টের সহায়তায়, সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তিনি পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াসে স্বীকার করা হইয়াছে যে, বিবাহের বৈধত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে, বরকে হোমক্রিয়ায় উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল; ইহাও বলা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনকল্পে কেশববাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিয়া থাকেন, তজ্জন্য কেশববাবুর পক্ষ হইতে কোনও অভিযোগ উত্থাপিত হইবে না।

কুচবিহারের ডেপুটি কমিশনার সাহেব সর্ব্বপ্রথমে স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া কেশব বাবুর কন্যাকে দেখিয়া যান এবং তাঁহাকে কুচবিহারের মহারাজার সহিত বিবাহের জন্য মনোনীত করেন। অল্পদিন পরে, তিনি, কমিশনার লর্ড ইউলিক্ ব্রাউনের অনুমতিক্রমে, কেশববাবুকে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রস্তাবিত বিবাহে তিনি কি কি বিষয়ে প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতির ব্যতিক্রম আবশ্যক বোধ করেন। তদুত্তরে, ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে, কেশববাবু কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটিই প্রধান :—

(১) রাজাকে লিখিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি একজন ব্রাহ্ম বা একেশ্বরবাদী।

(২) বিবাহটি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি (অর্থাৎ পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত হিন্দু পদ্ধতি) অনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে অপৌত্তলিক দেশাচার সমূহও অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

(৩) বর ও কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর তবে তাহাদের উদ্বাহ কার্য্য সমাধা হইবে; কিন্তু যদি ততদিন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না এরূপ বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে কেবল যথাবিধি বাগ্দান হইতে পারে, বিবাহের পূর্ণতা সম্পাদন মহারাজার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে।

(৪) বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মানুগত নিয়ম সমূহের কোনও ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না; যে সকল দেশাচার কেবল অযৌক্তিক কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে তাহার পালনে আপত্তি নাই।

অতঃপর, অক্টোবর মাসেই, ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে অকস্মাৎ এই মর্ম্মে একখানি পত্র আসিল যে, মহারাজার বয়সের অপূর্ণতা নিবন্ধন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গবর্ণর তাঁহার বিবাহ অনুমোদন করেন নাই এবং মহারাজা নিজেও বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, অতএব বিবাহ হইবে না। কিন্তু তিন মাস পরে, ডেপুটি কমিশনার পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন যে লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গবর্ণর এই নিয়মে বিবাহের মত দিয়াছেন যে মহারাজাকে বিবাহের পর অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রা করিতে হইবে। রাজার অবিবাহিত অবস্থায় দূরযাত্রা বাঞ্ছনীয় নহে, এজন্য ৬ই মার্চ্চের পরে তাঁহার বিবাহ হইলে চলিবে না। তাঁহার কন্যার বয়স পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ নহে বলিয়া কেশববাবু এত শীঘ্র বিবাহ দিতে যদি অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে সচরাচর বিবাহ বলিলে যাহা বুঝায় এ বিবাহ তাহা নহে, ইহার কেবল বাগ্দান মাত্র।

অবশেষে, প্রস্তাবিত বিবাহটি কেবল বাগ্দান বলিয়া বিবেচিত হইবে এই শর্তে কেশববাবু ৬ই মার্চ্চে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। কেশববাবুর পক্ষ সমর্থনে উক্ত হইয়াছে যে রাজা ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন এবং এই কথা লিখিয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রাজার নিকট হইতে এরূপ কোনও লিপি বাস্তবিক লিখাইয়া লওয়া হইয়াছিল কি না তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তিনি যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রসঙ্গে ১৮৭৮ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখের "ইংলিশ্‌ম্যান্" সংবাদপত্রে প্রকাশিত একখানি পত্র, কুমারী কলেট্-সম্পাদিত উক্ত সালের "ব্রাহ্ম ইয়ার্‌বুক্" হইতে নিম্নে, মর্ম্মার্থ সহ, উদ্ধৃত করিলাম :—

To the Editor of THE ENGLISHMAN

Sir,

Allow me through the medium of your paper to answer some very pertinent questions of your correspondent K. P. Ray, whose letter appeared in your issue of the 27th ultimo.

Firstly—The Raja of Kuch Behar has never been baptized, or initiated into Brahmoism.

Second—The marriage of the Maharaja with the daughter of Babu Keshub Sen, which is about to take place at Kuch Behar, will necessarily be celebrated according to Hindu rites in all essential features, and is essentially a Hindu and not a Brahmo marriage.

Thirdly—Whatever the private opinions of the Maharaja may be on religious subjects, and looking to the nature of his education, it is only reasonable to suppose they would be somewhat more liberal than those of his predecessors, he is, at all events, not a professed Brahmo but a professed Hindu; and all that has been lately written about his alleged conversion, baptism, and initiation into the Brahmic faith, &c., &c., is absolutely and entirely without any valid foundation whatever.

March 4, 1878 D.

"ইংলিশ্‌ম্যান্‌" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনার পত্রলেখক, কে. পি. রায় আপনার সংবাদপত্রের গত মাসের ২৭শে তারিখের সংখ্যায়, কতকগুলি- অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি তাহার উত্তর দিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

প্রথমতঃ—কুচবিহারের রাজার কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মে অভিষেক বা দীক্ষা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ—বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার যে বিবাহ ত্বরায় কুচবিহারে সম্পন্ন হইবে, তাহা অবশ্য বস্তুতঃ হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে এবং তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুবিবাহ—ব্রাহ্মবিবাহ নহে।

তৃতীয়তঃ—মহারাজার ধর্ম্ম সম্বন্ধে গুপ্ত মত যাহাই হউক না কেন—তাঁহার যেরূপ শিক্ষা হইতেছে তাহা অনুধাবন করিলে এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত যে,

তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের মতাপেক্ষা তাঁহার নিজমত কথঞ্চিৎ উদারতর—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে প্রকাশ্যভাবে তিনি এক জন হিন্দু—ব্রাহ্ম নন; এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে অভিষিক্ত ও দীক্ষিত হওন ইত্যাদি বিষয়ে সম্প্রতি যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অমূলক।

৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৭৮। ডি।

কুচবিহারের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ডলটন সাহেব—যিনি এই বিবাহের মূলে ছিলেন—সম্ভবতঃ তাঁহার নিজ নামের আদ্যক্ষর স্বাক্ষরিত করিয়া উক্ত পত্রখানি লিখিয়াছেন, ইহা সে সময়ে অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল এবং পত্রখানি যেরূপ প্রামাণিকভাবে লিখিত তাহাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। কুচবিহার-বিবাহ যে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুবিবাহ—ব্রাহ্মবিবাহ নহে—এই পত্রখানি তাহার অন্যতম প্রমাণ।

বিবাহের পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহাতে পরে কোনওরূপ মতভেদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য কেশব বাবুর প্রস্তাবানুসারে, প্রধান রাজপণ্ডিত, কন্যাপক্ষের পুরোহিত পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া পদ্ধতি নির্ণয় করিবার জন্য, কুচবিহার হইতে কলিকাতায় আসিলেন। এক সপ্তাহের অধিক কাল ধরিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বহুবিধ তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। তদনন্তর, বিবাহে কি কি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কি নিয়মে হইবে তাহা এক প্রকার স্থির হইয়া গেল—স্থির হইল যে পূর্ব্ব-কথিত ব্রাহ্ম পদ্ধতির সহিত অপৌত্তলিক দেশাচারসমূহও পালিত হইবে; ইহাও স্থির হইল যে সমগ্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতি তুলট কাগজে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া বিবাহকালে উভয় পক্ষের পুরোহিত কর্ত্তৃক পঠিত হইবে।

১৮৭৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে, রাজা যখন বিবাহার্থ কলিকাতা হইতে কুচবিহার যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার সমভিব্যাহারী গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিকে উল্লিখিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতির একখানি হস্তলিখিত প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎসংলগ্ন একখানি কাগজে নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়মগুলিও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল :—

(১) বর অথবা কন্যা বিবাহকালে বা তৎপূর্ব্বে বা পরে অনুষ্ঠিত কোনও পৌত্তলিক ক্রিয়ায় যোগদান করিবেন না।

(২) বিবাহের স্থানে কোনও দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, অগ্নি, ঘট ইত্যাদি রাখা হইবে না।

(৩) অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে যে সকল মন্ত্র মুদ্রিত হইবে, কেবল তাহাই পঠিত হইবে এবং তদ্ভিন্ন অন্য কোনও মন্ত্র উচ্চারিত হইতে দেওয়া হইবে না।

(৪) মন্ত্রগুলির কোনও অংশ বর্জ্জিত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

অতঃপর, কন্যা ও তৎপক্ষীয়দিগের কুচবিহার যাত্রার আয়োজন হইতেছে এমন সময়ে কন্যাপক্ষকে কুচবিহার হইতে তারযোগে বলিয়া পাঠান হইল যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি তখনও পর্য্যবেক্ষিত হয় নাই অতএব উহা যেন মুদ্রিত না হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার, কন্যা ও তৎসহযাত্রিগণের স্পেশ্যাল ট্রেন কলিকাতা হইতে ছাড়িবার কথা ছিল। শনিবার রাত্রে তারে সংবাদ আসিল যে বিবাহ-পদ্ধতির অন্তঃপ্রবিষ্ট ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন হইতে দেওয়া হইবে না। উহার প্রতিবাদ রবিবার তারযোগে কুচবিহার প্রেরিত হইল এবং পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত নিয়মসমূহের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইল; স্পেশ্যাল ট্রেন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবও করা হইল। তদুত্তরে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জানাইলেন যে ট্রেনের বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়সমূহের পরিবর্ত্তন এক্ষণে অসম্ভব। তখন কেশববাবু সোমবারেই বিশেষ ব্যস্ততার সহিত সপরিবারে ও বন্ধুবর্গসমেত বেলা এগারটার ট্রেনে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইতে "বাধ্য" হইলেন; কেন বাধ্য হইলেন, তাহার কোনও কারণ তাঁহার পক্ষ সমর্থনে উক্ত হয় নাই এবং আমরাও তাহা অনুমান করিতে অক্ষম!

সমাজ-সংস্কারকদিগের অগ্রণীর কন্যার বিবাহ যে উচ্চ আদর্শানুসারে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, কেশব বাবু যখন কুচবিহারের কিশোরবয়স্ক মহারাজার সহিত তাঁহার বালিকা কন্যার পরিণয় প্রস্তাবে সম্মত হন, তখনই তাঁহাকে সেই উচ্চ আদর্শ পরিহার করিতে হইয়াছিল। যিনি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ অবৈধ করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়া রাজবিধি দ্বারা বর ও কন্যার ন্যূনকল্প বয়স ক্রমান্বয়ে পূর্ণ অষ্টাদশ ও পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ ধার্য্য করাইয়াছিলেন, তাঁহার স্বীয় কন্যার বিবাহ তাহার দৃষ্টান্তস্থল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইলেও, বিবাহের অব্যবহিত পরেই মহারাজাকে বিলাত যাত্রা করিতে হইবে এই শর্ত থাকায়, সাধারণতঃ বাল্যবিবাহ যে সকল কারণে নিন্দনীয়, এই বিবাহে সে সকল কারণ অনেক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের নেতার কন্যার বিবাহ যে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া উচিত, কেশব বাবু যখন একজন অগঠিত চরিত্র এবং তৎকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে অদীক্ষিত হিন্দুকুলোদ্ভব রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্ম বিবাহের সেই উচ্চ আদর্শও পরিহার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি হিন্দু বিবাহ পদ্ধতিকে পৌত্তলিকতাবর্জ্জিত করিয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্ম পদ্ধতি সন্নিবেশিত করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে, তাঁহার কন্যার বিবাহ, উচ্চ ও বিশুদ্ধ আদর্শের ব্রাহ্ম বিবাহ না হউক, এক প্রকার ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে

হোমাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির অঙ্গীভূত, সুতরাং উহা বর্জ্জন করিলে হিন্দু বিবাহের বৈধত্ব বজায় থাকিবে না এই আশঙ্কায় গবর্ণমেন্ট কুচবিহারের রাণীদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেশববাবুর মতানুবর্ত্তন করিতে সাহস করেন নাই।

যখন কুচবিহারের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান সমূহ অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়া হইবে না, তখন কেশব বাবু কোন্ সাহসে কন্যা লইয়া কুচবিহার যাত্রা করিলেন? তিনি যেন জানিয়া শুনিয়া সিংহের গুহায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের কেবল এইখানেই শেষ হয় নাই। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, বুধবার, প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরে, কন্যা বা কন্যাযাত্রীরা কুচবিহারে পঁহুছিয়া শুনিলেন যে তাঁহাদের প্রকাশ্য অভ্যর্থনার কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই; তখন তাঁহাদের মনে সন্দেহ হইল যে ইহার কোনও নিগূঢ় কারণ আছে। অনুষ্ঠান-পদ্ধতির কথা পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত হইলেও কেহ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না; তথাপি, ররিবার, কন্যার যথাবিধি গাত্রহরিদ্রা ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিন্তু তাহার পরদিন, সোমবার, মহারাণীদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, রাজ-সভার প্রধান পণ্ডিত সমভিব্যাহারে, কন্যাপক্ষের আবাসে উপনীত হইয়া অনেকগুলি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহার বলিলেন, কেশব বাবুকে বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, যিনি যজ্ঞোপবীত বর্জ্জন করিয়াছেন এমন কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে এবং যিনি ব্রাহ্মণ নন এমন কাহাকেও বৈবাহিক অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে দেওয়া হইবে না; উক্ত উপলক্ষে কোনও রূপ ব্রাহ্ম উপাসনা হইতে দেওয়া হইবে না; বর ও কন্যা কোনও রূপ বৈবাহিক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং উভয় পক্ষকেই হোম করিতে হইবে। এই সকল প্রস্তাব শুনিয়া কেশব বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ বিস্ময়াভিভূত হইলেন। বিস্তর বাদানুবাদ হইল, কিন্তু তাহার বিশেষ ফল কিছুই হইল না—রাজপণ্ডিত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর দিবস, মঙ্গলবার (বিবাহের পূর্ব্বদিন), অধিবাসের জন্য কন্যাকে রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে হইবে; মহা সমারোহের সহিত তাহার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। বিবাহের পদ্ধতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ সত্ত্বেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেশব বাবু কন্যাকে রাজবাটীতে যাইতে অনুমতি দিয়া তাঁহাকে বিবাহ কালাবধি রাজান্তঃপুররুদ্ধা করিলেন।

অধিবাসাদি বিবাহের পূর্ব্বানুষ্ঠান সমূহ দস্তুর মত হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা এ সম্বন্ধে ১৮৭৮ সালের ১৫ই মার্চ্চের "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্" সংবাদপত্রে প্রকাশিত একখানি পত্রের কিয়দংশ কুমারী কলেট্-সম্পাদিত ১৮৭৮ সালের "ব্রাহ্ম ইয়ার্-বুক্" হইতে মর্ম্মার্থ সহ, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"......On Tuesday, the 5th instant, the bride was conducted to the Rajbari with pomp and splendour suiting the occasion, and the *Adhibash* ceremony performed in strict accordance with Hindu rites.

The next morning the ceremonies of *Nandimookha* and *Sraddha* were performed by Kumar Surendra Narayan on behalf of the bridegroom, as is the usual custom with the Raj family. At noon the bride had to purify herself by *Prayaschitta*, and to distribute some gold to the Brahmins. At night the *bagdan* ceremony was first of all performed by Babu Krishna Bihari Sen, in lieu of his elder brother, Babu Keshub Chunder, the latter being incompetent to perform the ceremonies on account of his visit to Europe. The bridegroom was then taken into the inner apartments, and the *Stri-Achar* ceremony performed by the female relations of the bride.

The Raja and his bride were then conducted to the *Bibaha Mandap*, and Babu Krishna Bihari made over the bride to the Raja before a *Ghat* in the usual form, and the ceremony of *Homa* was last of all performed.

Yours, &c.,
An Eye-Witness."

"......মঙ্গলবার, ৫ই তারিখে, কন্যা যথোচিত সমারোহের সহিত, রাজবাটীতে নীত হইলেন, এবং অধিবাস ক্রিয়া ঠিক হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইল।

পর দিবস, প্রাতে, রাজবংশের প্রচলিত প্রথানুসারে, কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ, বরপক্ষে, নান্দীমুখ ও শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাধা করিলেন। মধ্যাহ্নে, কন্যাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে এবং ব্রাহ্মণদিগকে কিয়ৎ পরিমাণ সুবর্ণ দান করিতে হইয়াছিল। রাত্রিকালে, সর্ব্বপ্রথমে, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, তাঁহার অগ্রজ কেশববাবুর পরিবর্ত্তে, বাগ্দান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কেশববাবু, বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত অনুষ্ঠানের অযোগ্য। তদনন্তর, বরকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল এবং তথায় কন্যার স্বসম্পর্কীয়ারা স্ত্রী-আচার বিধি সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে, বর ও কন্যা বিবাহ-মণ্ডপে নীত হইলেন এবং কৃষ্ণবিহারী বাবু একটি ঘটের সম্মুখে, প্রচলিত বিধি অনুসারে, রাজাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে, হোম অনুষ্ঠিত হইল।

জনৈক চাক্ষুষ-সাক্ষী।"

বিবাহ-রাত্রিতেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পদ্ধতি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। আমরা শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে" উদ্ধৃত

প্রতাপবাবু-কৃত বিবাহ-বর্ণনাটি, মর্ম্মার্থ সহ, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই দীর্ঘ প্রসঙ্গের উপসংহার করিলাম :—

"......So hour after hour was spent in fruitless disquisitions, and nobody knew what the result of it was to be; whether indeed the marriage was going to take place at all; till at about midnight the concession was made that the bride's party only should take no part in the idolatrous ceremonies. Keshub was in a state so unusual with him, so absolutely helpless, so abjectly despondent during these hours, that he at once and eagerly accepted the concession as far as it went, and seemed content to escape barely with the observance of his principles. But he was little prepared for what awaited him at the scene of marriage. The scared vessels, *ghats*, which he had tried to exclude by his supplementary conditions, were there and even two still more obnoxious symbols were there. Of course these were not worshipped, nor meant for worship, but their presence was not agreeable to theistic eyes. Protests were made, but to no purpose. The Brahmo service when attempted was drowned by deafening peals of innumerable tom-toms. Keshub and non-Brahmin priests on his side were allowed to preside over the ceremonies. The marriage vows were not allowed to be taken at the scene of the marriage, but were taken afterwards. Hom, the ceremony of fire-worship, was not performed by Keshub's daughter, but by the Maharaja. The theistic character of the marriage was very much marred : almost every Brahmo present was deeply mortified."

"এইরূপে বৃথা বাদানুবাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল; উহার ফল যে কি দাঁড়াইবে—বিবাহ হইবে কি হইবে না—তাহাও কেহ জানিত না। পরিশেষে, প্রায় অর্দ্ধরাত্রে, এই অনুগ্রহটুকু প্রদর্শিত হইল যে কেবল কন্যাপক্ষকে কোনও পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হইবে না। কেশবের এই সময়ে এরূপ অভূতপূর্ব্ব অবস্থা ঘটিয়াছিল, তিনি একেবারে এরূপ নিরুপায় ও নৈরাশ্যনিবন্ধন এত আত্মসম্মানবিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে এই সীমাবদ্ধ অনুগ্রহটুকুও তিনি তৎক্ষণাৎ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন। এরূপ বোধ হইল যেন তিনি কোনও গতিকে স্বীয় মূল মতানুবর্ত্তন বজায় রাখিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন। কিন্তু বিবাহস্থলে উপনীত হইয়া তাঁহাকে যাহা দেখিতে হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ঘট রাখা হইবে না বলিয়া তিনি পরিশেষে যে নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, দেখিলেন তদ্বিপরীতে কতকগুলি পূজার ঘট রহিয়াছে এবং দুইটি আরো আপত্তিজনক পৌত্তলিক চিহ্ন রহিয়াছে। এগুলি অবশ্য পূজিত হয় নাই এবং পূজার জন্যও রাখা হয় নাই, কিন্তু ব্রাহ্মের দৃষ্টিতে ইহাদের উপস্থিতি প্রীতিকর হয় নাই।

প্রতিবাদ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনও ফল হয় নাই। ব্রাহ্মমতে উপাসনা করিবার উদ্যম হইবামাত্র অসংখ্য ঢাক ঢোলের বধিরতা-বিধায়ক শব্দে তাহা বিলীন হইয়াছিল। কেশব ও তাঁহার পক্ষের অব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগকে অনুষ্ঠানসমূহে অধ্যক্ষতা করিতে দেওয়া হইয়াছিল। বিবাহস্থলে বর ও কন্যাকে বিবাহকালীন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ইহা পরে গৃহীত হইয়াছিল। কেশবের কন্যাকে হোম (অগ্নি-পূজা) করিতে হয় নাই, কিন্তু মহারাজাকে করিতে হইয়াছিল। বিবাহের ব্রাহ্মভাব বহুল পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল; উপস্থিত ব্রাহ্মেরা প্রায় সকলেই অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন ”

কুচবিহার-বিবাহের পরিণাম যে এরূপ হইবে, আমাদিগের বিশ্বাস, কেশব বাবু পূর্ব্বে তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার কন্যার বিবাহ বাস্তবিকই হিন্দুমতে সম্পন্ন হইল, এবং সেই অব্রাহ্ম বিবাহ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার দীর্ঘকাল নীরব থাকা উচিত হয় নাই। তিনি যদি সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ করিয়া নিজের ভ্রম স্বীকার করিতেন, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহা হইলে সকল গোলযোগ সহজেই মিটিয়া যাইত এবং বর্ত্তমান সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজেরও সৃষ্টি হইত না। কিন্তু কেশববাবু তাহা করিলেন না; ফলতঃ, তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি এতদিন যে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন তাহা অচিরাৎ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি কুচবিহার হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে পর, বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক ও ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক, প্রতাপ বাবুকে দুইখানি পত্র লিখিয়া প্রার্থনা করিলেন যে উক্ত সমাজের সম্পাদক ও উক্ত মণ্ডলীর আচার্য্য কেশব বাবুর আচরণ আলোচিত হইবার জন্য সমাজের ও মণ্ডলীর স্বতন্ত্র সভা আহূত হউক। দুইখানি প্রার্থনা-পত্রই অগ্রাহ্য বলিয়া ফেরত হইল। কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্য কেশব বাবু ও সম্পাদক প্রতাপ বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব প্রার্থিত মণ্ডলীর সভা বৃহস্পতিবার ২১শে মার্চ্চ তারিখে ব্রহ্মমন্দিরে আহ্বান করিলেন। উক্ত সভায় কে সভাপতি হইবেন প্রথমতঃ তাহা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। কেশব বাবুর পক্ষীয়েরা তাঁহাকেই সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু প্রতিবাদকারীরা তাহাতে এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে কেশব বাবুর আচরণই যখন সভার বিচার্য্য বিষয় তখন তাঁহাকে কিরূপে সভাপতি করা যাইতে পারে। প্রতিবাদকারীরা বাবু দুর্গামোহন দাসকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব [illegible]লেন এবং অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে, বহু বাগ্বিতণ্ডার পর, পরিশেষে তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। কেশব বাবু ও তাঁহার পক্ষীয়েরা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন এবং সেনবংশীয় কতিপয় যুবক ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ হট্টগোল করিয়া

সভার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু প্রতিবাদকারীরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কেশব বাবু আচার্য্যের পদ হইতে বিচ্যুত হইলেন এবং পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু শিবচন্দ্র দেব, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পর্য্যায় ক্রমে আচার্য্যের কর্ম্ম করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

পরবর্ত্তী রবিবার, মন্দিরের বেদি লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। আমরা সেই লজ্জাজনক ব্যাপারের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে অনিচ্ছুক। পুলিশের সাহায্য লইয়া কেশব বাবু মন্দির দখল করিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষেরা অন্যত্র সাপ্তাহিক উপাসনার বন্দোবস্ত করিলেন।

অতঃপর, শিবচন্দ্র, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের একটি বিশেষ সভা আমন্ত্রণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রতাপ বাবুকে পুনর্ব্বার কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে, যখন সকল চেষ্টাই বিফল হইল, তখন পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্ম সমাজ সমিতি, নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে একটি বিশুদ্ধ ও স্বতন্ত্র সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মফস্বল সমাজ সমূহের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে অধিকাংশ সমাজ ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন।

তদনুসারে, ১৮৭৮ সালের ১৫ই মে তারিখে, কলিকাতার টাউনহলে, ব্রাহ্মদিগের একটি প্রকাশ্য সভা আহূত হয়। ঐ সভায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সৃষ্টি হয় এবং বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু শিবচন্দ্র দেব ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

কেশব বাবু এতদিন পরে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি প্রতিবাদকারীদিগের সকল কথায় ক্রমাগত উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া কাজ ভাল করেন নাই; অতটা বাড়াবাড়ি না করিলে, তাঁহার সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি সমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা হইত না। টাউনহলে সভা হইবার পূর্ব্ব দিন, ১৪ই মে তারিখে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক প্রতাপ বাবু (নিঃসন্দেহ কেশব বাবুর আদেশানুসারে) শিবচন্দ্রকে এক দীর্ঘ পত্র ["২০" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ] লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ অসাম্প্রদায়িক এবং উহার সভ্যদিগের মধ্যে অধুনা সামান্য মতভেদ ঘটিলেও সমাজ এক ও অবিভাজ্য, অতএব স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত হইতে পারে না; সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক নিজের মতে কার্য্য করেন—সম্প্রদায়ের মত গ্রহণ করেন না—বলিয়া তাঁহার উপর যে দোষারোপ করা হইয়া থাকে তাহা ঠিক নহে, তিনি সম্প্রদায়ের যুক্তিসঙ্গত মতানুবর্ত্তন করিতে কখনও

বিলম্ব করেন নাই; সাধারণের বর্ত্তমান উত্তেজিত মনোভাব নিবন্ধন প্রস্তাবিত প্রকাশ্য সভা আহূত হয় নাই, ছয়মাস পরে কি তৎপূর্ব্বে শান্তি সংস্থাপিত হইলেই, প্রস্তাবিত সভা আমন্ত্রণ করা হইবে এবং সেই সভাকর্ত্তৃক, সমাজের একত্ব বজায় রাখিয়া, বর্ত্তমান বন্দোবস্তের যে কোনও যুক্তিসঙ্গত সংস্কার প্রস্তাবিত হইবে, তাহা পূর্ণ সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হইবে।

বলা বাহুল্য যে প্রতাপ বাবুর পত্রে যে সকল অসার যুক্তি ও স্তোকবাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল তদ্দ্বারা কেহই নূতন সমাজ স্থাপনের সঙ্কল্প হইতে অনুমাত্র বিচলিত হন নাই। প্রত্যেক যুক্তি খণ্ডন করিয়া শিবচন্দ্র ১৮ই মে তারিখে উক্ত পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলেন ["২১" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ], তাহার উদারতাপূর্ণ শেষভাগের মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রকটিত হইল :—

"সে সকল কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। আপনারা যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন তাহা হইলে আমি বলি যে নূতন সমাজ গঠনে যোগদান করিবার সময় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আপনারা যদি আমাদের গত্যন্তর রাখিতেন তাহা হইলে নূতন সমাজ গঠনের সঙ্কল্প কখনই আমাদের মনে উদয় হইত না। এখন আমরা যখন পরস্পর পৃথক্ হইলাম, তখন আমাদের মধ্যে অন্য কোনও রূপ আত্মবিরোধ থাকিবার কোনও কারণ নাই। কার্য্যক্ষেত্র অতীব বিশাল এবং আমাদের সকলের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের উভয়ের একই লক্ষ্য। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে পারি কিন্তু তজ্জন্য আমাদের সাধারণ কার্য্যের কোনও প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত। আপনাদের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া কাজ করিতে করিতে যদি আমি মরিতে পারিতাম তাহা হইলে সেইটিই আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের মুহূর্ত্ত হইত; কিন্তু পরম পিতার ইচ্ছা যে আমরা পৃথক্ হইব এবং একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য একত্রে কার্য্য না করিয়া পৃথক্ ভাবে কার্য্য করিব। আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া একই গম্য স্থানে উপনীত হইবার প্রয়াসী। যদি আমরা আপনাদের অভিপ্রায় ও কার্য্যসমূহের ভুল বিচার করিয়া থাকি, ভগবান্ আমাদিগকে ক্ষমা করুন! যদি আপনারা আমাদের অভিপ্রায় ও কার্য্যসমূহের ভুল বিচার ও ভুল অর্থ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ই আপনাদিগকে মার্জ্জনা করুন! ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে আমাদের উভয়ের পথ ভিন্ন ভিন্ন দিকে, কিন্তু একস্থান-গামী। দয়াময় পিতা আপনাদিগকে ও আপনাদের আত্মীয় স্বজনকে আশীর্ব্বাদ করুন!"

শিবচন্দ্রের প্রকৃত মনোভাবই উপরে ব্যক্ত হইয়াছে। কুচবিহার-বিবাহের ন্যায় গুরুতর ব্যাপারের পর কেশব বাবুর আচরণে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য একটি নিয়মতন্ত্র স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন

ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কেবল কঠোর-কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই, নিতান্ত অনিচ্ছায়, তিনি উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নতুবা কেশববাবুর প্রতি কিম্বা তাঁহার দলের কাহারও প্রতি তাঁহার কখনও কোনও রূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব হয় নাই।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের" কিয়দংশ, ভাবার্থসহ, উদ্ধৃত করিতেছি :—

"He [Babu Shibchandra Deb] kept himself in close touch with Keshub Chunder Sen and his party and went on helping them with his contributions and otherwise. One distinguishing trait of his character was that he was a lover of culture and kept pace with progressive ideas. Accordingly, when the Kuch Behar marriage controversy broke out, he at once came forward to express his sympathy with the protesters and gave his adherence to their cause. The protesting party at once took advantage of that sympathy and placed him at their head as one of their leaders. He was modest and good, kind and courteous, punctual and methodical in his ways and almost an ideal in his domestic and social virtues. Indeed it was a great good fortune to the protesting party to have him amongst them at that time and to place themselves under his guidance.

After the schism his house at Konnagar became something like a place of pilgrimage to the members of the new Samaj. They would often flock there to be inspired by his example of earnest piety, in-born humility, wide range of knowledge, methodical performance of the minutest duties of life, moderation in speech and conduct and constant attention to the good of others. Indeed he was the living embodiment of an ideal Brahmo life."

"কেশব বাবু ও তাঁহার দলের সহিত বাবু শিবচন্দ্র দেবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি তাঁহাদিগকে অর্থ দ্বারা ও অন্য প্রকারে সাহায্য করিতেন। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ এই ছিল যে, তিনি আত্মোৎকর্ষসাধনপ্রিয় ছিলেন এবং জগতের মত সমূহের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং অগ্রসর হইতেন। অতএব, যখন কুচবিহার-বিবাহ লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি অবিলম্বে প্রতিবাদকারীদিগের সহিত তাঁহার সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রতিবাদকারীরা তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিজ দলের অন্যতম নেতা বলিয়া শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বিনয়ী ও সদাশয়, দয়ালু ও সৌজন্যবিশিষ্ট ছিলেন; তিনি যথাসময়ে ও শৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য্য করিতেন; এবং তিনি পারিবারিক ও সামাজিক সদ্‌গুণনিচয়ে আদর্শকল্প ছিলেন। বস্তুতঃ, সে

সময়ে তাঁহাকে স্বদলে পাইয়া ও তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, প্রতিবাদকারীরা পরম সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

মতভেদের পর তাঁহার কোন্নগরস্থ ভবন নূতন সমাজের সভ্যগণের পক্ষে এক প্রকার তীর্থস্থান সদৃশ হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহার ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্বভাবসিদ্ধ বিনয়, প্রশস্ত জ্ঞান-বিস্তার, জীবনের সূক্ষ্মতম কর্ত্তব্যগুলিরও শৃঙ্খলাসহপালন, মিতভাষিতা, মিতাচার ও পরহিতসাধনে নিরন্তর মনোনিবেশ প্রত্যক্ষ করিয়া সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার জন্য সর্ব্বদা তথায় যাইতেন। বস্তুতঃ তিনি আদর্শ ব্রাহ্মজীবনের জীবন্ত মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন।”

মতভেদ নিবন্ধন যে সকল উন্নতিশীল ব্রাহ্ম কেশব বাবুর দল পরিত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ সংগঠনে বদ্ধপরিকর হন, শিবচন্দ্রই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের অধিনায়ক হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সভাপতির পদ গ্রহণ না করিয়া সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা দ্বারা তাঁহার পরিশ্রমের কিঞ্চিন্মাত্র লাঘব হয় নাই। নূতন দল সংগঠনের সময় প্রকাশ্য সভায় যে বাগ্মিতার প্রয়োজন, শিবচন্দ্রের তাহা ছিল না, সুতরাং বাবু আনন্দমোহন বসু, বয়সে শিবচন্দ্রের পুত্রস্থানীয় হইলেও, সে সময়ে তাঁহাকে সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিবচন্দ্র যুগপৎ ঔদার্য্য ও সদ্বিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বাবু যেমন সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন, তেমনি আবার অসাধারণ বিনয়ী ছিলেন। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দুই বৎসর মাত্র, অর্থাৎ ১৮৭৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত, উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ দুই বৎসর শিবচন্দ্র সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে (বাং ১১ই মাঘ, ১২৮৪ সাল) যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হয়, তখন শিবচন্দ্রই উক্ত সমাজের প্রাচীনতম সভ্য বলিয়া, ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর, শিবচন্দ্র ১৮৮০ হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত, একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর উক্ত পদে বৃত হইয়াছিলেন। একাদিক্রমে পাঁচ বৎসরের অধিককাল সভাপতি থাকা নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া, তিনি ১৮৮৪ সালের পর এক বৎসর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই; ঐ বৎসর, অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন। তৎপরে, উপর্য্যপরি দুই বৎসর, অর্থাৎ ১৮৮৬ ও ১৮৮৭ সালে, শিবচন্দ্র পুনর্ব্বার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে (১৮৮৮ সালে), তিনি শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অসুস্থতা-নিবন্ধন, সভাপতিত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

শিবচন্দ্র পাঁচ বৎসর সভাপতির কার্য্য করিয়া যখন ১৮৮৫ সালে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তদুপলক্ষে উক্ত সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখের বার্ষিক

অধিবেশনে যে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া লিপিবন্ধ হইয়াছিল, আমরা তাহা, মর্ম্মার্থসহ, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"Resolution

Proposed by Mr. A. M. Bose.
Seconded by Pandit Siva Nath Sastri.
Supported by Babu Umesh Chandra Datta
and
Carried by acclamation

That in bidding farewell to Babu Shib Chandra Deb, the venerable President of the Sadharan Brahmo Samaj, on his retirement after 5 years' tenure of office, the meeting wishes to record its love and admiration for his personal character and its grateful appreciation of his unselfish and devoted labours during a long career in public and private life in the cause of social, intellectual and religious progress amidst many difficulties and discouragements, and at a time when helpers were few and obstacles numerous; and this meeting trusts that it will please Providence to spare him yet for many years to carry on his work with unabated zeal and help the Samaj by his mature experience, noble example and wise guidance."

"প্রস্তাব—

মিঃ এ. এম. বসু কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত।
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনুমোদিত।
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সমর্থিত।
এবং
সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন সভাপতি, বাবু শিবচন্দ্র দেব, পাঁচ বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময়, এই সভা, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি ইঁহার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা লিপিবন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, এবং তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া, তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জীবনে, নানা বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও, এবং যে সময়ে সহায়তাকারীর সংখ্যা অত্যল্প এবং প্রতিবন্ধকের সংখ্যা অত্যধিক ছিল এরূপ সময়ে, সামাজিক, মানসিক ও ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ ভাবে যে সকল পরিশ্রম করিয়াছেন, এই সভা তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেও ইচ্ছা করেন এবং আশা করেন যে বিধাতার কৃপায় তিনি

এখনও অনেক বৎসর জীবিত থাকিয়া অপ্রশমিত উৎসাহ সহকারে তাঁহার কার্য্য করিতে থাকিবেন এবং তাঁহার পরিপক্ক অভিজ্ঞতা, মহৎ দৃষ্টান্ত ও বিজ্ঞ পরিচালনা দ্বারা এই সমাজের সহায়তা করিবেন।"

১৮৮১ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। উহার সবিস্তার বর্ণনা শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-বিরচিত "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে" দ্রষ্টব্য। আমরা তাহার কিয়দংশমাত্র, ভাবার্থসহ, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"......Slowly they approached the Mandir door, where they found old Shib Chandra Deb, the President of the Samaj, standing with the keys in his hand, ready to open the door for them. The sight of the venerable old leader, a glow with emotion and lost in an attitude of thanksgiving and prayer, enkindled the zeal of the singers a good deal and the singing before the mandir became quite rapturous and maddening. The singing over, Babu Shib Chandra Dev, offered a short prayer and opened the doors of the Church to admit the congregation. In an instant every creek and corner of the spacious hall was crammed with eager worshippers......"

"......তাহারা [নগরসঙ্কীর্ত্তনকারীরা] ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দেখিল যে, সমাজের সভাপতি বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব তাহাদিগের জন্য দ্বার খুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া তথায় চাবি-হস্তে দণ্ডায়মান। আন্তরিক ভাবপ্রদীপ্ত এবং বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ প্রদানের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সেই ভক্তিভাজন প্রাচীন নেতাকে দেখিবাবমাত্র সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগের উৎসাহানল অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং মন্দিরের সমক্ষে সঙ্কীর্ত্তন একেবারে প্রাণ মাতাইয়া দিল। সঙ্কীর্ত্তন শেষে, বাবু শিবচন্দ্র দেব একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিলেন এবং তৎপরে উপাসকমণ্ডলীর প্রবেশের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই বিস্তীর্ণ হলের প্রত্যেক অংশ আগ্রহান্বিত উপাসক ও দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইল।"

উপরোক্ত প্রার্থনাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর। অদ্য আমরা এই নব গৃহে প্রবেশার্থী হইয়া এই দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। এই পবিত্র সময়ে তুমি আমাদিগকে আশ্রয় দাও। যে গৃহে জাতি, বর্ণ অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল নরনারী তোমার পূজা করিয়া শান্তি ও পবিত্রতা লাভ করিবে, অদ্য আমরা সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইব, যেখানে আমাদের ন্যায় তোমার অনেক দুর্ব্বল সন্তান মস্তক রাখিয়া যুড়াইবে, সেই গৃহে অদ্য আমরা স্থান প্রাপ্ত হইব। তুমি আমাদের ধর্ম্মপথের নেতা, আমরা অপর নেতা জানি না। তুমি আমাদের

সহায় হইয়া এই গৃহকে সুসম্পন্ন করিয়াছ, অদ্য আমরা তোমার পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক এই গৃহে প্রবেশ করিতেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যে সকল আশা করিয়া এই গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছি যেন তাহা পূর্ণ হয়। যে ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের আত্মার সদ্‌গতি ও মানবের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইবে, সেই ধর্ম্ম দেশমধ্যে প্রচার করিবার জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত করিলে, আমরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইয়া এই দ্বারে অদ্য প্রবিষ্ট হইব।

দীনবন্ধু! দেখিও এই গৃহে যেন তোমার পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। তোমার শুভ ইচ্ছা এখানে জাগ্রত থাকিয়া যেন আমাদের সকলের মুক্তির উপায় বিধান করে। যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়, যাহারা সরল প্রাণে তোমার অনুগত হইবার ইচ্ছা করে, যাহারা সকল প্রকার স্বার্থ ও অভিসন্ধি বিসর্জ্জন করিয়া তোমার কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তুমি যে তাহাদের সহায়, এই গৃহই তাহার পরিচয় দিতেছে। জগদীশ! যাহাকে অল্প দেও, সে যে অধিক আশা করিয়া থাকে। আমরা আশা করিতেছি, যে তোমার কৃপাতে যে কেবল আমরা সুন্দর ঘর পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু তোমার কৃপাতে আমরা ধর্ম্মরাজ্যেও অভয়পদ প্রাপ্ত হইব। তুমি আমাদের অন্তর বাহিরের সকল প্রকার বিঘ্ন বাধা পরিহার করিবে। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই আশা পরিপূর্ণ হয়।

জগদীশ্বর! অদ্য আমরা তোমার নামে এই গৃহকে উৎসর্গ করিতেছি। তুমি এই শুভ কার্য্যে আমাদের সহায় হও। অদ্য হইতে তোমার পবিত্র নাম প্রচারের জন্য এই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই গৃহ এখানকার উপাসকগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের এবং দেশমধ্যে তোমার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারের উপায় স্বরূপ হয়। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

আমরা কেবল ১৮৮১, ১৮৮২, ১৮৮৩, ১৮৮৪ ও ১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে শিবচন্দ্র কর্ত্তৃক পঠিত সভাপতির অভিভাষণগুলিই সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। [‘২২’, ‘২৩’, ‘২৪’, ‘২৫’, ‘২৬’ চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ]। ১৮৮৫ সালের অভিভাষণ অদ্যাবধি অসংগৃহীত। ১৮৮৪ সালের অভিভাষণে শিবচন্দ্র মহাত্মা কেশবচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট ব্রাহ্ম সমাজের ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ সালের অভিভাষণে তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণে কথার উল্লেখ করিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে যদিও গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিজের নিরতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র, তথাপি তাঁহার কতকগুলি বিষয়ে যেরূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি তৎকর্ত্তৃক

প্রচারকের পদ-পরিত্যাগ গ্রহণ করিয়া উচিত কার্য্যই করিয়াছেন। তবে পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রকাশ্যভাবে বিচ্ছিন্ন হইলেও, গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সমাজের সভ্যগণের প্রীতিযোগ ও সখ্যভাবের কোনওরূপ ব্যত্যয় হয় নাই।

"ব্রাহ্ম ইয়ারবুক্" গ্রন্থের সম্পাদিকা কুমারী কলেট্ সাত বৎসর ধরিয়া (অর্থাৎ ১৮৮০ হইতে ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত) উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলনে সাহায্যার্থ শিবচন্দ্রকে বহুসংখ্যক পত্র লিখিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে সে সকল পত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া আমরা তাহা এই জীবনীতে সন্নিবেশিত করিলাম না।

আমরা এতক্ষণ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত শিবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। এক্ষণে কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণাদির যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিব। উক্ত সমাজের উপাসনাদি সমস্ত কার্য্য শিবচন্দ্রের আবাস-বাটীতে যদিও এতাবৎকাল সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, তথাপি সাধারণের ব্যবহারার্থ একটি স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বোধ হওয়াতে, ঐ উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য ১৮৭১ সালে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু চাঁদা সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায়, মন্দির গঠন কার্য্য ১৮৭৭ সালে আরম্ভ হইয়া ১৮৭৮ সালের শেষে সমাপ্ত হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মাণকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪৬৭্ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল; তন্মধ্যে শিবচন্দ্র নিজে ১,০০০্ টাকা, তাঁহার পরিবার ৫০্ টাকা এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০০্ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যয়ের মোট সংখ্যা ৩,৩০৯্ টাকা দাঁড়াইয়াছিল, অর্থাৎ সংগৃহীত অর্থের অতিরিক্ত ৮৪২্ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই কথা দৈবাৎ মহর্ষির কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতার বশবর্ত্তী হইয়া, বিনা প্রার্থনায়, পুনর্ব্বার ৮০০্ টাকা দান করিয়াছিলেন।

মন্দির নির্ম্মাণের জন্য শিবচন্দ্র কেবল অর্থদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি এতদর্থে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ষোল কাঠার কিঞ্চিদধিক পরিমাণ ভূমি, ৬৫০্ টাকায় ক্রয় করিয়া, দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছয় কাঠা জমির উপর উচ্চপোতা ও স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারার্থ গ্যালারি বিশিষ্ট একটি প্রশস্ত ও উচ্চ প্রার্থনা-হল বা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট খালি জমির কিয়দংশে আচার্য্য বা প্রচারকগণের বাসার্থ কতিপয় ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ন্যূনাধিক পাঁচ শত টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থায়ী আচার্য্যরূপে কয়েক বৎসর উক্ত গৃহে সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন এবং তৎপরে ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ও বৎসরাধিককাল তথায় বাস করিয়া আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই গ্রামবাসিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের বিশিষ্টরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় কোন্নগর পরিত্যাগ করিলে পর, আর কেহ নিবাসী-আচার্য্য হইতে সম্মত হন নাই। আচার্য্য-নিবাসের গৃহগুলি ব্যবহৃত না হওয়ায় ক্রমে কালসহকারে অব্যবহার্য্য ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। সুতরাং সেগুলিকে পরিশেষে সমভূম করিতে হইয়াছে।

কতিপয় আনুষ্ঠানিক ও উৎসাহী ব্রাহ্ম কোন্নগরে আসিয়া বাস করিলে তত্রত্য ব্রাহ্ম-সমাজের ভূয়সী উন্নতি হইবে, এই আশায় শিবচন্দ্র তাঁহাদের বাসের সুবিধা করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তদনুসারে ৺কেদারনাথ রায় মহাশয় কোন্নগর বাস করিবেন বলিয়া নব নির্ম্মিত মন্দিরের সন্নিহিত ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী শিবচন্দ্রের একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শিবচন্দ্র সানন্দে কেদারবাবুর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের আশা পূর্ণ হয় নাই। কেদারবাবু পরে কোন্নগর বাস করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বাটী হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৯ সালের ৮ই মার্চ্চে (বাং ২৫শে ফাল্গুন, ১২৮৬ সাল), ফাল্গুনী পূর্ণিমা (দোল-পূর্ণিমা) তিথিতে, নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং নব-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বে ঐ উৎসব দারুণ গ্রীষ্মকালে—জ্যৈষ্ঠমাসের ১৫ই তারিখে (সমাজ-প্রতিষ্ঠার দিনে)—হইত বলিয়া সকলকে গ্রীষ্মজনিত, এবং কখন কখন বাত্যা-জনিত, অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সেই অসুবিধা পরিহারার্থ, এখন হইতে সমাজের উৎসব প্রতিবৎসর দোল-পূর্ণিমা তিথিতে (অর্থাৎ মন্দির-প্রতিষ্ঠার তিথিতে) অনুষ্ঠিত হইবার বন্দোবস্ত হইল।

মন্দির প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পূর্ব্বে, শিবচন্দ্র একখানি ট্রষ্ট-ডীড (অর্পণ-নামা) প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত পাঁচজন ভদ্রলোককে মন্দির-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ট্রষ্টী (অছি) নিযুক্ত করিয়াছিলেন :—

বাবু	আনন্দমোহন বসু,	কলিকাতা।
"	উমেশচন্দ্র দত্ত,	"
"	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,	কোন্নগর।
"	সাতকড়ি দেব,	"
"	সত্যপ্রিয় দেব,	"

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন উক্ত ট্রষ্ট্-ডীড্ খানি স্বাক্ষরিক হইয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পরে উহাকে রীতিমত রেজিষ্টারি করা হইয়াছিল।

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন শিবচন্দ্রের ভবনে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানও হইয়াছিল— ঐ দিবস তাঁহার জ্যেষ্ঠা পৌত্রী নির্ম্মলার নামকরণ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল। শিবচন্দ্রের ভবনে, তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর জীবদ্দশায়, যে কয়েকটি পারিবারিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মমতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

অনুষ্ঠান কাল	অনুষ্ঠান বিবরণ
১৮৫৬ সাল	শিবচন্দ্রের পুত্র সত্যপ্রিয়ের নামকরণ।
১৮৬৫ সাল	শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠ জামাতা ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের পুত্র জ্ঞানচন্দ্রের নামকরণ।
১৮৭৬ সাল—(৩১শে আগষ্ট)	শিবচন্দ্র পুত্র সত্যপ্রিয়ের বিবাহ।
১৮৭৮ সাল—(২৮শে এপ্রেল)	শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পৌত্রী নির্ম্মলার জাতকর্ম্ম।
১৮৭৯ সাল—(৮ই মার্চ্চ)	শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পৌত্রী নির্ম্মলার নামকরণ।
১৮৮৫ সাল—(১৬ই নবেম্বর)	শিবচন্দ্রের পৌত্র শান্তিপ্রিয়ের জাতকর্ম্ম।
১৮৮৬ সাল—(২৪শে এপ্রেল)	শিবচন্দ্রের পৌত্র শান্তিপ্রিয়ের নামকরণ।
১৮৯১ সাল—(২০শে ডিসেম্বর)	শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠা পৌত্রী অমলার জাতকর্ম্ম।
১৮৯২ সাল--(২রা অক্টোবর)	শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠা পৌত্রী অমলার নামকরণ।
১৮৯২ সাল—(৫ই অক্টোবর)	শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পৌত্রী নির্ম্মলার বিবাহ। (ঢাকা নিবাসী ৺ব্রজসুন্দর মিত্রের পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র প্রসাদ মিত্রের সহিত)

কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের সপ্তদশ বার্ষিক উৎসবের দিন (৩রা চৈত্র, ১২৮৭ সাল) "কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজ ঘাটের" প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ঘাটের চাঁদনী বিশিষ্ট চাতালেই ৺কেদারনাথ রায় মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। সেই বসন্ত-সমীরণ-সেবিত ভাগীরথীতটে কেদারবাবুর বক্তৃতাটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এরূপ ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান সচরাচর হয় না বলিয়া, আমরা নিম্নে প্রতিষ্ঠা পত্রের একখানি প্রতিলিপি দিলাম :—

"কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজ ঘাট প্রতিষ্ঠাপত্র।

অদ্য শকাব্দ ১৮০২, বঙ্গাব্দ ১২৮৭, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২ বর্ষে চৈত্রের তৃতীয় দিবসে মঙ্গল বাসরে পূর্ণিমা তিথিতে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রীতিকাম হইয়া কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা অম্বিকা

দেবজায়া স্বীয় ব্যয়ে এই ঘাট প্রতিষ্ঠা করিলেন। জাতি, ধর্ম্ম ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে স্নানাদি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনার্থ ইহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। যদি এই ক্ষুদ্র ঘাট দ্বারা একটি শ্রান্ত পথিকের পথশ্রান্তি দূর হয়, একটি তাপিত কলেবর ব্যক্তির শরীর সুস্নিগ্ধ হয়, একটি তৃষ্ণার্ত্ত জীবের পিপাসা শান্তির উপায় হয়, এবং একটি প্রাণীরও কোন প্রকার হিত সাধন হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশ্য সফল হইবে। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর এই মনস্কামনা সিদ্ধ করুন্।

হে মঙ্গলবিধাতা পরম দেবতা! তোমার অনন্ত মঙ্গল ইচ্ছা এই সম্মুখস্থ গঙ্গা স্রোতের ন্যায় নিয়তকাল প্রবহমান হইতেছে এবং সর্ব্বকাল সকল জীবের অশেষ কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। তোমার সেই মঙ্গল ইচ্ছার সাক্ষ্য দান করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরস্থ বালুকা কণার ন্যায় এই ঘাটটী প্রতিষ্ঠিত হইল। তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ ইহার উপর বর্ষণ কর; ইহা যেন তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পাদনের সহকারিতা করিতে পারে। কালের তরঙ্গে মনুষ্যের হস্ত নির্ম্মিত পদার্থ এবং মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত কার্য্য ভগ্ন ও বিলীন হইয়া যাইবে, কিন্তু হে দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর! যে শুভ সঙ্কল্প দ্বারা এই ক্ষুদ্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, তাহা তুমি গ্রহণ কর এবং তাহার উপর তোমার প্রসন্নতা প্রকাশ কর; তাহা হইলে তোমার চিরসেবিকার সকল আশা পূর্ণ হইবে। হে দয়াময় পিতা! তোমার প্রসাদে বহু দিনের সঙ্কল্পিত এই শুভ কার্য্য যে অদ্য সম্পন্ন হইল, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাভরে তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার করি।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থ শিবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী এই ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

নূতন মন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার সহসা উপস্থিত হইয়া সান্ধ্য উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বনামধন্য কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রবাবুও (যিনি অধুনা ডাক্তার সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে জগদ্বিখ্যাত) একবার, পিতৃবন্ধু শিবচন্দ্রের অনুরোধে, নূতন মন্দিরে, কোনও বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে, স্বরচিত কতিপয় ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পর, উক্ত সমাজের সহিতই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল এবং সেই ঘনিষ্ঠতা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নূতন ট্রষ্টী নিয়োগের ভার শিবচন্দ্রের অভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপর ন্যস্ত আছে। এখন শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিয়মিতরূপে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ প্রতি বৎসর

হইতে বিমুক্ত করিয়া তোমার প্রেমাস্বাদনে ও তোমার প্রিয়াকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত কর। হৃদয়েশ্বর! তোমাকে মনের সহিত নমস্কার করি। শান্তিঃ শান্তিঃ।

সায়ংকালের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! আমাদের জীবনের এক দিবস গত হইল। অদ্য মোহবশতঃ পাপাসক্ত হইয়া তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার যাহা কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, তজ্জন্য কাতরভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি, যে হে করুণাময়! আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, এবং তোমার সাহায্য প্রদান কর, যেন সেই সকল পাপে আর নিপতিত না হই। দিন দিন যেন আমাদের চিত্ত তোমার সন্নিহিত হইতে থাকে। অদ্য যে সকল সুখ সম্ভোগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে বারবার নমস্কার করি।"

শেষ

শিবচন্দ্রের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদসমূহে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার জীবনাবসানের কথা, যতদূর সংক্ষেপে পারি, বলিবার চেষ্টা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৮৭৫ সালের শেষভাগে কোন্নগরে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া-ঘটিত জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর পরে উহার হ্রাস হইয়াছিল। উক্ত বৎসরেই শিবচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রথম সূত্রপাত হয়। তিনি জ্বরাক্রান্ত হন নাই বটে, কিন্তু একটি বিষম পৃষ্ঠব্রণ তাঁহাকে ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত শয্যাশায়ী করিয়াছিল। শেষোক্ত বৎসরের আগষ্ট মাসে তাঁহার পুত্রের বিবাহ হয়। ঐ ঘটনার অল্পকাল পরে তাঁহাকে ম্যালেরিয়ার ভয়ে সপরিবারে কোন্নগর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মির্জাপুরে একখানি বাগান-বাটী ভাড়া করিতে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও কলিকাতায় বাটী ভাড়া করিয়া তথায় সপরিবারে বাস করেন নাই। পর বৎসরও (১৮৭৭ সালে) তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইয়াছিল। উক্ত বৎসর তিনি কলিকাতা বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে একখানি বাটী ভাড়া করিয়া কয়েক মাস তথায় বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি কয়েকবার উৎকট ম্যালেরিয়া-জ্বর ভোগ করিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ ও ডাক্তার জগবন্ধু বসুর সমবেত চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন। কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি ১৮৭৮ সালে দুকড়ি বাবুর অনুরোধে তাঁহার সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনে গিয়া বাস করেন এবং তথায় থাকিয়া কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ সংগঠন ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহ সহকারে যোগদান করেন। বস্তুতঃ তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক ও সভাপতিরূপে কয়েক বৎসর যে সমস্ত শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার মনের বলেই করিয়াছিলেন, নতুবা সে সময়ে তাঁহার শরীর দিন দিন ভগ্ন হইতেছিল।

১৮৮১-৮২ সালে তিনি আমাশয়, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে বহুদিন ধরিয়া কষ্ট ভোগ করেন। সেই সময় হইতে তিনি ডাক্তারের পরামর্শানুসারে প্রত্যহ পাঁচ ফোটা "টিঙ্কচর্ ওপিয়াই" খাইতে আরম্ভ করেন। উক্ত ঔষধ নিয়মিতরূপে সেবন করিয়া তিনি কয়েক বৎসর ভাল ছিলেন, কিন্তু ১৮৮৮ সালের শেষভাগে আবার ঐ রোগ দেখা দেয় এবং অবশেষে ঐ রোগেই দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৮৮ সালের জুলাই মাসে তিনি যে সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে তখন তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না, তাঁহার বিশেষ কোন রোগ ছিল না, তবে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতেন। ঐ বৎসরের শেষে তিনি তাঁহার উইল (শেষ নিয়োগপত্র) প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জন্যও একখানি উইল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। উভয় উইলই বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। এস্থলে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে শিবচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা ছিল যে দলিলাদি ইংরাজি ভাষায় রচিত না হইয়া বাঙ্গালায় লিখিত হইলে, মোকদ্দমার সংখ্যার হ্রাস বই বৃদ্ধি হইবে না। তিনি নিজে বাঙ্গালা দলিল রচনা করিতে বিশেষ পটু ছিলেন। আমরা উক্ত উইল দুইখানির যে অংশে ধর্ম্ম ও সাধারণ হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

শিবচন্দ্রকৃত ১৮৮৮ সালের ৯ই ডিসেম্বরে উইল হইতে উদ্ধৃত।

"আমার ত্যাজ্য কোম্পানীর কাগজের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার কোং কাগজ নিম্নলিখিত ধর্ম্ম ও সাধারণ হিতকর কার্য্যের সাহায্যার্থ নিযুক্ত থাকিবে যথা—

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার ফণ্ডের সাহায্যার্থে—	৫০০্
কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের নিয়মিত ব্যয়ার্থ—	২০০০্
ঐ সমাজের বার্ষির উৎসবে প্রীতিভোজনের ব্যয়ার্থ—	১০০০্
কোন্নগর ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, বঙ্গ বিদ্যালয় ও সাধারণ পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থে—	১৫০০্
মোট	৫০০০্

উক্ত পাঁচ হাজার টাকার কোং কাগজ ট্রষ্টী স্বরূপ আমার পুত্র শ্রীমান্ সত্যপ্রিয় দেবের নিকট থাকিবে, তিনি সময়ে সময়ে ঐ টাকার সুদ আনাইয়া উল্লিখিত বিষয় সকলে ব্যয় করিবেন। বিশেষতঃ যে তিন স্কুল ও পুস্তকালয়ের জন্য মোট এক হাজার পাঁচশত টাকা বরাদ্দ হইল তাহার সুদ যে বিদ্যালয়ের যেমত অভাব ও প্রয়োজন হইবে তদনুসারে উক্ত ট্রষ্টী প্রদান করিবেন। ঈশ্বর না করুন

উক্ত ব্রাহ্ম-সমাজ বা স্কুল প্রভৃতির মধ্যে যদি কোনটির কার্য্য বিলুপ্ত হয় তাহা হইলে তৎসম্বন্ধীয় টাকার সুদ অপর কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।"

শ্রীমতী অম্বিকা দেব-কৃত ১৮৮৮ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখের
উইল হইতে উদ্ধৃত।

"১ দফা। কোন্নগর গ্রামে আমার স্বামী মহাশয়ের বাটীতে এক্ষণে যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপিত হইয়া রোগীদিগের ব্যবহার জন্য প্রত্যহ ঔষধ বিতরণ করা যাইতেছে, তাহা স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে ৬০০০্ ছয় হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ট্রষ্টী স্বরূপ আমার পুত্র শ্রীসত্যপ্রিয় দেবের জেম্মায় থাকিবে এবং উপস্থিত বন্দোবস্ত মত যতদিন আমার পুত্র স্বয়ং ঔষধ বিতরণ করিবেন, ততদিন তিনি ঔষধের মূল্য বাদে উক্ত ছয় হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ পাইবেন। যদি সত্যপ্রিয় দেব স্বয়ং ঔষধ বিতরণ না করেন কিম্বা করিতে অক্ষম হন, তবে এবং তাঁহার অভাবে কার্য্য করিবার জন্য একজন উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে হইবেক। ঔষধের মূল্য বাদে উক্ত ৬০০০্ টাকার কাগজের সুদ হইতে চিকিৎসকের বেতন দেওয়া যাইবে। উক্ত চিকিৎসক সত্যপ্রিয় দেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেক; সত্যপ্রিয়ের অভাবে তাঁহার স্থলবর্ত্তী এক্‌জিকিউটর বা ট্রষ্টী ঐ চিকিৎসকের কার্য্যে সক্ষম হইলে নিজে করিবেন নচেৎ অন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করিবেন।

২ দফা। আমার পিতা ৺বৈদ্যনাথ ঘোষের নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে কোন্নগর ইংরাজী বিদ্যালয়ে "বৈদ্যনাথ ছাত্র" উল্লেখে একটি ছাত্রের স্কুলিং ফি দিতে হইবে, এবং আমার মাতা ৺ভৈরবী দাসীর নাম চিরঃস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে কোন্নগর বঙ্গ বিদ্যালয়ে "ভৈরবী ছাত্র" উল্লেখে একটি ছাত্রের স্কুলিং ফি দিতে হইবে।

ঐ দুইজন ছাত্রের ফি দিবার জন্য এবং কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যের জন্য ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার জন্য, ও স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং অন্যান্য দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সাহায্যের জন্য, আমার ৩০০০্ তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ট্রষ্টী স্বরূপ আমার পুত্র শ্রীমান্ সত্যপ্রিয় দেবের নিকট থাকিবে, তিনি সময়ে সময়ে উক্ত টাকার সুদ আনাইয়া তাহা হইতে উক্ত দুই ছাত্রের বেতন দিয়া অবশিষ্ট টাকা উপস্থিত অভাব ও প্রয়োজন অনুসারে উপরিউক্ত অপর কার্য্যের জন্য ব্যয় করিবেন। আমার পিতৃবংশীয় কোন বালককে, তদভাবে গোপালনগরস্থিত অপরবংশীয় কোন বালককে, তদভাবে কোন্নগর নিবাসী কোন বালককে "বৈদ্যনাথ ছাত্র" এবং "ভৈরবী ছাত্র" করা যাইবে।"

১৮৮৯ সালে শিবচন্দ্র উদরাময় ও আমাশয় রোগ কিয়ৎকাল ভোগ করিয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। এবার তিনি তাঁহার পঞ্চম জামাতা ৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের শঙ্কর ঘোষ লেনস্থিত একখানি ভাড়াটিয়া বাটীতে তিন মাস বাস করিয়া আহীরীটোলা নিবাসী ৺শ্যামকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসায় রোগমুক্ত হন এবং কোন্নগরে ফিরিয়া যান।

১৮৯০ সালে শিবচন্দ্র প্রবল জ্বররোগাক্রান্ত হন এবং সেই জ্বর ক্রমে অতিসারে পরিণত হয়। তখন তিনি চিকিৎসার জন্য পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন, এবং পরে ঐ ষ্ট্রীটেই ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী একখানি বাটী ভাড়া করেন। সেই বাটীতেই মহাপ্রাণ শিবচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়াও শিবচন্দ্র এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সহিষ্ণুতা ও প্রকৃতি-মাধুর্য্য হারান নাই। শেষদিন পর্যন্ত সকলকে মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং কোনও ভৃত্যের প্রতিও একটি পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

তাঁহাকে দেখিলে কেহ তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিত না। তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন না—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিলেন; তিনি নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ ছিলেন, কিন্তু নিরতিশয় কৃশ ছিলেন। তাঁহার মুখশ্রীতে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। সচরাচর যাহা প্রখর বুদ্ধির পরিচায়ক—উন্নত বা প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, শুকচঞ্চুবৎ নাসিকা—এ সকল তাঁহার ছিল না। তাঁহার পক্কগুম্ফাচ্ছাদিত ওষ্ঠেও তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইত না। তাঁহার নিবিড় শুভ্র ভ্রূযুগসমন্বিত কোমলতাপূর্ণ চক্ষু দুইটিতেই কেবল তাঁহার অমায়িক সারল্য ও বিশ্বপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার প্রশান্ত ও সহাস্য মুখখানিতে কি এক সহানুভূতি মাখান ছিল যে, শিশুরাও নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইত; তিনিও সাতিশয় শিশু-প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় শিশুহৃদয়জ্ঞ অল্পই দেখা যায়। তাঁহার ন্যায় লোকহিতৈষীও প্রায় দেখা যায় না। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সম্প্রতি নদীয়া জেলার বন্যা হওয়ায় যাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে তাহাদের দুঃখমোচনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে কিনা এবং জানাইয়াছিলেন যে তিনি নিজে যৎকিঞ্চিৎ চাঁদা দিতে প্রস্তুত। তাঁহার লোকহিতৈষণা কেবল স্বগ্রামে আবদ্ধ ছিল না; অন্যত্র দুর্ভিক্ষাদি দুর্দ্দৈব ঘটনার সংবাদ পাইলেই সাধ্যানুসারে তথায় চাঁদা পাঠাইতেন।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মহাত্মা শিবচন্দ্রের জ্ঞানের বা স্বভাবের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। যে দিনের রাত্রি তাঁহার জীবনের শেষ রজনী, সেই দিন প্রাতে আমরা

তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। অল্পকাল পূর্ব্বে "স্যাল্‌ভেশন্ আর্মির" সৃষ্টিকর্ত্তা জেনারেল বুথের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে "ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার" নামক ব্রাহ্মসংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবচন্দ্রের অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই প্রবন্ধটি পড়িয়া শুনাইলে তিনি জেনারেল বুথের বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করিলেন এবং আমাদিগকে বারবার ধন্যবাদ দিলেন। আমরা তাঁহাকে উক্ত সংবাদপত্রের আরও কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইতে চাহিলে, তিনি, পাছে আমাদের কাজের ক্ষতি হয় এই ভয়ে, শুনিতে ইচ্ছা থাকিলেও, আমাদিগকে পড়িতে নিষেধ করিয়া বিদায় দিলেন। হায়! তখনও যাঁহার পরদুঃখে এরূপ সহানুভূতি এবং তখনও যিনি আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে সামান্য সেবা গ্রহণ করিতেও এত কুণ্ঠিত, আমরা একবারও ভাবি নাই যে পরদিন প্রাতে তাঁহাকে আর জীবিত দেখিতে পাইব না। ১৮৯০ সালের ১২ই নবেম্বর (বাং ২৭শে কার্ত্তিক, ১২৯৭) বুধবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, শিবচন্দ্র দিব্যধামে চলিয়া যান। পূর্ব্ব রাত্রে আসন্ন মৃত্যু মহাপুরুষের পরিজনবর্গ কেহই নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। সমস্ত রাত কালীপূজার বাজি পোড়ান শব্দ পাছে মুমূর্ষুর কাণে যায় এই ভয়ে কর্ণকুহরে তূলা দেওয়া হইয়াছিল; মস্তক ঈষদুত্তানভাবে বালিসে স্থাপিত; হাত দুটি বক্ষের উপর যুক্ত; নেত্রদ্বয় রজনীর শেষভাবে ক্রমশঃ নিমীলিত হইয়া আসিল। কিন্তু তখনও মহাপুরুষের এমন জ্ঞান ছিল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রোদনের উপক্রম করিবামাত্র, তিনি একখানি হাত প্রসারিত করিয়া বলিলেন "স্থি—", অর্থাৎ "স্থির হও"। ক্রমে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সব স্থির হইয়া গেল।

প্রত্যুষে মৃত্যু হওয়াতে, শিবচন্দ্রের দেহত্যাগের সংবাদ তাঁহার দূরস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণের নিকট পঁহুছিতে বিলম্ব হইয়াছিল। যাঁহারা নিকটে ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়া, উপাসনান্তে, শবদেহের সঙ্গে শিবচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে নিমতলার শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তথায় ৺কেদারনাথ রায় মহাশয় মহাত্মা শিবচন্দ্রের শবদেহ নামাইয়া প্রাণস্পর্শী উপাসনা করিয়াছিলেন। সৎকারান্তে সকলেই শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছিলেন। সে সময়ে সকলের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা শিবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ কালে তাঁহার পুত্রবধূ-বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি হইতে বেশ উপলব্ধি হইবে :—

১

"উঠ উঠ প্রিয় বন্ধু আত্মীয় স্বজন,
খসিল যে আমাদের উজ্জ্বল রতন,
মহাত্মা ধর্ম্মের খনি, ব্রাহ্মসমাজের মণি,

স্বদেশের সমুজ্জ্বল মুকুট ভূষণ,
জিতেন্দ্রিয় সত্যনিষ্ঠ পুণ্য প্রস্রবণ।

২

ভাসায়ে স্বদেশবাসী আজি হাহাকারে
চলিলেন ধর্ম্মবীর ভবসিন্ধু পারে,
বিনা গর্ব্ব আড়ম্বরে, জীবনের কার্য্য ক'রে,
কাটায়ে জীবন দীর্ঘ, ছাড়ি ধরাধাম,
লভিবারে বিভুক্রোড়ে অনন্ত বিরাম।

৩

আয়রে আয়রে তোরা আয় ছুটে আয়
বিমল ঊষার বায়ু ওই লয়ে যায়
হরিয়া অমূল্য ধনে, সেই ব্রহ্ম নিকেতনে,
গেল বুঝি এতক্ষণে, এস একবার
ঢালি তাঁর ও চরণে ভক্তি অশ্রুধার।

৪

দেবতা বাঞ্ছিত সেই অমূল্য জীবন
দিয়াছিল বিধি তাঁরে করিতে যাপন;
একটি কলঙ্ক রেখা, কভু নাহি যায় দেখা
ও শুভ্র জীবন ক্ষেত্রে বিমল স্বভাবে
সকলি বিশুদ্ধ বিভু করুণা প্রভাবে।

৫

মানব জীবন সার সদ্‌গুণ নিচয়
তাহাতে ভূষিত তাঁর সমগ্র হৃদয়;
কোন্ গুণ মনে ক'রে, কাঁদিব গো সমস্বরে,
সকলি সকলি গুণ, গুণের ভাণ্ডার
বিরাজিত একাধারে এমন কাহার!

৬

ক্ষমা, সহিষ্ণুতাময় কোমল স্বভাব,
নাহি জানিতেন রাগ, দ্বেষ, মন্দ ভাব;
বিনয়ে সবার সনে, অতি ধীর আলাপনে,
পরিমিত বাক্যে, সদা আনন্দ বদনে
পরিতৃপ্ত করিতেন উচ্চ নীচ জনে।

৭

আর সে মধুর বাণী না শুনিব হায়!
আর কিরে জুড়াব না সান্ত্বনা কথায়?
সুমধুর উপদেশ, শূন্য কপটতা লেশ,
স্বরগের বাণী ব'লে এবে মনে হয়,
সুপবিত্র সুকোমল সরলতাময়।

৮

যখন জীবন শেষ মুহূর্ত্ত কেবল
তখনও দেশ হিত কামনা সকল,
জাগ্রত জ্বলন্ত রূপে, অস্থিমজ্জা, লোমকূপে
রহে প্রতি গ্রন্থিমাজে প্রত্যেক নিশ্বাসে,
প্রত্যেক ধমনী শিরে প্রত্যেক প্রশ্বাসে।

৯

কয়জন এ সংসারে ধর্ম্মপরায়ণ
করেছেরে তাঁর সম কর্ত্তব্য পালন;
বাহ্যান্তর সমভাব, মহান্ নিঃস্বার্থ ভাব,
প্রশংসা প্রয়াস শূন্য কয়টী হৃদয়,
না দেখিরে আছে হেন খুঁজে দেশময়।

১০

দেখালেন যিনি এই আদর্শ জীবন
দেবতা বলিয়া তাঁরে পূজিব এখন,
সে চরণ ধূলি মেখে, আদর্শ সম্মুখে রেখে,
করিব করিব মোরা জীবন যাপন
ভুলিব না কি অমূল্য ও মহাজীবন।

১১

কোন্নগরের রবি আজি অস্ত যায়;
আর কিরে কোন কালে হইবে উদয়?
ওই শুন চারি ধারে, সবে কয় হাহাকারে,
কোথা গো সংসারী ঋষি অনাথের নাথ
এ গ্রাম সৌভাগ্য ভ্রষ্ট হ'ল তব সাথ।

১২

কাঁদিছে কতই হায় দরিদ্র অনাথ,
কাতরে তাঁহার তরে শিরে দিয়ে হাত।
কাহারে বিদায় দিতে, এমন বিষণ্ণ চিতে,
কাঁদেরে নগর গ্রাম ক'রে হাহাকার;
কাঁদে বঙ্গবাসীদের হৃদয় সবার।

১৩

কাঁদিল অবনী আজ, হাসিল অমর,
প্রকাশি পুণ্যের ছটা, শ্রেষ্ঠতম নর,
মোদের ফেলিয়া দূরে, গেলেন অমর পুরে,
রাখিলেন চির তরে অনন্ত গৌরব
সংসারে সুরভি সার সুনাম সৌরভ।"

স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, শিবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী তাঁহার সুদীর্ঘ কেশপাশ ছেদন করিয়া ফেলেন এবং যে তিন চারি বৎসর জীবিত ছিলেন, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যসাধনে তাহা অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিবাহের প্রকৃত মর্ম্ম তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের ৩৭ বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইলে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দেন নাই। বৈধব্যদশায় তাঁহার স্বামীর সহিত সম্বন্ধ এক মুহূর্ত্তের জন্যও শিথিল হয় নাই। তিনি প্রতিনিয়ত কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন,—"কে আর তেমন করিয়া আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন ও আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন?"—এবং যতদূর পারিতেন, স্বামীর অভিলষিত পথে চলিতে চেষ্টা করিতেন ও অহোরাত্র কেবল ব্রহ্মনাম জপ করিতেন।

স্বামীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর কলিকাতায় একখানি বাটী এক বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়া তথায় অল্পকাল মাত্র বাস করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি আমাদিগকে শিবচন্দ্রের একখানি জীবনী সঙ্কলন করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ তখন আমরা সে অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। এখন মনে হয়, যদি আমরা কোনও গতিকে সতীর মনস্কামনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে এই জীবনীও অপেক্ষাকৃত পূর্ণাবয়ব হইত; কারণ, যাঁহারা শিবচন্দ্রকে ভালরূপ জানিতেন তাঁহাদের অনেকে সে সময়ে জীবিত ছিলেন। কিন্তু এখন এ অনুশোচনা বৃথা!

স্বামীর সহিত কবে পারলৌকিক পুনর্মিলন হইবে এই চিন্তাই সাধ্বীর হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক ছিল। পরিশেষে যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইলেন, তখন তাঁহার

আনন্দের অবধি ছিল না; কেবল ভয় করিতেন পাছে রোগ সারিয়া যায় এবং মৃত্যু না হয়—বলিতেন "ঝড় আসিয়াছে, মেঘ কাটিয়া না যায়।" স্বামীর সহিত ত্বরায় মিলিত হইবেন এই আনন্দে অধীর হইয়া মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কন্যাদিগকে তাঁহার বৈধব্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোরা ত আমাকে একখানি রাঙ্গাপেড়ে কাপড় পরাইয়া তাঁহার কাছে পাঠাইতে পার্‌লি না, কিন্তু তাহাতে আমার দুঃখ নাই, এই বিশুদ্ধ বেশই তাঁহার মনোনীত।"

তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের ভবনের প্রায় সম্মুখবর্ত্তী একখানি ভাড়াটিয়া বাটীতে পক্ষাধিক কাল তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধুময়ী প্রকৃতি রোগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাতেও কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি তাঁহার শুশ্রূষাকারিণীদিগকে "যাদু", "ধন", ইত্যাদি মিষ্ট সম্বোধন ভিন্ন অন্য সম্বোধন করেন নাই।

মৃত্যুকালীন রোগশয্যাতেও সেই সাধ্বী প্রতিদিন দুটি বেলা যথা সময়ে ঈশ্বরোপাসনা করিতে ভুলেন নাই। বিকারে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, কিছুরই ঠিক ছিল না। তথাপি প্রতিদিন ঠিক উপাসনার সময়ে উঠিয়া বসিয়া, যোড় করে, ভক্তিভাবে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" উচ্চারণ করিতেন। মৃত্যু যতই সন্নিহিত হইতে লাগিল, ততই তিনি মহানন্দে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ব্রহ্মনাম গান ও ব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বাহ্যিক সংজ্ঞা হারাইয়াও ব্রহ্মনাম জপ করিতে বিরত হন নাই। পাছে ঐ নাম ভুলিয়া যান, এইজন্য তাঁহার এক প্রিয় দুহিতাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "আসন্ন কালে আমাকে ব্রহ্মনাম শুনাইতে ভুলিও না।" তাঁহার আদেশ যথাকালে পালিত হইয়াছিল। নামামৃত পান করিতে করিতে তিনি "আবার আবার" এই কথাটি বারম্বার উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দুই এক দিন পূর্ব্বে তাঁহার এক প্রিয় দুহিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মা! আমাদিগকে এত ভালবাসিতে, এখন আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে তোমার মন কেমন করিতেছে না?" তাহাতে তিনি "না" বলিয়া উত্তর দেন। বস্তুতঃ তিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন।

১৩০১ সালের ২৮শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, রথের পুনর্যাত্রার দিনে তাঁহার মহাযাত্রা হইয়াছিল। মৃত্যুর পরেও তাঁহার মুখের প্রশান্ত ভাবের কোনও রূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে বলিতেন, "যেখানে আমার স্বামীর দাহ হইয়াছিল সেইখানেই যেন আমার চিতা সাজান হয় যদি আমার কোন্নগরে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার মৃতদেহ যেন নৌকা করিয়া নিমতলার ঘাটে আনা হয়।" সতীর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়াই যেন যে দিন তাঁহার সৎকার হয়, সে দিন নিমতলার শ্মশান ঘাটে সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে অপর একটিও শব আনীত হয় নাই। শ্মশানভূমির এরূপ শান্তিময় দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনাও

উল্লেখযোগ্য। সতীর কণ্ঠলগ্ন একটি স্বর্ণনির্ম্মিত মাদুলিতে তাঁহার স্বামীর চিতাভস্মের কিয়দংশ সংরক্ষিত ছিল। দাহকালে কেহ উহা লক্ষ্য করিয়া অপসারিত করে নাই; সুতরাং ঐ ভস্ম সতীর চিতাভস্মের সহিত মিশিয়া গিয়া প্রকারান্তরে সহমরণ প্রথার অনুকরণ করিয়াছিল।

বিশ্বমাতা লোকশিক্ষার জন্যই যেন সেই আদর্শ দম্পতীকে এই মর্ত্ত্যধামে পাঠাইয়াছিলেন এবং ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইলে স্বীয় স্নেহক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবনের অমূল্য শিক্ষা প্রত্যেক নরনারীর জীবনপথের আলোক হউক, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

AUTOBIOGRAPHY

To SATYA PRIYA DEB

My Dear Son,

The accompanying short account of my life has been written for you in the hope that you may derive some benefit from its perusal. You will perceive that, without possessing any talent, how I have got on in the world. My regular and diligent habits, my patience and perseverence, my honesty and integrity of purpose, are under God's providence the causes of my success. What I have considered as my duty, I have always endeavoured to discharge it faithfully That the Almighty and merciful God may grant you success in your career, may preserve you in virtuous life and enable you to be useful to society is the earnest prayer of

Konnagar,
25th June, 1889

Your most affectionate father
Shib Chunder Deb

AUTOBIOGRAPHY

My father, the late Babu Brajakisor Deb, was a respectable man of Konnagar, a populous town within the Serampore Municipality. He was not a man of education, but had an ordinary knowledge of the vernacular, and could read and speak English pretty fluently. The latter qualification he acquired by his constant intercourse with Military officers, having been employed for a long time in the Army, as a Sircar, a very useful post in those days. After a long and faithful service under Government, he retired in his old age on a small pension. He was courageous, energetic and strict in his conduct.

His habits were very temperate and regular. He used to take his meals and do other daily business at fixed hours from which he seldom deviated. To be punctual in these matters he always kept a watch by his side. He was of course an orthodox Hindu, and died in 1846 at an advanced age of 95 years.

He had four sons (Bhairab Chandra, Mahes Chandra, Isvar Chandra, Shib Chandra) of whom I was the youngest, being born at Konnagar on the 6th Sraban 1733 Sak, or 20th July 1811. The first died in 1833, the third in 1855 and the second in 1876.

EDUCATION

I was never sent to any school for vernacular education as there was no such institution in the village at the time, but was taught, by a Gurumahasay employed by my father, in Bengali reading, writing and arithmetic of the commonest description.

When I was about 10 years old, I began to learn at home a little of English from my late cousin Babu Madan Mohan Mitra. This part of my education consisted of spelling and reading lessons, and the meaning of words learnt by heart.

At 11, I lost my mother, and spent my time idly for two years after that event. But when I heard that good English Schools had bene established at Calcutta, I felt a great desire to study in one of them. Although my father was very fond of me, yet I had not courage enough to speak to him on the subject, as he was naturally of a hot temper. In this difficulty I requested my cousin Babu Uma Charan Deb to draw up an application for me (in English) addressed to my father, soliciting him to send me to some School at Calcutta. The petition being ready, and finding my father asleep at noonday, I put in on his writing box, which was always kept by his side. When he awoke, he read the application, and having sent for me, expressed his willingness to comply with my request.

I was sent to Calcutta in November 1824, when I was 13 years old. I lived in the house of a relative, the late Babu Ramnarayan Ghosh of Hatkhola, and attended a private school kept there by one Mr. Read, for a period of about eight months. Not being satisfied with the instruction I receive there, I begged of my father to send me to the Hindu College, which he consented to do. Accordingly I was admitted into

the 7th class of that institution as a Pay scholar on the 1st August 1825, when I was 14 years old.

I studied in the Hindu College for six years and five months, of which, the latter two years I was in the First class, and held a scholarship of Rs. 16/- a month. Having obtained a Certificate of Proficiency I quitted the College on the 20th December 1831. Among my college friends and fellow-students may be mentioned Babu Hara Chandra Ghosh, Rasik Krishna Mallik, Revd. K. M. Banerji, Ram Gopal Ghosh, Radha Nath Sikdar, Dakshina-ranjan Mukherji, Ramtanu Lahiri, Peary Chand Mitter and others. Babu Hari Mohan Sen was an intimate friend of mine, to whom I was much indebted for many kind offices done to me. While in the College, Hari Mohan and myself jointly published a Bengali translation of a portion of the Arabian Nights' Entertainments.

SERVICES

I entered into Government Service as a Computer in the Great Trigonometrical Survey of India, on a salary of Rs. 30/- per mensem, which was raised to Rs. 40/-. In this capacity I served the Government up to 20th February 1838, when I was appointed a Deputy Collector in Balasore on the nomination of the Board of Revenue.

Previous to my obtaining this appointment, I had passed an examination in Surveying, and had bene pronounced qualified by the Surveying Committee appointed by Government for employment in the subordinate branch of the Revenue Survey Department.

In Balasore I was employed in Settlement and Resumption duties for upwards of six years, with credit to myself and satisfaction to my superiors in office, and was promoted from the 3rd to the 2nd grade on the 9th January 1844.

In May 1844, I was transferred to Midnapore, in which district I was engaged in the settlement of Sudder Mehals and petty resumptions, conduct of Butwaras and collection of Khas estates, besides assisting the Collector in various duties of his office. I was promoted to the 1st grade on the 15th February 1849.

In January 1850, I was transferred to the 24-Pergunnahs, where I was in charge of the collections of Panchannagram and other Khas estates, the arrangement of the Records, and the miscellaneous duties

of the Collectorate, including Rent cases, and valuation of lands taken for public purposes.

Originally there were only three grades of Deputy Collectors, and the salary attached to the first was Rs. 450/-, that to the second Rs. 350/-, and to the third Rs. 250/-. The officers were promoted after a term of five years' service in each grade. In 1853 the Board of Revenue made a classification of these officers, dividing them into 5 classes according to merit, and the salary fixed for the 1st class was Rs. 700/-, that for the 2nd class Rs. 600/- and so on to the last grade, the salary in which was Rs. 200/-. By this classification I was placed in the 2nd class on the 6th March 1854, and my salary was gradually raised from Rs. 450/- to Rs. 600/-.

About this time I was employed in obtaining lands for a new Canal from Baliaghata to the Hughli river at Chitpore.

In May 1857, while travelling in a Railway carriage in company with some European gentlemen, I was led by them to a conversation on the subject of the Mutiny then raging in the N. W. Provinces, and some expressions, which inadvertently fell from me, were construed by those gentlemen into disaffection towards the British Government, and sympathy with the mutineers. On the report of the above gentlemen the Government called upon me to give an explanation, which being submitted with testimonials of my character, it decided that the language used by me was disrespectful to the Government, and therefore warned me not to repeat such indiscretion

On the 29th November 1858, my services were placed at the disposal of the Railway Commissioner, Mr. W. Ainslie, for the acquisition of lands required for the Eastern Bengal Railway. At the conclusion of this work in March 1860, I availed myself of three months' privilege leave, and took a trip with my friend the late Babu Peary Chand Mittra to the Upper Provinces for the benefit of my health

On the expiration of my leave I rejoined the 24-Pergunnahs Collectorate. I was promoted to the first class of Subordinate Executive Officers on the 10th December 1859.

The Government was pleased to appoint me a Deputy Magistrate with the powers of a covenanted Assistant to a Magistrate on the 24th March 1860.

On the 19th September of the same year, I was appointed Deputy Collector of Calcutta in addition to my appointment in the 24-Pergunnahs, so that I held my office at Alipore and Calcutta on alternate days.

Being in a very bad state of health, I retired from the Government Service on the 1st January 1863, on a superannuation pension of Rs. 330/8/- per mensem, which was a moiety of my average salary of the last five years.

In 1865 I was appointed one of the Municipal Commissioners of Serampore under Act III of 1864. This office I held up to March 1878, when I resigned it in consequence of my bad health, and my resignation was accepted by the Lieutenant Governor of Bengal on the 6th Mary 1878.

On the 4th July 1871, I was appointed Sub-Registrar of Serampore, in which office I continued till April 1872, when I resigned the post, having suffered in health from the daily journey I had to perform from Konnagar to Serampore, and the remuneration not being sufficient for the trouble.

On the 4th June 1872, I was appointed Registrar of Marriages under Act III of 1872 for the district of Hughli. This post I resigned in December 1887, and my resignation was accepted by Government on the 13th February 1888.

On the assumption of the title of "Empress of India" by the Queen Victoria on the 1st January 1877, a Certificate of Honour was granted to me by the Lieutenant Governor of Bengal, under the orders of the Viceroy of India.

In February 1880, I became one of the Directors of the Bengal Banking Corporation, from which office I retired in 1882.

MATTERS—DOMESTIC

My marriage with the second daughter of the late Babu Baidyanath Ghosh of Gopalnagar in the District of Hughli took place in April 1826, when I was 15 years and she 9 years old. This early marriage was of course settled and agreed to by the parents of both the parties, in which I had no voice. But thank God I have never had any reason to be dissatisfied with the match; on the contrary, I have always considered myself fortunate in having a wife who is in every respect deserving of love. Her natural good sense, her virtuous disposition, and her devotedness to me are beyond all praise. The issues of the marriage were six daughters and one son.

My first daughter, Káilas Kámini, was born at Konnagar on the 19th Ashar 1242 B.S. The second daughter, Mokshadá, was born at Mariali, a village in the District of Balasore, on the 6th Magh 1246 B.S. Third daughter, Binodá, was born at Balasore on the 7th Bhadra 1250 B.S. Fourth daughter, Kshirodá, at Midnapore on the 7th Chaitra 1252 B.S. Fifth daughter, Kshemadá at the same place on the 2nd Paush 1254 B.S. and the sixth daughter Ramá Sundari, at Konnagar on the 29th Kartik 1256 B.S.

My only son Satya Priya Deb was born at Konnagar on the 7th Sraban 1263 B.S. or 22nd July 1856.

My first daughter was married to the late Grish Chandra Ghosh, third son of the late Babu Ramdhan Ghosh of Simla, Calcutta; second daughter was married to Omer Lal Mitra, fourth son of the late Babu Gurucharan Mitra of Ahiritola, Calcutta; third daughter was married to Radhika Narayan Ghosh, youngest son of the late Babu Brindaban Chandra Ghosh of Ichhapore in the 24-Perguunahs; fourth daughter was married to Chuni Lal Mitra, second son of Babu Pearychand Mittra of Nimtala, Calcutta; fifth daughter was married to Upendra Nath Mitra, third son of the late Babu Isvar Chandra Mitra of Calcutta; and the sixth daughter to Dukari Ghosh, second son of the late Babu Haladhar Ghosh of Thanthania, Calcutta.

My son was married to the eldest daughter of Babu Kali Nath Bose of Bagbazar, Calcutta, on the 31st August 1876, under the provisions of Act III of 1872.

My father's house of Konnagar, in which my family resided with those of my brothers, being too much crowded, I obtained from my father a piece of land situated near the old house, and built a new one in which I have been living with family since 10th Jyaishtha 1257 B.S. or May 1850.

I was visited with a severe affliction in the death of my eldest son-in-law, Grish Chandra Ghosh, which event took place on the 20th September 1869. He was for may years editor of the "Bengalee" newspaper, and one of the most distinguished educated youngmen of India. About 3 years after, his second son, Amulya, a very promising lad of 16 also died. I suffered another affliction from the death of my third daughter, Binoda, which occurred on the 10th September 1873. Subsequently several grand children of mine also quitted this world. In 1882, another mournful event took place. My second son-in-law, Omer

Lal Mitra quitted this world on the 10th October of that year. Such misfortunes are incidental to human life, and ought to be borne with resignation.

LITERARY PRODUCTIONS

I wrote a Bengali treatise (শিশুপালন) on the treatment of infants, compiled from the works of Andrew Combe and others on the subject, the first part of which was published in 1857, and the second part in 1862. In 1867 I published a Bengali treatise on Spiritualism (অধ্যাত্ম বিজ্ঞান) compiled from various authors.

MATTERS—SOCIAL

On my being transferred as Deputy Collector from Midnapore to the 24-Pergunnahs in January 1850, I resided at Khidirpur or Alipore, visiting my family at Konnagar every Saturday, and returning to Alipore on Monday. At this time I felt a great desire to do something for improving the condition of my native village, Konnagar. With this view I called a public meeting of the inhabitants of the place on the 29th Ashar 1259 B.S. (July 1852), the result of which was the establishment of an association called the "Konnagar Hitaishini Sabha" (Benevolent Society), the objects of which were as follows.

(1) To do whatever will tend to promote the beauty of the place, and the good of the community.

(2) To reform all indecent and immoral customs which prevail in the village, without interfering with the religion and castes of the people.

(3) To give relief to persons in distress, brought on by misfortunes or unforeseen events.

(4) To adjust all disputes between man and man amicably, provided both the parties concerned apply to the Sabha for arbitration.

This society existed for a period of three years, at the end of which it was dissolved in July 1855 for want of adequate support from the inhabitants of the place.

During the above period the Sabha made necessary repairs to the roads, constructed culverts where urgently required, gave

relief to indigent persons, and granted aid for building School-houses &c.

The establishment of an English School at Konnagar being suggested by the above Society, I granted a piece of land for the site of the school-house, which was built by subscription, and the school was opened on the 1st May 1854. It was at first a private institution, but it obtained a grant-in-aid from Government on the 8th November 1855. The school is now one of the best aided English schools in Bengal.

Under the system of Vernacular education introduced by Lord Hardinge, a Government Vernacular School had been established here, but it was abolished on the 1st May 1856. However, through the exertions of myself and my friends, a Vernacular School was established under the Government grant-in-aid system on the 14th June 1858, which is still in existence, and is considered one of the best schools of the kind.

Being convinced that education would be promoted by the establishment of a Public Library, I raised an adequate sum by private subscriptions, and built for the purpose two rooms in the upper story of the English School-house. The Library was opened to the public on the 1st April 1858. It has a good collection of English, Vernacular and Oriental classic works. Its current expenses are met by monthly subscriptions paid by the readers and other supporters of the Library.

When I was a student in the Hindu College, I became convinced of the importance of female education. Accordingly I felt a great desire to teach my wife reading and writing in Bengali, and did everything in my power to accomplish that object. In time I employed a Pandit to teach my daughters, one of whom was sent to the Calcutta Bethune School.

With the view of having a Girls' School established at Konnagar, I submitted a proposal to Government in 1858, in which I agreed to pay Rs. 500/- for the erection of a school-house, provided an equal sum was granted by Government for the purpose. Besides, I guaranteed the payment of Rs. 15/- per month from local sources, and solicited a monthly grant of Rs. 45/- from Government. This application, after long correspondence, was disallowed. But without further waiting for any aid from Government, I at once opened a Girls' School at my own house on the 12th April 1860, appointing a Pandit for the instruction of the pupils. A monthly grant-in-aid was afterwards obtained from Government. The school was then removed to a house built on a piece of ground belonging

to me at my own expense. This School has been well managed; from it a number of girls annually pass the Vernacular Girls' Scholarship Examination and obtain scholarships.

When the East Indian Railway was opened to the public in 1854, no provision was made for stopping the trains at Konnagar. Consequently to avail of the Railway, the inhabitants of this locality had to go either to the Bali or to the Serampore Station, a distance of three miles on either side. To remove this inconvenience, I applied to the Railway authorities for the establishment of a station at Konnagar, which after much pressure, was allowed in 1856.

There was another want much felt by the people of Konnagar. There was no post office in the village, so they had to proceed to Bali or Serampore to post their letters. To supply this want, I sent an application in 1858 to the Post Master General, soliciting him to open a Post-Office at Konnagar as a tentative measure for three months, and guaranteeing the payment of any excess of expenditure over receipts in postage, which might occur during the period of trial. Accordingly a Post Office was opened here in that year, which has become a permanent institution.

The establishment of a charitable Dispensary at Konnagar was another desideratum. Endeavours were made by the late Hitaishini Sabha for the accomplishment of that object, but without success.

Having great faith in the system of Homœpathy, I called a public meeting in 1868, of the inhabitants of the place, with the view of establishing a Charitable Homœpathic Dispensary, which, according to the resolutions passed at that meeting, was opened on the 1st September of that year; but it was closed in December 1869 for want of support from the people. It is however satisfactory to state that Homœpathic medicines have since been gratuitously distributed to the sick applying for them at the expense of the Konnagar Brahma Samaj.

Epidemic fever having been broken out in Konnagar in 1875, causing great mortality among the people, a Charitable Dispensary in connection with Government was established at the place through the exertions of myself and my friends. It was located in a pucca house lent by me for its use and was supported partly by private subscriptions and partly by Government. The Dispensary was abolished by Government in 1881. In December 1883, a Charitable Homeopathic Dispensary was opened at my house at the expense of my wife, which is still in existence.

MATTERS—RELIGIOUS

During my early years, being brought up in the midst of Hindu Idolatry, I was naturally a Hindu, of the *Sakta* sect, *i.e.* a worshipper of *Sakti* or *Bhagawati*, and after my marriage I formally received, with my wife, *mantras* from the family spiritual guide, and worshipped Kali daily according to the formula given by the *guru*.

When I was studying in the 4th class of the late Hindu College, under the tuition of Mr. D'Rozio, religious discussions were carried on under his guidance both in and out of the College, the result of which was that my faith in the Hindu Religion was gone, and I became a believer in one God, or, in other words, a Diest. But my circumstances not permitting me to act according to my belief, I was obliged to conform to the rites and ceremonies inculcated in Hinduism. I contained in that state till 1844, when I was transferred as Deputy Collector from Balasore to Midnapore. It was here that a copy of the *Tattva-bodhini Patrika* came to my hand, and I was delighted to read in it the doctrines of the Brahma Dharma. I immediately became a subscriber to that peridocial, and began to worship the Supreme Being in the manner therein indicated.

In 1846, I established a Brahma Samaj at Midnapore, which continued to exist till I left the District for the 24-Pergunnahs in January 1850. The samaj was subsequently revived by Babu Rajnarain Bose, then Head master of the Government School there, and brought to the most flourishing condition.

Some time after my joining service in the 24-Pergunnahs, I formally embraced the Brahma Dharma, and became a member of the Adi Brahma Samaj at Jorasanko. By the grace of God I have succeeded in introducing the Brahma Dharma in my family. My wife is a sincere believer in that Religion, and reduces her belief to practice. All my children have been brought up in the same faith.

I have already stated that I retired from the service of Government in January 1863. On the 28th May of that year I established a Brahma Samaj at my house at Konnagar, the services of which were regularly held at first every fortnight and afterwards every week. This Samaj was originally set up under the auspices of the Adi Brahma Samaj. Babu Debendranath Tagore occupied the *vedi* at the inauguration of the Samaj. But since the secession of Babu Keshubchunder Sen and his friends from the latter Samaj, it showed its sympathy with the Brahma Samaj of India,

although in all matters the Konnagar Samaj acted independently of any Samaj, and at its Anniversary festivals the leaders of both the Samajes conducted services alternately. I have always entertained the highest veneration for the Maharshi D. N. Tagore. To provide the Samaj with a Prayer Hall of its own, I granted a piece of land on the riverside, and built a suitable house at a cost of upwards of three thousand Rupees, raised by subscription, a material portion of which was contributed by Babu Debendranath Tagore. The Mandir was consecrated on the 8th March 1879, and a Trust Deed was executed appointing the gentlemen, named in the margin, as Trustees of the Mandir. Some houses have also been built for the residence of ministers or missionaries.

Babu Ananda Mohan Bose
Babu Umesh Chandra Datta
Babu Panchkari Banerji
Babu Satkari Deb
Babu Satya Priya Deb

(For a history of this Samaj I refer to the Appendix to the Annual Report of the Sadharan Brahma Samaj for 1879)

At one time I had the highest respect and esteem for Babu Keshab Chandra Sen as a religious teacher and reformer; but latterly, that is, a few years previous to the date of the Kuch Behar marriage, some of his proceedings in the Brahma Samaj of India and his preachings in the Brahma Mandir, were considered by me as very objectionable, which led me to change my opinion regarding him. When I heard of his intention to marry his daughter with the Maharaja of Kuch Behar, I highly disapproved the measure, and joined my friends in sending a strong protest to him against the marriage. It is known to all that I took an active part in this movement, the result of which was the establishment of the Sadharan Brahma Samaj on the 15th May 1878. I served this Samaj as its Secretary from its commencement upto December 1879. At the Annual Meeting of the Samaj held in January 1880, I was elected its President, an office for which I did not consider myself competent, but I was obliged to accept it at the earnest request of some of my esteemed friends. This office was held by me for five years consecutively. After an interval of one year, I was again elected as President of the Sadharan Brahma Samaj in 1887, after which I retired from the office in 1888.

Owing to my religious beliefs, and specially to my son's marriage under Act III of 1872, the orthodox Hindus of Konnagar have excommunicated me from their society, and not only that, they do not scruple to insult and persecute me whenever they find an opportunity

of doing so. But I am not at all sorry for this treatment, as I anticipated it, and was quite prepared to meet it. May God grant them light to see their error, and mend their conduct.

HEALTH

Although constitutionally I am weak, yet by a temperate and regular mode of living, I have managed under God's providence to enjoy a pretty long life. I have studied the laws of health and have tried my best to observe them. My food has been very simple— rice, dal, vegetables, fish, milk and bread. I have always followed the golden rule "early to bed and early to rise". I took moderate exercise (walking) every morning, after taking a cup of tea or coffee or cocoa and used Dumb Bells and flesh brush before bath. At present milk is the only beverage taken by me in the morning, and I never go out with an empty stomach. The following is the routine of my daily life at present :— I rise at 5 a.m., in all seasons of the year, and after satisfying the calls of nature, and washing my face and mouth, I sit down to read some newspapers or religious books. At $6^1/_2$ or 7, I take one *pua* ($^1/_4$ seer) of milk with an arrowroot biscuit. I then come out to take a short walk, after which I look into my private affairs, also attend to public matters if there be any. At 10 a.m., I bathe my body in tepid and head in cold water, after using the flesh-brush. The dumb-bell exercise has been discontinued in consequence of physical weakness. After bath, I sit to family prayer, and then take my breakfast or rather dinner at 11 a.m., which consists of a small quantity of rice, dal, some vegetables and fish, and a *pua* of milk, with a little sweetmeat. I never drink water till 3 or 4 hours after the meal. After this, I take a little rest for half an hour or so, and then attend to business or reading. At 5 p.m. I take 5 drops of Tincture Opii (under medical advice) and eat some fruits, or a biscuit and *batasa* (sugar cake). At 7 p.m. I take my evening meal, consisting of three or four small *chapatis* of bread, or a few slices of loaf with a little fish-curry, and a *pua* of milk and some sweetmeats. I go to bed just at 9 p.m., spending the interval in conversation with my family and friends.

I am now 77 years old (July 1888), and thank God, I still keep a tolerably good health, though it is sometimes out of order. My present complaint is great general debility.

আত্ম-শিক্ষা

মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল একতানরূপে অর্থাৎ পরস্পর ঐকমত্যে সঞ্চালিত ও পরিস্ফুরিত হইলে সামঞ্জস্য, শান্তি বা মিল সমুৎপন্ন হয়, ইহা একটি অপূর্ব্ব সুখকর অবস্থা। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে পারিবারিক শান্তি লাভের জন্য পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তি উৎপাদিত হওয়া আবশ্যক। সেই প্রকার সামাজিক শান্তির নিমিত্ত পারিবারিক শান্তি, ও জাতীয় শান্তির জন্য সামাজিক শান্তি, এবং বিশ্ব শান্তির নিমিত্ত সমস্ত মানবগণের শান্তির প্রয়োজন করে। এই সমুদায় কার্য্য প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার পরিপক্কতার উপর নির্ভর করে। যদি কোন পরিবারস্থ ব্যক্তি সকলের বাঞ্ছা, ভাব ও প্রবৃত্তি নিচয় পরস্পরের বিরোধী হয়, তাহা হইলে সে পরিবারের মধ্যে শান্তি ও সুখ কখন উৎপন্ন হয় না; এবং সমাজস্থ পরিবার সকলের ঐ প্রকার বিদ্বেষ ভাব থাকিলে সেই সমাজেরও তদবস্থা প্রাপ্তি হয়। সেইরূপ সমাজের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ হইলে এক জাতি অপর জাতির সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি যে প্রকার হয়, তাহাদিগের সমাজও তদনুরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং সমাজের অবস্থা যেরূপ হয় তদন্তর্গত প্রত্যেক মনুষ্যের সেই প্রকার প্রকৃতি নির্ম্মিত হয়। সুতরাং ব্যক্তি সকল আপনাদের প্রাকৃতিক ভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে পরিবার, সমাজ, জাতি ও ঘটনা সকল উৎপন্ন করে, এবং আপন আপন স্ফূর্ত্তি অনুসারে যে সকল ঘটনা, রীতি, পদ্ধতি ও মত প্রভৃতি মানবমণ্ডলীর মধ্যে প্রবর্ত্তিত করে তাহারা নিজেই ঐ সকল কার্য্যের ফলভোগী হয়।

উল্লিখিত কারণ বশতঃ পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে কতকগুলি লোক সমাজের প্রভাব ও ঘটনার বশীভূত হইয়া কার্য্য করে। পৃথিবীর অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত। আর কতকগুলি ভাগ্যধর ব্যক্তি এরূপ উৎকৃষ্ট শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি লাভ করে যে তদ্দ্বারা সমাজের অবস্থা ঘটিত বিষয় সকলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণী। অতএব প্রথম শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট ও দুর্ব্বল, ও দ্বিতীয় শ্রেণী স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ও বলবান্।

মনুষ্যের প্রথমতঃ শারীরিক দোষ হইতে ও দ্বিতীয়তঃ অবস্থার দোষ হইতে অনিষ্ট ফল সকল উৎপন্ন হয়। অসমঞ্জসীভূত মন হইতে অপকৃষ্ট ঘটনাবলী, ও অপকৃষ্ট ঘটনা দ্বারা মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়া থাকে। সেই প্রকার মনুষ্যের সুনির্ম্মিত দেহ হইতে প্রধানরূপে, ও উহার উত্তম অবস্থা হইতে সামান্যরূপে শুভফল উৎপন্ন হয়। এরূপ প্রকৃতি ও অবস্থা বিশিষ্ট মনুষ্যেরা মানবীয় উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া যথার্থ জ্ঞান লাভ করতঃ সেই জ্ঞান অল্পস্ফুরিত অজ্ঞব্যক্তিগণকে অবগত করেন।

এই প্রকারে সমাজের শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে; যেহেতু শারীরিক প্রকৃতি দূষিত বা অপূর্ণ, এবং পৈতৃক প্রবৃত্তি সকল মানসিক শান্তির প্রতিকূল হইলে আত্মা সুন্দররূপে স্ফুরিত ও প্রকাশিত হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে আত্মাকে স্বভাবতঃ দূষ্য বা পাপাসক্ত কহা যাইতে পারে না। যদি পাপ-প্রবর্ত্তক ঘটনাবলী কোন ব্যক্তির অবস্থা ও ক্ষমতার অপেক্ষা এত প্রবল হয় যে সে ঐ সকলকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া উহার ক্রীতদাস ও যন্ত্র স্বরূপ হইয়া অনিষ্টফল উৎপত্তি করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির যে দুষ্কর্ম্ম করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে এবং সেই দুষ্প্রবৃত্তি আপন কার্য্য দ্বারা প্রকাশ করে তাহা বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না।

অতএব যখন কি জাতীয়, কি সামাজিক, কি পারিবারিক শান্তি আত্মার প্রকৃত অবস্থা ও যে পরিমাণে উহা সমঞ্জসরূপে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় তাহার উপর নির্ভর করে, তখন সাধারণ শান্তি উৎপাদন জন্য আত্মার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শক্তি পরিষ্কার রূপে অবগত হইয়া তাহার যথোচিত পরিচালনা করা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ আত্মার প্রত্যেক বাঞ্ছা, বৃত্তি, ভাব ও আকর্ষণ প্রভৃতিকে উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক পথে সঞ্চালিত করতঃ উহাদিগের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে প্রেমই আত্মার গভীর, ঐশিক, সঞ্জীবনী, উত্তেজনকারী ও ধ্বংসরহিত সারাংশ; ইচ্ছা অধীন ও স্বভাবতঃ অনাসক্ত বৃত্তি; ও প্রজ্ঞা, শাসন, বিচার ও মিলকারী বৃত্তি, যাহাকে সহজ বা স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান কহে। ইহাই আত্মার আন্তরিক বিবরণ। কিন্তু উহার অন্তরতম সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে বিভাগাত্মক বিজ্ঞান দ্বারা ব্যবচ্ছেদ করিলে প্রতীতি হইবে যে প্রেম ও প্রজ্ঞা এই দুই বৃত্তিতে যে সকল গুণ ও শক্তি আছে তাহাই ক্রমে ক্রমে সুন্দর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া আত্মার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থাতে বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করে। যে সকল ভাব, প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম দ্বারা জড়জগৎ, সমাজ, ও জাতি সমূহের সহিত আত্মার ত্রিবিধ সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, প্রেম তাহার মূলীভূত কারণ। আর বুদ্ধিমান ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে যে সকল আকার, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও পরিষ্কারতা সুশোভিত থাকে, এবং যাহার যুক্তি ও বিদ্যার স্বাভাবিক সহায় রূপে পরিগণিত হয়, প্রজ্ঞাই তাহার আকর। আত্মবিজ্ঞান শাস্ত্র অনুসারে ইচ্ছাকে একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি জ্ঞান করা অপেক্ষা কতকগুলি বৃত্তির কার্য্য স্বরূপ বিবেচনা করা

যুক্তিসিদ্ধ। তন্নিবন্ধন প্রেম প্রজ্ঞা দ্বারা উপদিষ্ট হউক বা না হউক মনুষ্যকে যখন উত্তেজিত করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তখনই ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে ইহা প্রদর্শিত হইবে যে মনুষ্যের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বীজ নিহিত নাই; ফলতঃ ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধীয় উৎকর্ষ সাধন জন্য এই নিয়মটি স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য যে জন্মাবধি সমুদায় আধ্যাত্মিক জীবন পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রকৃতি বাহ্য ও আন্তরিক শক্তি ও ঘটনা দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে মানসিক ভাবকে আমরা ইচ্ছা বলি তাহা আমাদের ক্ষমতা বা কর্ত্তৃত্বের নিতান্ত অধীন নহে, প্রত্যুত অন্তরতম কারণের কার্য্য স্বরূপ মাত্র।

প্রেমবৃত্তিকে ছয় অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—১ম আত্মপ্রেম; ২য় দাম্পত্যপ্রেম; ৩য় অপত্যপ্রেম; ৪র্থ ভ্রাতৃপ্রেম; ৫ম পিতৃপ্রেম; ৬ষ্ঠ বিশ্বপ্রেম।

মানসিক বৃত্তি সকল যে প্রকারে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া সমঞ্জসীভূত হয় তাহার বিবরণ।

১। আত্মপ্রেম।

আত্মার স্বাভাবিক ও অবিকৃত অবস্থাতে আত্মপ্রেমই প্রথমে উদিত হইয়া আপন শক্তি প্রকাশ করে, অর্থাৎ উহার শৈশবকালে মনোমধ্যে একটি আত্মজ্ঞান জন্মে, যদ্দ্বারা আপনাকে অপরব্যক্তি হইতে পৃথক্ বোধ করিতে পারে।

আত্মপ্রেম হইতে ইন্দ্রিয়ঘটিত নানাপ্রকার অভাব, ও জীবিত থাকিবার প্রবল বাঞ্ছা উৎপন্ন হয়; সুতরাং আত্মরক্ষা ও আত্মসুখ সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। পরে আত্মশিক্ষা, আত্মানুসন্ধান, ও আত্মসামঞ্জস্যের বাঞ্ছা উদিত হয়। আত্মা ঐ সকল বাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও স্পর্শেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়; এবং প্রত্যেক দৃশ্যবস্তুকে আত্মরক্ষা ও আত্মসুখের উপযোগী করিবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করে। মনুষ্য তখন যে সকল অনুসন্ধান, চেষ্টা ও যত্ন করে তাহা সমুদায়ই উহার নিজের কার্য্য ও সুখের উদ্দেশে করিয়া থাকে।

কিন্তু আত্মপ্রেমকে স্বেচ্ছামত অবাধে কার্য্য করিতে দিলে মনুষ্য অনেক বিপদজনক ও হানিকর বিষয়ে পতিত হয়; যেহেতু প্রজ্ঞা বিনা প্রেম অন্ধের ন্যায় কার্য্য করে। ফলতঃ আত্মবিকাশের প্রাথমিক বা শৈশব অবস্থাতেই স্বার্থসুখ ও স্বার্থপর বাসনা সকল উদিত হয়। ইহার অনতিবিলম্বে মনুষ্য জানিতে পারে যে আত্মচেষ্টা, অর্দ্ধচেষ্টা ও আত্মসুখ অর্দ্ধসুখ মাত্র, অর্থাৎ যখন আত্মপ্রেম ও শিক্ষার কার্য্য সম্পূর্ণ হয়, তখন মনুষ্য আপন জীবনকে অর্দ্ধেক ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান করতঃ একটি স্বতন্ত্র বস্তুর অভাব অনুভব করে। এই সময়ে আত্মপ্রেম বিস্তৃত ও উন্নত হইয়া দাম্পত্য প্রেমে পরিণত হয়।

২। দাম্পত্যপ্রেম।

আত্মপ্রেম পরিষ্কৃত ও বিস্তৃত হইয়া দাম্পত্য প্রেমের ভাব ধারণ করে। সমুদায় বিশ্বমধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর যে আন্তরিক ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহা উক্ত প্রেম দ্বারা স্বতঃ প্রকাশিত হয়। আত্মার সহিত আত্মার সম্মিলনই যথার্থ উদ্বাহ, এবং দাম্পত্য প্রেম সর্ব্বাগ্রে তাহাই বাঞ্ছা করে। উহা দ্বারা দুইটি আত্মা একত্রিত হইয়া একাত্মা হইয়া যায়, এবং যাহাতে উভয়ের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা, নির্ভরতা, সুখ, সাহায্য ও আসঙ্গ জন্মে তাহাই উদ্বাহ ক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু উক্ত প্রেম প্রজ্ঞার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব ও উপদেশ দ্বারা সঞ্চালিত ও শাসিত না হইলে বিষম ও মন্দ ফল উৎপন্ন করে; যেহেতু সকল প্রকার প্রেম আত্মার প্রবর্ত্তক ও স্ত্রীগুণবিশিষ্ট, এবং প্রজ্ঞা তাহার রক্ষক ও পুরুষগুণবিশিষ্ট। যখন দাম্পত্য প্রেম পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন মনুষ্য উহার সজীব চিহ্ন ও প্রতিনিধির অভাবে আপনাকে অসম্পূর্ণ বোধ করে, সুতরাং উক্ত প্রেম প্রস্ফুটিত হইয়া অপত্যপ্রেমে পরিণত হয়।

৩। অপত্যপ্রেম।

দাম্পত্যপ্রেম সংস্কৃত ও প্রসারিত হইলে অপত্যপ্রেমের উদয় হয়। এই বৃত্তির উত্তেজনায় আপনার অনুরূপ আকার, জীবন ও কার্য্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি হইবার বাঞ্ছা করে, সুতরাং উক্ত প্রেম যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তত নব নব সন্তান উৎপন্ন হইতে থাকে। কিন্তু কেবল সন্তান উৎপাদিত হইলেই উক্ত বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয় না, ফলতঃ উহা নীতি ও আধ্যাত্মিক বিষয় সকলের মধ্যেও প্রবেশ করে, অর্থাৎ মন যে সকল তত্ত্ব, মত, বাঞ্ছা, কবিত্ব, সত্য ও জ্ঞান প্রভৃতি উপার্জ্জন করে, তাহাও নিজ সন্তানবৎ যত্নের সহিত রক্ষা করে।

যখন মনুষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন ও চিন্তন করে, তখন সে জানিতে পারে যে স্বীয় চেষ্টা, উদ্যোগ, বাঞ্ছা ও সুখ অন্যের সংসর্গ ও সাহায্যের উপর অনেক নির্ভর করে, সুতরাং আধ্যাত্মিক একতার জন্য সমাজের সমবেদনা ও সাহায্য আবশ্যক হয়। এক্ষণে ইহা প্রতীতি হইল যে মনুষ্যের সুখ ও উন্নতির জন্য আত্মপ্রেম কেবল দাম্পত্যপ্রেমের, ও দাম্পত্যপ্রেম কেবল অপত্যপ্রেমের উপর নির্ভর করে না, প্রত্যুত এই তিনের উন্নতির বৃহত্তর ক্ষেত্র যে ভ্রাতৃপ্রেম তাহার উপরেই নির্ভর করে।

৪। ভ্রাতৃপ্রেম।

অপত্যপ্রেম সংশোধিত ও প্রশস্ত হইলে ভ্রাতৃপ্রেমের রূপ ধারণ করে। ইহার উপদেশানুসারে মনুষ্য আপনার স্বাধীনতা, স্বত্ব ও সুখের ন্যায় প্রতিবাসীগণেরও স্বাধীনতা, স্বত্ব ও সুখ রক্ষা করেন। তৎপরে সমাজের প্রতি তাঁহার প্রেম জন্মে, এবং নির্ব্বিশেষে লোকের সহিত সংসর্গ ও বন্ধুতা স্থাপিত হয়। তিনি উক্ত প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে লোকের মঙ্গল ও কি প্রকারে তাহারা সন্তুষ্ট ও সুখী হইবে তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন।

ধীরতা, দয়ালুতা, কোমলতা, বদান্যতা, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি গুণসকল উক্ত প্রেমের লক্ষণ। এই প্রেম প্রবল হইয়া মানবগণের সামাজিক, জাতীয়, রাজনীতি বিষয়ক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নিত্য সমস্ত মঙ্গল সাধনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। উক্ত প্রেম উন্নত হইলে আর একটি উচ্চতর ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় যাহাকে পিতৃপ্রেম বা ভক্তি বলা যাইতে পারে।

৫। পিতৃপ্রেম।

ভ্রাতৃপ্রেম পরিশুদ্ধ ও ব্যাপিত হইলে পিতৃপ্রেমে উপনীত হয়। এই প্রেমের উত্তেজনায় মনুষ্য সকল বিষয়ক ও সর্ব্বস্থানীয় প্রধানের প্রতি—সকল সৎ ও মহতের প্রতি—এবং সেই ভূমা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মার প্রতি মনোনিবেশ ও প্রীতিস্থাপন করে। উক্ত প্রেম কি জন্মদাতা, কি সমাজাধিপতি, কি জাতিশ্রেষ্ঠ, কি ধর্ম্মোপদেশক সকল প্রকার প্রধান পুরুষের প্রতি নিয়োজিত হয়। উহা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎস স্বরূপ, এবং সত্যের জন্য, মঙ্গলের জন্য ও মহৎ আশার জন্য অনুরাগ প্রকাশ করে। এইটি অতি উচ্চ ও পবিত্র ভাব, যেহেতু উহা সকল বস্তুতে ও সকল স্থানমধ্যে ঐশিক শক্তি, মঙ্গলভাব, মহত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরসত্তা দর্শন করায়।

উক্ত প্রেম প্রত্যেক উন্নত ও মহৎ ভাবের কারণ স্বরূপ, এবং ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত করিয়া আত্মাকে অনন্ত সুখ ও অমৃত নিকেতনের দিকে লইয়া যায়। শ্রেষ্ঠের, সত্যের, মঙ্গলের ও ঈশ্বরের উপাসনা করা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু এই প্রধান প্রেমেতেও আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না; সে উহা অপেক্ষাও প্রশস্তপ্রেমের অনুরাগী হয়, যথা—

৬। বিশ্বপ্রেম।

পিতৃপ্রেম নির্ম্মলীকৃত ও প্রস্ফুটিত হইয়া বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। ইহার দ্বারা সকলের সহিত সমভাব, সকলের প্রতি পরস্পর নির্ভরতা, সকলের স্বাধীনতা ও

সকলের সহিত আত্মীয়তা প্রকাশিত হয়। উহা প্রকৃত আত্মপ্রেম, দাম্পত্যপ্রেম, অপত্যপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম ও পিতৃপ্রেমকে যতদূর সাধ্য বিস্তার করে। এই প্রেম-মন্দির মধ্যে আত্মার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, আন্তরিকভাব, আশা ও আকর্ষণ সকল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে ও সম্পূর্ণ স্বাধীনরূপে কার্য্য করিতে ক্ষমতা পায়। উক্ত প্রেম অসীম ও অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতা বাঞ্ছা করে, এবং উহা অনন্ত উন্নতির প্রধান উৎস স্বরূপ। উহা মানবাত্মার উচ্চতম, পবিত্রতম ও ঐশিক গুণ স্বরূপ।

মনুষ্যের মনোমধ্যে যে সকল প্রেম যে প্রকারে ক্রমশঃ নিয়মিত ও সামঞ্জস্যরূপে প্রস্ফুটিত ও কার্য্যকারী হয় তাহার বিবরণ উপরে লিখিত হইল। কিন্তু ঐ সকলের অযথা স্ফূর্ত্তি ও কার্য্য দ্বারা বহুপ্রকার অনিষ্ট, পরিবার ও সমাজমধ্যে ঘটিয়া থাকে তদ্বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে যাহা পশ্চাৎ বিবৃত হইবেক। এক্ষণে প্রজ্ঞার বিবরণ লেখা যাইতেছে। ইহার মধ্যেও ছয়টী বিষয় আছে যথা—উপযোগিতা, ন্যায়, পরাক্রম, শোভা, আশা ও সামঞ্জস্য বা শান্তি।

১। উপযোগিতা।

উপযোগিতা প্রজ্ঞার আদি গুণ, ও আত্মপ্রেমের রক্ষিতা দেবতা স্বরূপ। ইহা দ্বারা প্রত্যেক কার্য্য এরূপে নিয়োজিত হয় যে তাহাতে সৃষ্টির অভিপ্রায় সুসম্পন্ন ও জগতের মঙ্গলসাধন হইতে পারে। উহা মনুষ্যকে বাহ্যজগতের সহিত স্পষ্টরূপে যোগ করিয়া দেয়; এবং আত্মপ্রেমের প্রয়োজন ও ইচ্ছার প্রতি সতর্ক থাকে। উহার সাহায্যে মন প্রত্যেক বিষয়ের যথার্থ মূল্য অবধারণ, ও কার্য্য সকলে উপকারিতা ও সাধ্যায়ত্ত বিবেচনা এবং যে সকল জড় পদার্থ ইন্দ্রিয়গোচর হয় তাহার ব্যক্তিগ্রাহিতা, আকার, পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদির যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। জড় শরীর পোষণার্থ আহারের প্রয়োজন, তন্নিমিত্ত উপযোগিতা ভূমিকর্ষণ, ও তৃণ, শস্য, ফল ও জীব সকল উৎপাদন করিতে উপদেশ দেয়।

আত্মপ্রেম রসনেন্দ্রিয়কে অপরিমিতরূপে চরিতার্থ করিতে বাঞ্ছা করে এবং অধিক পরিমাণে ও সর্ব্বদা আহার করিতে প্রবৃত্তি দেয়; কিন্তু উপযোগিতা তাহা নিষেধ করতঃ ভক্ষ্য দ্রব্য সকলের স্বাভাবিক গুণ ও কোন্ সময়ে ও কি পরিমাণে ঐ সকল আহার করা কর্ত্তব্য তাহা অবগত করায়। আত্মপ্রেম ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া অন্ধের ন্যায় সর্ব্বত্র ও সকল বস্তুতে গন্ধ অন্বেষণ করে; কিন্তু উপযোগিতা মনুষ্যকে স্বভাবের ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া কি কি সুগন্ধদ্রব্য কি প্রকারে সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা উক্ত ইন্দ্রিয়কে উপযুক্তরূপে তৃপ্ত করিলে যে সকল উপকার দর্শিবে ও যে প্রকারে ঐ উপকার সকল স্থায়ী হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেয়। যখন শ্রবণেন্দ্রিয় আপনার তৃপ্তি ইচ্ছা করে ও আত্মপ্রেম

তদুদ্দেশ্যে বিবেকশূন্য হইয়া ও কাল ও শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সকল প্রকার মিষ্ট স্বর শুনিতে ব্যগ্র হয়, তখন উপযোগিতা তাল ও মান যুক্ত উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার যথার্থ ব্যবহার শিক্ষা করায়। সেই প্রকার দর্শনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিবার বাসনা হইলে, উপযোগিতা নানা বর্ণ, আলোক ও ছায়া এরূপে সংযুক্ত করে যদ্দ্বারা উক্ত ইন্দ্রিয়ের যথার্থ শিক্ষা হইতে পারে। অতএব এতদ্বিবরণ দ্বারা প্রতীতি হইবে যে আত্মপ্রেম কেবল সুখের জন্যই ইন্দ্রিয়সেবা করিতে চাহে, কিন্তু কি প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিলে মনুষ্যের শিক্ষা ও নির্ম্মল সুখ লাভ হইবে তাহারই উদ্দেশ্যে উপযোগিতা কার্য্য করে।

ইহাও বিদিত করা যাইতেছে যে রুচিবিজ্ঞান প্রজ্ঞার আদি বিকাশ বা কার্য্য; এবং যেমন সন্তান পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি অধিকার করে; সেইরূপ উহার আত্মা জীবনের প্রথমাবস্থাতে আত্মপ্রেম হইতে যে প্রকার প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয় ও প্রজ্ঞা হইতে যে সকল উপদেশ গ্রহণ করে তাহার ফল উহার সমুদায় জীবনে ন্যূনাধিক রূপে প্রকাশ পাইবেই পাইবে। অতএব ব্যক্তির আদি প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও শিক্ষা এই তিনটি সার বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করা পিতামাতা ও সংস্কারকগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আন্তরিক প্রবৃত্তির অন্যান্য অপরিস্ফুট ও উচ্চতর গুণ সকল উক্ত উপযোগিতা বৃত্তির অন্তর্গত জানিবে, অর্থাৎ মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যক্তিগ্রাহিতা, আকারানুভাবকতা, পরিমাণানুভাবকতা, ভাষাশক্তি ও সংখ্যাজ্ঞান নামে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সমুদায় উপযোগিতার উপরিভাগ মাত্র। প্রকৃতি ও ঈশ্বরের উপায় সকল যে প্রকারে ও যে কালে অবলম্বন করিলে আত্মার চিরসুখ সাধন হইতে পারে তাহার উপদেশ মনুষ্য উপযোগিতা হইতে প্রাপ্ত হয়। অতএব সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র উপযোগিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহা আত্মপ্রেমের রক্ষক স্বরূপ, এবং উহা হইতে ন্যায় বৃত্তি বিকশিত হয়।

২। ন্যায়।

উপযোগিতা গুণের পূর্ণতর আকার ও অধিকতর বিকাশের নাম ন্যায়। উহা দাম্পত্যপ্রেমের রক্ষক স্বরূপ; এবং আপনা হইতে যে সকল অনুরাগ উৎপন্ন হয় তাহা উত্তমরূপে বিবেচনা করা, স্বাভাবিক সম্বন্ধ সকল নিবদ্ধ করা, এবং সকল বিষয়ের সমতা রক্ষা করা উহার যথার্থ কার্য্য। উক্ত বৃত্তি দাম্পত্যপ্রেমের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে; এবং আত্মার যে স্ত্রীত্বগুণ আছে তাহাকে আপন স্বভাবানুমত ও সর্ব্বতোভাবে প্রিয় হয় এমনত শারীরিক প্রয়োজন, আন্তরিক বাসনা, আদি শিক্ষা ও সাধারণ গঠন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অন্বেষণ ও তাহার সহিত মিলন করিতে উপদেশ

দেয়। ন্যায় আত্মপ্রেম কিম্বা দাম্পত্য প্রেমকে সত্য ও তাহার শুভফল বিকাশের পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মাইতে দেয় না। মনুষ্যকে সৃষ্টির অভ্যান্তরানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া ন্যায়ের কার্য্য। মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রে অনুমিতি, উপমিতি, ন্যায়পরতা, স্থানানুভাবকতা, গুরুত্বানুভাবকতা, কালানুভাবকতা ও স্বরানুভাবকতা নামে যে কয়েকটি বৃত্তি লিখিত হইয়াছে তাহা সমুদায় উক্ত ন্যায় বৃত্তির অন্তর্গত। আত্মা এই বিশ্বের গতি সকলের পরস্পর স্থান, স্বাভাবিক যোগ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, সার্ব্বত্রিক ঐক্য ও নিয়ম সকল নিরূপণ, এবং কোন্ বিষয় যথার্থ ও কোন্ বিষয় কাল্পনিক, ও কোন্ বিষয় নিত্য ও কোন্ বিষয় অনিত্য তাহা যথার্থরূপে প্রভেদ করিবার ক্ষমতা ন্যায় হইতে প্রাপ্ত হয়। আধ্যাত্মিক জগতে ন্যায় সকল প্রকার অনুরাগের রক্ষিতা দেবতা, এবং আত্মার নীতিবিষয়ক পবিত্রতার জ্ঞানদাতা। ঈশ্বরের অভিপ্রায় মতে জড় ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতের উৎকর্ষ সাধনকল্পে ন্যায়ই উপায় ও ফলস্বরূপ নিযুক্ত আছে, এবং উহা দ্বারাই সকল বিষয় বিচারিত ও সমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ন্যায় হইতেই আত্মা সত্য, আলোক ও স্বাধীনতার যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এবং বস্তুত সকলের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিমধ্যে যে সকল নিয়ম নিশ্চয় ও অভ্রান্তরূপে প্রবর্ত্তমান আছে তাহা যাহাতে ভঙ্গ না হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হয়। উক্ত গুণ এমত ঐশিক ও প্রশস্ত যে ধর্ম্মবিষয়ে সদ্বিচার ও পূর্ণতার জ্ঞান যতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা উহা হইতে আত্মা লাভ করে; এবং আত্মন্যায়, ভ্রাতৃন্যায় ও বিশ্বন্যায় যে প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা উহা দ্বারা প্রমাণিত হয়। কি ব্যবহার শাস্ত্র, কি শাসনপ্রণালী, কি বিজ্ঞানশাস্ত্র, কি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বিষয়েই উত্তমরূপে বিকশিত আত্মার নিকট ন্যায়ই সর্ব্বমান্য। ন্যায় হইতে পরাক্রমের উদ্ভব।

৩। পরাক্রম।

ন্যায়ের অধিকতর বিকাশের নাম পরাক্রম। ইহা অপত্যপ্রেমের রক্ষয়িতা স্বরূপ। অন্তঃকরণের প্রত্যেক ভাবকে অচলা শক্তি ও তেজ প্রদান করা, ও পরের উপকার ও অধিকার সম্বন্ধীয় কল্পনা সকলকে স্ফূরিত, বর্দ্ধিত ও নির্ব্বাহিত করা উহার কার্য্য। উক্ত বৃত্তি দ্বারা এই চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল ও প্রজাবৃদ্ধিকারী জগতের সহিত আত্মার স্পষ্ট যোগ সংস্থাপিত হয়। প্রয়োজক শক্তি সকলকে বিবেচনা পূর্ব্বক কি প্রকারে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবেক; অপত্যপ্রেমকে স্বীয় বিবিধ কার্য্যে কি প্রকারে নিয়মের অধীনে রাখিতে হইবেক, কিরূপে বলোৎপাদন ও তাহার তেজ একাগ্রবর্ত্তী করা যাইতে পারে; এবং সৃষ্টির যে নানা প্রকার গতি বুদ্ধিগোচর হয় তাহা কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, এই সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা পরাক্রম হইতে পাওয়া যায়। উক্ত বৃত্তিরই সাহায্যে আমরা শিল্পকারী শক্তি সকল অবধারণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আন্তরিক অভিপ্রায় সকল

সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হই। উপযোগিতা কার্য্যের শুভফল অবগত করে; ন্যায় স্বত্ব নির্ণয় করে; এবং পরাক্রম ঐ দুইয়ের অভিপ্রায় সকল সম্পাদন করে। পরাক্রম দ্বারা প্রত্যেক মানসিক চিন্তা ও ভাব উত্তেজিত হয়। পরাক্রম হইতে শোভা উৎপন্ন হয়।

৪। শোভা।

পরাক্রমের পূর্ণতর আকার ও অধিকতর বিকাশের নাম শোভা। উহা ভ্রাতৃপ্রেমের রক্ষকস্বরূপ। এবং অংশ বা ব্যক্তির সকলের পরস্পর মিল, উপযুক্ততা, শৃঙ্খলা ও নির্ভরতা দেখান অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে উপযোগিতা, ন্যায় ও পরাক্রমের গুণ একত্রিত করা উহার কার্য্য। উক্ত বৃত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় গোচর প্রত্যেক বস্তুর আকার, বর্ণ, পরিমাণ, ভারত্ব ও কার্য্যকারিতা প্রভৃতি গুণসকলের পরস্পর যথার্থ সম্বন্ধ জানিতে পারা যায়। যদিও শোভা বস্তুর অবস্থামাত্র, তত্রাচ উক্ত অবস্থাজ্ঞাপক একটি বৃত্তি মনুষ্যের অন্তরে নিহিত না থাকিলে সে তাহা কদাচ উপলব্ধি করিতে পারিত না। প্রজ্ঞার বৃত্তি সকল যত স্ফুরিত হইতে থাকে, এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর যে যথার্থ সম্বন্ধ এবং সমুদায় যে অভিপ্রায়ে সৃজিত হইয়াছে আত্মা তাহা তত পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায়।

শোভা ভ্রাতৃপ্রেমের দম্পতিস্বরূপ, অর্থাৎ উক্তপ্রেম মনোমধ্যে উদ্দীপিত হইলেই পরম শোভা ধারণ করে। পরিবারমণ্ডলীর সহিত তদন্তর্গত ব্যক্তিসকলের, সমাজমণ্ডলীর সহিত পরিবার সকলের, ও জাতির সহিত সমাজ নিচয়ের যে যথার্থ সম্বন্ধ তাহা উক্ত আন্তরিক বৃত্তি দ্বারা জানিতে পারা যায়। শোভা ভ্রাতৃপ্রেমের প্রবল বেগ, অধৈর্য্যতা ও আতিশয্য নিবারণপূর্ব্বক আত্মাকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। শোভা হইতে আশার উৎপত্তি।

৫। আশা।

শোভার পূর্ণ ও উচ্চতর বিকাশের নাম আশা। উহা দ্বারা পিতৃপ্রেম সুরক্ষিত হয়, এবং প্রত্যেক বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট আকার, স্থান, ও গৌরব প্রদান করা—প্রকৃত গুণ ও যোগ্যতার প্রাধান্য অবগত করা—এবং জড়ের উপর মনের কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করা উহার কার্য্য। এই বৃত্তি আত্মাকে আধ্যাত্মিক জগতের সহিত স্পষ্টরূপে যোগ করিয়া দেয়; এবং উহাকে এই উপদেশ দেয় যে "যদি তুমি প্রশংসাভাজন হইবে তবে যোগ্যতার বাঞ্ছা কর; যদি সৎ হইবে, তবে সদ্ভাবকে আশ্রয় কর; এবং যদি ঈশ্বরের ন্যায় হইতে চাহ, তবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য কর। উক্ত বৃত্তি মহত্ত্ব,

মঙ্গলভাব ও ঈশ্বর বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের মূলাধার; এবং আত্মগৌরব, আত্মাদর—আত্মপ্রত্যয়—ও আত্মবশতা—উহার স্বাভাবিক ফল। পিতৃপ্রেম আত্মাতে ভক্তি উৎপন্ন করে; কিন্তু আশা উক্ত ভাবের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন ও গতিকে কোমল নির্ম্মল ও নিয়মিত করে। উক্ত বৃত্তি অনন্ত উন্নতির নিয়মসকল ব্যক্ত করে, এবং সূক্ষ্মতা ও স্ফূর্ত্তির অসীমত্ব বিষয়ে বিশ্বাস জন্মায়।

হিতসাধন জন্য মনুষ্য যে সকল চেষ্টা ও ঈশ্বরের সহবাস জন্য যে আন্তরিক বাসনা করে আশাই তাহার উর্ব্বরা আকর। পিতৃপ্রেম ঐ সকল চেষ্টা ও বাসনাকে জীবন দান করে, কিন্তু আশা উহাদের আকার, স্থান ও আবশ্যকতা নির্দ্দিষ্ট করে, এবং ঐ সকল উদ্যোগ সফল করিবার উদ্দেশ্যে উপযোগিতা, ন্যায়, পরাক্রম ও শোভা গুণনিচয়কে একত্রিত করতঃ বিশ্বব্যাপী উপায় সকল অবলম্বন করে। এই উৎকৃষ্ট বৃত্তি যত স্ফুরিত হইবে মনুষ্যের গৌরব ও মহত্ত্ব তত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। উহা সমধিকরূপে পরিস্ফুট হইলে সামঞ্জস্যের উদয়।

৬। সামঞ্জস্য।

প্রজ্ঞার গুণসমূহের পূর্ণতম আকার ও উচ্চতম বিকাশের নাম সামঞ্জস্য। উহা বিশ্বপ্রেমের রক্ষয়িতা দেবতাস্বরূপ; এবং আত্মার আন্তরিক বৃত্তি সকলের যে প্রকার প্রকৃতি, শিক্ষা ও গতি হইলে মনুষ্য কার্য্যোপযোগী, ন্যায়বান, পরাক্রমী, সুন্দর ও শান্তসমাহিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উহার কার্য্য।

যেমন শেক্সপেয়রের তুল্য কবি না হইলে তাঁহার কাব্য কেহ সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া তাহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে না, এবং ক্রাইষ্টসম ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার গুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ যাঁহার আত্মা সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় নাই তিনি সামঞ্জস্যের প্রকৃত গুণ গ্রহণ ও বর্ণন করিতে কদাচ সমর্থ হন না। উহা মানসিক প্রকৃতির উচ্চতম গুণ, এবং আত্মার সমস্ত বৃত্তিমধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিশ্বপ্রেমের বিষয়ে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উহা সূর্য্যেতে উত্তাপ, বায়ুতে স্নিগ্ধতা, তারকাগণে জ্যোতি, তরুসমূহে পুষ্প এবং সকল জীবে প্রাণ দান করিতেছে।

সামঞ্জস্যের কার্য্যও সেইপ্রকার বিশ্বব্যাপী ও প্রশস্ত। উহা আত্মামধ্যে থাকিয়া অবগত করিতেছে যে এই ধ্বংসশীল শরীরের প্রত্যেক অংশ সমানরূপে পূর্ণ ও পরিপক্ব, অর্থাৎ হৃদয়ে যেরূপ পূর্ণতা ও পরিপক্বতা আছে একগাছি কেশেও সেইরূপ আছে; এবং ঈশ্বরের নিকট কি উচ্চ কি নীচ. কি মহৎ কি ক্ষুদ্র সকলই তুল্য। তিনি সকলেতে পূর্ণ রহিয়া সকলকে সীমাবদ্ধ, যোগ ও সমান করিতেছেন।

ইহার নিকৃষ্টার্থ এই যে পরমেশ্বরের বিশ্বমন্দিরে প্রজ্ঞা বা সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র বিরাজমান—উহার চিহ্ন প্রত্যেক বস্তু ও সকল স্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে; এবং মনুষ্য উক্ত গুণেই পরমেশ্বরের সদৃশ হইয়া তাঁহার অনুকরণ করিতেছে।

সম্পূর্ণরূপে স্ফুরিত মনোমধ্যে উপযোগিতা, ন্যায়, পরাক্রম, শোভা ও আশার প্রত্যেক প্রস্তাবের উপর সামঞ্জস্যের মত সর্ব্বপ্রধান, এবং প্রেম ও প্রজ্ঞার অভিপ্রায় সকল উক্ত গুণের অনুমোদনানুসারে সম্পন্ন হয়। সামঞ্জস্য আত্মার বাঞ্ছিত স্বাদ, গন্ধ, শব্দ, বর্ণ প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর আধিপত্য করে; এবং উহার রাজ্য সমুদায় আত্মায়, পরিবার, সমাজ, জাতি ও বিশ্বের উপরে বিস্তৃত রহিয়াছে। উক্ত বৃত্তি দ্বারা আত্মা জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা জানিতে পারে। আত্মপ্রেম ও উপযোগিতার কার্য্য বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম নাই, কিন্তু ন্যায় দ্বারা উপযুক্ততার, পরাক্রম দ্বারা কার্য্যকারিত্বের, শোভা দ্বারা সুগঠনের ও আশা দ্বারা অনন্ত উন্নতির নিয়ম প্রকাশিত হয়, এবং সামঞ্জস্য কর্ত্তৃক ব্যক্তির নির্ভরতা, পরস্পর আদান-প্রদান, অবস্থা, ক্ষমতা, ব্যবসায়, নিয়তি ও সুখের নিয়ম সকল অভিব্যক্ত হয়।

যে ব্যক্তি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়া আপনার সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার শরীর ও মন যথোচিত ও তুল্যরূপে স্ফুরিত হওতঃ সমস্ত বৃত্তি একতান হইয়াছে, তিনি আধ্যাত্মিক জগতের সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন করিয়াছেন। ইহা হইলেই মানবীয় আত্মা আপন স্রষ্টার সহিত সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হইবে। যে ঐকতানতা ঈশ্বর হইতে বহির্গত হইয়া সমুদায় বিশ্বমধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, মনুষ্য যথোচিতরূপে পরিস্ফুটিত হইলেই সেই ঐকতানতাতে মিলিত হইবে। এই প্রকারে জীব হইতে মনুষ্য ও মনুষ্য হইতে দেবতাতে পরিণত হয়, এবং তৎপরে ঈশ্বর মনুষ্য উভয়ের সম্মিলন ও সমভাবের শৃঙ্খল সম্পূর্ণ হইয়া সমুদায় জগৎ একতান হয়।

উপরি লিখিত মানসিক প্রকৃতির বিবরণ দ্বারা প্রতীতি হইবে যে প্রেম ও প্রজ্ঞা এই দুইটি বীজদ্বারা মন নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রেম স্ত্রী অর্থাৎ দুর্ব্বল ও প্রজ্ঞা পুরুষ অর্থাৎ সবল গুণ; উভয়ে প্রস্ফুটিত ও ফলবান হওয়াই মনের স্বাভাবিক কৌশল। যথার্থতঃ প্রত্যেক প্রকার প্রেম প্রজ্ঞার এক একটি গুণের সহিত মিলিত, যথা আত্মপ্রেম উপযোগিতার সহিত, দাম্পত্যপ্রেম ন্যায়ের সহিত, অপত্যপ্রেম পরাক্রমের সহিত ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত হয়; তাহাতে প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য, চেষ্টা ও ফল উৎপন্ন হইয়া জগতের সুখ ও উন্নতি সংসাধিত হয়।

একতানরূপে স্ফুরিত মানবাত্মাকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এবং উক্ত বৃক্ষের বীজ হইতে যে যে শরীর ও ফল উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

ঐকতানতাবিশিষ্ট মন।

১। বীজ।	২। শরীর বা আকার।	৩। ফল।
আত্মপ্রেম।	উপযোগিতা।	ব্যক্তিগ্রাহিতা।
দাম্পত্যপ্রেম।	ন্যায়।	উদ্বাহ।
অপত্যপ্রেম।	পরাক্রম।	সন্তান।
ভ্রাতৃপ্রেম।	শোভা।	সমাজ।
পিতৃপ্রেম বা ভক্তি।	আশা।	উন্নতি।
বিশ্বপ্রেম।	সামঞ্জস্য বা ঐকতানতা।	সুখ।

যে ব্যক্তির মন একতানরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহারই পক্ষে উক্ত বিবরণ সংযোজ্য, অর্থাৎ তাঁহার আত্মপ্রেম স্বভাবতঃ উপযোগিতার দিকে ধাবিত হয়, এবং এই দুইয়ের সংযোগে ব্যক্তিগ্রাহিতা রূপ ফল জন্মে। সেই প্রকার দাম্পত্যপ্রেম ও ন্যায়ের ফল উদ্বাহ; অপত্যপ্রেম ও পরাক্রমের ফল সন্তান; ভ্রাতৃপ্রেম ও শোভার ফল সমাজ, পিতৃপ্রেম ও আশার ফল উন্নতি, এবং বিশ্বপ্রেম ও সামঞ্জস্যের ফল সুখ। মনুষ্য কি কি আন্তরিক গুণ ধারণ করে, ও স্বীয় ও সামাজিক যথোচিত শিক্ষাদ্বারা পৃথিবীতে ও আধ্যাত্মিক জগতে কি পর্য্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে তাহা উক্ত বিবরণ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি মানবাত্মা স্বয়ং নিষ্পাপী তবে এই পৃথিবীতে কি প্রকারে পাপের উৎপত্তি হইল? কিন্তু যদি মানবাত্মাকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় তবে অবশ্য প্রতীতি হইবে যে উহার পাপকর্ম্মে আন্তরিক প্রবৃত্তি নাই, বরং ধর্ম্মেরই বীজ উহার প্রকৃতিতে নিহিত আছে যাহা উর্ব্বরা ভূমিতে পতিত হইলে সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওতঃ অনন্ত উন্নতির দিকে ধাবিত হইবে।

১। পৃথিবীতে যে সকল অমঙ্গল দেখা যায়, তাহার তিনটি মাত্র কারণ। প্রথম পৈতৃক অর্থাৎ পিতামাতার বিপথগামিতা; দ্বিতীয় শিক্ষার ত্রুটি; তৃতীয় সামাজিক অবস্থার দোষ।

২। অবনীমণ্ডলে যত অনৈক্য দৃষ্ট হয় তাহা অবস্থা ও ঘটনাবলীর ফল মাত্র।

৩। পরমেশ্বরের যে অপার প্রেম শরীরস্থ প্রাণের ন্যায় সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার অসীম জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে সকল বস্তু ও আত্মা সেই প্রেমের আধার স্বরূপ।

৪। মনুষ্য ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ, সুতরাং নিজে স্বভাবতঃ মন্দ নহে এবং কোন নিশ্চয় মন্দ বিষয়েও তাহার অনুরাগ নাই; ফলতঃ যে আপন কোমল অর্থাৎ

অসম্পূর্ণ অবস্থাতে নত বা কুপথগামী হইতে পারে, এবং তাহার এরূপ বক্রভাব দেখিয়া অদূরদর্শী ব্যক্তিরা তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে।

৫। যখন ঈশ্বর সর্ব্বত্র ও সকল বস্তুতে বাস করিতেছেন, তখন তাঁহার স্থানীয় বা বিশেষ অবতার কেহ নাই।

৬। প্রত্যেক মনুষ্যকে পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট তিনটি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবেক, অর্থাৎ প্রথম সন্তান উৎপাদন; দ্বিতীয় যে ঐশিক শক্তি তাহাতে নিহিত আছে তাহার উপযুক্ত চালনা; তৃতীয় প্রাকৃতিক ও পারলৌকিক মূল সত্য সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীপন যাপন করা।

৭। উক্ত তিনটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রকৃতি ও তাহার নিয়ম সকল অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; এবং সমাজ মধ্যে যে সমস্ত অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা প্রবল রহিয়াছে তাহার নিবারণার্থ একশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় আমাদিগের পরস্পরের সহিত যে সকল বাহ্য ও আন্তরিক সম্বন্ধ এবং জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক আছে তাহা নিরূপণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকারে মনুষ্যের ধর্ম্ম-প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয়ক্ষেত্র হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক দেবপ্রকৃতির সহিত যোগ সংস্থাপন করা যাইতে পারে।

আধ্যাত্মিক শক্তি সকল প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় উপযুক্তরূপে চালিত ও নিয়োজিত হইলে নির্ব্বিরোধী ও সর্ব্বশুভকরী ফলোৎপন্ন হয়; কিন্তু ঐ সকল শক্তিকে অযথা রূপে চালিত ও নিয়োজিত করিলে ব্যক্তির এবং সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর ফল প্রসব করিবে। উদাহরণ—যন্ত্রবিষয়ক শক্তি সকল কোন অর্ণবপোতের প্রতি যথাযোগ্যরূপে সংযোজিত করিলে তাহার গতি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়; কিন্তু অবধিপূর্ব্বক নিয়োজিত হইলে সেই শক্তি সকল পোতকে পর্ব্বত বা বালুকাময় দ্বীপে নিক্ষেপপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলে। অগ্নি, জল, বায়ু ও অন্যান্য ভৌতিক পদার্থ সকল উহাদের প্রকৃত অধিকারের বহির্ভূত স্থলে ব্যবহৃত হইলে তাহার অত্যন্ত ভয়ানক ও সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিয়া গুরুতর অনিষ্ট ঘটায়, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্মত উপযুক্ত ক্ষেত্রে চালিত হইলে মানবকুলের সমধিক ও সার্ব্বত্রিক মঙ্গল প্রসব করে। মানবাত্মার বৃত্তি সকলও তদ্রূপ জানিবে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে মনের অন্তর্নিহিত শক্তি সকল অঙ্কুর অবস্থায় নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ থাকে এবং যথাযোগ্যরূপে চালিত ও স্ফুরিত হইলে শুভফলোৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন দোষাশ্রিত প্রকৃতি, প্রতিকূল অবস্থা অথবা অনুপযুক্ত শিক্ষা একে একে কিম্বা সমস্ত মিলিয়া উক্ত শক্তি সকলকে আতিশয্য বা বিপরীত অবস্থাতে উপস্থিত করে তখন উহারা নানা প্রকার অমঙ্গল প্রসব করে যাহার উপশমার্থ সমস্ত সংস্কারকেরা যত্নবান আছেন।

পৈতৃক প্রকৃতি অমঙ্গলের একটি প্রধান কারণ; অর্থাৎ পিতামাতার প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনজনিত যে পাপ জন্মে তদ্দ্বারা সন্তানেরও শরীর ও মন বিকৃত ও সর্ব্বপ্রকারে অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। উহার মস্তিষ্কের আকার ও পরিমাণ এমনি সংকীর্ণ হয় যে তন্মধ্যে আত্মা উপযুক্ত বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না; কিম্বা জন্মাবধি আত্মা এরূপ দুর্ব্বল থাকে যে তাহা সরলভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বভাব বা প্রকৃতি আজন্মকাল সন্তানের প্রতি যে কত কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করে তাহা অতি অল্পসংখ্যক লোক উপলব্ধি করিতে বা বুঝিতে সমর্থ হন। যেমন পিতামাতার মুখাবয়ব সন্তানেতে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তাঁহাদিগের মানসিক অপূর্ণতা ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সকল উহার শৈশবাবস্থা হইতে প্রকাশ পায়। অতএব এইখানে অমঙ্গলের সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে কে অপরাধী? ও কোন্ ব্যক্তিই বা দণ্ডার্হ? যদি বল পিতামাতাই দোষী? কিন্তু ইহাও অসম্ভব নহে যে তাঁহারাও নিজ নিজ জনকজননী হইতে ঐ সকল দোষযুক্ত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে কি পূর্ব্বপুরুষেরাই ঐ অমঙ্গলের কারণ? কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে তাঁহারাও ঐ প্রকার অপূর্ণ ছিলেন। অতএব এরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে যদি আমরা সমস্ত জীবরাজ্য অনুসন্ধান করি তথাচ ইহার প্রকৃত উত্তর প্রাপ্ত হইব না।

ইহা স্মর্ত্তব্য যে কেবল ক্রীতদাসদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত; অপরাধীদিগের প্রাণদণ্ড রহিত; শ্রম, মূলধন ও ক্ষমতার যথোচিত ব্যবস্থা; দরিদ্রদিগকে সাধারণ ভূমি বণ্টন; অথবা ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইলেই সংস্করণ কার্য্য পর্য্যাপ্ত হয় না। ফলতঃ যাহাতে শরীর ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয় তাহারই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। যে সকল ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন ও ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে সন্তান উৎপাদনে বহুতর প্রাকৃতিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তৎপক্ষে কি সংস্কারক, কি শিক্ষক কি অপর ব্যক্তি সমস্তের দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক।

যে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি মন্দ তাহার জ্ঞান স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না, এবং তাহার নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল সামাজিক প্রথার অধীন হইয়া তদনুমোদিত দিকে ধাবিত হয়। ইহাই প্রথমে আত্মার যথার্থ উন্নতি পক্ষে ভয়ানক প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। যাহার উক্ত প্রকার মন্দ প্রকৃতি সে সমাজ মধ্যে তদনুরূপ মন্দ ফল ও অবস্থা উৎপন্ন করে। ইহাতে ঐ ব্যক্তি যে কেবল নিজে ঐ সকল অবস্থার ফলভোগী হয় এমত নহে, প্রত্যুত তাহার অপেক্ষা উত্তম প্রকৃতি লইয়া যে সকল ব্যক্তি পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করে তাহারাও তৎকৃত মন্দ অবস্থার বশীভূত হইবে। এই প্রকারে দোষাশ্রিত মন হইতে যে সকল অনিষ্টকারী ঘটনা উৎপন্ন হয় শত শত ব্যক্তি তাহার অধীন হইয়া আপন আপন স্বভাবকে তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত করে। উক্ত অনিষ্টকারী ঘটনা দ্বারা যে সকল মত ও তাহার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় তাহাই সাধারণ লোকে গ্রহণ ও রক্ষা করে। ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী অবশ্য মন্দ হইবে। অতএব এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল

যে, নিকৃষ্ট প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্য দ্বারা নিকৃষ্ট অবস্থা ও তন্নিবন্ধন নিকৃষ্ট শিক্ষা উৎপন্ন হইবে সুতরাং যে ব্যক্তির প্রকৃতি, অবস্থা ও শিক্ষা দোষযুক্ত তাহার প্রজ্ঞা কখন প্রস্ফুরিত হইতে পারে না। এই হেতু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে উক্ত তিনটি কারণ হইতে সংসারের সমস্ত অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি মধ্যে বিবিধ প্রেম যে প্রকারে ক্রমশঃ উত্থিত ও নিয়মিত বা সামঞ্জস্যরূপে স্ফুরিত হইয়া কার্য্য করে তাহার বিবরণ পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল প্রেমের অযথা স্ফূর্ত্তি ও কার্য্য বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে, কেন না তদ্দ্বারা পরিবার ও সমাজ মধ্যে অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রেম নিচয়ের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী আছে, অর্থাৎ যাহাকে বিপরীত কার্য্য—নৈসর্গিক বা ন্যায় কার্য্য—ও আত্যন্তিক কার্য্য বলিয়া বর্ণিত হয়। ইহার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় দূষ্য ও দ্বিতীয় ন্যায়ানুগত বা নির্দ্দোষ। এক্ষণে উক্ত দূষিত কার্য্যের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আত্মপ্রেমের আতিশয্য ঘটিত অনিষ্ট ফল।

এই প্রেমের আতিশয্য হইতে অনেক অত্যাচার উদ্ভাবিত হয়। যখন কোন ব্যক্তির প্রয়োজন ও বাসনা প্রজ্ঞা ও নৈসর্গিক নিয়মের নির্দ্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে তখন ঐ সকলের অপরিমিত ভোগ ও তৃপ্তি দ্বারা রোগ ও দুঃখ উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়া এরূপ বোধ করে যে তাহারই সুখ ও ব্যবহারের জন্য পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য স্বার্থপর সুখ ইচ্ছার অপরিমিত চরিতার্থতা বিবেকশূন্য ও অত্যন্ত আত্মপ্রেমের চিহ্ন স্বরূপ।

বিপর্য্যয় আত্মপ্রেমের অনিষ্ট ফল।

বিপরীত আত্মপ্রেম হইলে মনুষ্য আপনার গৃহ ধনেতে ও আহারীয় দ্রব্যেতে পূর্ণ থাকিলেও প্রবঞ্চনা, কার্পণ্য, লোভ ও ধনপূজা প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যেমন "শ্লথ" নামক অলস কীট বৃক্ষের শাখায় লম্বমান হইয়া সমস্ত পত্রাদি ভক্ষণ করতঃ উহার জীবন ও সৌন্দর্য্য অপহরণ করে অথচ নিজে কোন উপকারে আইসে না; সেইরূপ বিপরীত আত্মপ্রেমী ব্যক্তি স্পঞ্জের ন্যায় প্রত্যেক প্রাপ্ত বস্তুর রসাকর্ষণ করিয়া লয়, এবং আকুঞ্চন করিলে অর্থাৎ কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে কেবল একপ্রকার কর্দ্দমময় পদার্থ নির্গত হয় যাহা অতিশয় ঘৃণাকর ও সংক্রামক। অতএব আত্মপ্রেমের আতিশয্য ও বৈপরীত্য এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে প্রথমোক্ত

অবস্থা উক্ত বৃত্তির উগ্র বা সন্তপ্তভাব, ও দ্বিতীয় তাহার শীতল অর্থাৎ নিরুৎসাহ, ঘৃণাকর ও কার্পণ্য ভাব বুঝায়।

দাম্পত্যপ্রেমের আতিশয্য ঘটিত দোষ।

দাম্পত্যপ্রেমের আতিশয্য হইলে উদ্বাহ সুখকর হয় না এবং অনুপযুক্ত পাত্রে অনুরাগ বশতঃ নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটে। অর্থাৎ উহা দ্বারা ব্যভিচার, লাম্পট্য ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা জন্মে। মনুষ্য তখন পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সকলেরই প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। এ বিষয়ে যে সকল পশুদের মধ্যে দাম্পত্যের সহিত পরস্পর সম্পূর্ণ মিল ঐকান্তিক স্নেহ ও পরায়ণতা নাই সেই সকলের ন্যায় উক্ত ব্যক্তি কার্য্য করে। এবং অপর অপর বিষয়ে নূতন নূতন মত ও মূল সত্য সকল গ্রহণ পূর্ব্বক নূতন কার্য্যপ্রণালীর বশীভূত হয়।

দাম্পত্যপ্রেমের বিপরীত অবস্থা।

মনুষ্যের ভাব ও কার্য্য অনুন্ন, অস্বাভাবিক ও অমিলকারী হইলে বিপরীত দাম্পত্যপ্রেমের লক্ষণ বুঝায়। উহা দ্বারা পুরুষের স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীর পুরুষের প্রতি বিদ্বেষভাব; এবং বিষয় গোপন ও লোক সঙ্গ ত্যাগ করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। সে ব্যক্তি সকল বিষয়ে অনালাপী এবং কখন কখন পশুবৎ আচারী হয়।

অপত্যপ্রেমের আতিশয্য।

অপত্যপ্রেম অপরিমিতরূপে বর্দ্ধিত হইলে মনুষ্য সকল বর্ণ, অবস্থা ও বংশের শিশুসন্তানের প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করে। কোন কোন নূতন যন্ত্র বা কৌশলের বিশেষ অনুরাগী হইয়া অন্ধবৎ প্রেম ও মায়ার বশীভূত হয়। উক্ত প্রেম প্রজ্ঞা দ্বারা আয়ত্ত না হইলে তাহার চরিতার্থ জন্য মনুষ্য কোন বাধা মানে না বরং সেই বৃত্তির বিষয়ের উপরও অনিষ্ট ঘটায়।

অপত্যপ্রেমের বিপরীত কার্য্য।

এই প্রেম বিপরীত ভাব ধারণ করিলে সন্তানদিগের প্রতি বিরাগ ও তাহাদের প্রয়োজন ও জীবনোদ্দেশ্যের প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে। উক্ত ভাবাক্রান্ত কোন কোন ব্যক্তি ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্ত পাপে পতিত হয়, এবং যাহাতে বালকবালিকাগণ সর্ব্বদা যন্ত্রণা

ও দণ্ড প্রাপ্ত হয় তাহার নানা প্রকার কৌশল রচনা করে। জীব জন্তুর প্রতি নির্দ্দয়াচরণ করা উক্ত বিপরীত প্রেমের এক লক্ষণ।

ভ্রাতৃপ্রেমের আতিশয্য।

এই প্রেমের আতিশয্য হইলে মনুষ্য প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুকে মিত্র জ্ঞানে আলিঙ্গন করে। অতএব সকলের সহিত অবিশেষরূপে সংসর্গ ও মিল করা উক্ত অবস্থার লক্ষণ স্বরূপ।

বিপরীত ভ্রাতৃপ্রেমের অনিষ্ট ফল।

ভ্রাতৃপ্রেম বিপরীত ভাবাপন্ন হইলে যুদ্ধ ও জিঘাংসা উৎপন্ন করে; নিজ প্রতিবাসী ও স্বদেশের প্রতি ঘৃণা জন্মায়, এবং নরহত্যা ও বৈরনির্য্যাতন কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। কোন কোন ব্যক্তি আত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও স্বজাতির প্রতি যে বিরক্তি, ঈর্ষা বা ঘৃণা প্রকাশ করে তাহা উক্ত বিপরীত ভাবেরই ফল। যখন কোন ব্যক্তি লোকের আন্তরিক ভাব, স্বত্বলভ্য, বাঞ্ছা বা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এবং পরপীড়ন ও দৌরাত্ম্য করিতে অনুরক্ত হয় তখনই নিশ্চয় জানিবে যে আত্মার পবিত্র ও সুন্দর বৃত্তি যে ভ্রাতৃপ্রেম তাহা উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বিকৃত ও কুপথগামী হইয়াছে।

পিতৃপ্রেমের আতিশয্য।

পিতৃপ্রেম অত্যন্ত প্রবল হইলে মনুষ্য অবস্থা, বয়স, ক্ষমতা বা গুণেতে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাহাদিগের উপর অসীম বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতা স্থাপিত করে; তাহাদিগের প্রকৃত গুণ বিবেচনা না করিয়া তাহাদিগকে অপরিমিতরূপে স্তুতিবাদ ও পূজা করে; এবং যাহাতে উহার আন্তরিক সুখ জন্মে তাহা মিথ্যা করিয়া গুণবর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বিপরীত পিতৃপ্রেমের অনিষ্ট ফল।

এই সুন্দর প্রেম বিকৃত ও বিপরীত ভাবাপন্ন হইলে মনুষ্যের সকল বিষয়ে অনাস্থা ও অবিশ্বাস এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ বা গুণশ্রেষ্ঠের প্রতি অনাদর জন্মে। অসভ্য ও কুৎসিত ব্যবহার এবং ভক্তি ও সম্মানে সর্ব্বদা অনিচ্ছা উক্ত প্রেমের বিপরীত ভাব। ইহা অপেক্ষা প্রবলতর লক্ষণ এই যে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি অবিশ্বাস, ভ্রাতা

বা দম্পতি সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যতার অস্বীকার, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিজহিতে অমনোযোগ, এবং যাহা দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে জানিতে পারা যায় তাহাতে ঔদাস্য উৎপন্ন হয়।

বিশ্বপ্রেমের আতিশয্যে কি কি অনিষ্ট ফল জন্মে।

বিশ্বপ্রেম অত্যন্ত প্রবল হইলে মনুষ্য সকল বস্তুকে—সমুদায় জগৎকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হয়। সে কোন কার্য্যে বাধা পাইলে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়ে; এবং সম্বন্ধ, বাসনা ও সুখ সমূহের কোন ইতরবিশেষ বিবেচনা করে না। উহা দ্বারা আত্মা অতিশয় উতলা, ব্যগ্র ও প্রবল হয়, কোন বিষয় উহার বাঞ্ছা ও ক্ষমতার অতীত জ্ঞান করে না, অথচ সকল বিষয়ই তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত ও দুষ্প্রাপ্য বোধ হয়।

বিপরীত বিশ্বপ্রেমের অনিষ্ট ফল।

যে ব্যক্তির বিশ্বপ্রেম বিপরীত ভাবাপন্ন হয় সে আপনাকে ও সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুকে ঘৃণা করে। সে সংশয়বাদী, জিঘাংষু, নৃশংস, অনালাপী ও অত্যন্ত স্বার্থপর হয়। উক্ত প্রেম মানবাত্মার অতি মহৎ, পবিত্র ও বলবান্ বৃত্তি, কিন্তু উহা বিকৃত বা বিপরীত হইলে অত্যন্ত মন্দ ফল উৎপন্ন করে। ফলতঃ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে উক্ত পরাক্রমশালী বৃত্তি, পৈতৃক প্রকৃতি, সামাজিক অবস্থা ও ঘটনামূলক শিক্ষার দোষে কদাচিৎ বিপথগামী হয়।

এক্ষণে ব্যক্তি সকল কর্ত্তৃক যে প্রকারে সমাজের অবয়ব নির্ম্মিত হয় তাহার বিবরণ লেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দোষাশ্রিত প্রকৃতি, মন্দ অবস্থা ও অনুপযুক্ত শিক্ষা এই তিনটির মধ্যে কোন না কোন কারণ বশতঃ মনুষ্য দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

মনুষ্য সহস্রতারযুক্ত বাদ্য যন্ত্র স্বরূপ। উহার তার সকলের সুর যথানিয়মে বাঁধিয়া বাজাইলে অতি মধুর ও মনোহর মিলশুদ্ধ স্বর (ঐকতানতা) উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐ যন্ত্র কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইলে এবং উহার সূক্ষ্মতার সকল কঠিন বা অযথারূপে আঘাত পাইলে অতি ভয়ঙ্কর ও অমিল স্বর নির্গত হইবে সন্দেহ নাই। সেই প্রকার কোন শিল্পযন্ত্র সুনির্ম্মিত ও সুন্দররূপে চালিত হইলে মহৎ ও শুভ কার্য্য সম্পাদন করে, কিন্তু তাহা অনুপযুক্ত মতে নির্ব্বাহিত ও নিয়োজিত হইলে পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

জীবনের লক্ষ্য কি?

এ বিষয়ে জনসমাজে অনেক মতভেদ দেখা যায়। যাঁহার ঈশ্বরে তদ্গত চিত্ত তিনি বলেন ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। যাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল তিনি জ্ঞান উপার্জ্জন করাই জীবনের লক্ষ্য বোধ করেন। যিনি অত্যন্ত দয়াবান তিনি পরোপকার করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান করেন। কিন্তু আমি বোধ করি মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা হইতে পারে। পরমেশ্বর আমাদিগকে যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমাদের প্রকৃতিতেই ব্যক্ত রহিয়াছে; আমরা দেখিতেছি যে তিনি আমাদের শরীরে কতকগুলি অঙ্গ দিয়াছেন ও মনোমধ্যে কতিপয় বৃত্তি নিহিত করিয়াছেন। ঐ সকল অঙ্গ ও বৃত্তির চালনা দ্বারা আমরা সুখ অনুভব করি এবং ঐ সকল নিশ্চল থাকিলে কিম্বা অপরিমিতরূপে ব্যবহৃত হইলে আমাদের ক্লেশকর হয়; যথা—পদচালনা দ্বারা শরীরের স্ফূর্ত্তি জন্মে কিন্তু অনেকদূর গমন করিলে শরীর বেদনাযুক্ত হয়। অতএব যাহাতে আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক বৃত্তি যথানিয়মে পরিচালিত হয় তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম এবং তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন,—"Religion is the service of God by the normal use, development, and enjoyment of every limb of the body, every faculty of the spirit, every power we are born to or have acquired."—অর্থাৎ আমরা যে সকল শারীরিক অঙ্গ ও মানসিক বৃত্তি ও শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি অথবা প্রাপ্ত হইয়াছি সেই সকলের স্বাভাবিক ব্যবহার, স্ফূর্ত্তি সম্পাদন ও তৃপ্তি সাধন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করার নাম ধর্ম্ম।

উক্ত শারীরিক অঙ্গ ও মানসিক বৃত্তি সকলের মধ্যে কোনটি হেয় বা পরিবর্জ্জনীয় নহে; যেহেতু ঐ সমস্তই এক মঙ্গলসংকল্প, পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার কার্য্য সকলই পবিত্র ও হিতকর, কেবল অপব্যবহার দ্বারা অপবিত্র বা অনিষ্টকর হইয়া থাকে। অতএব আমাদের মানসিক বৃত্তি সকলের সদ্ব্যবহার করা যেমন আবশ্যক, শারীরিক অঙ্গ সকলের যথোচিত চালনা কারও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়।

আমরা যদি শারীরিক নিয়ম সকল পালন দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা না করি তাহা হইলে রোগগ্রস্ত হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করি এবং জীবনের মহৎ কার্য্য সকলও সম্পাদন করিতে অশক্ত হই। শরীরের সহিত মনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে শরীর অসুস্থ হইলে মানসিক কার্য্য সকলও সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং আত্মারও উন্নতি পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। যে ব্যক্তি পিতামাতা হইতে সুস্থ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নিজে সমুদায় শারীরিক নিয়ম পালন করিয়াছে তাহার শরীর সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া এমন সুন্দর ও মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে যে তাহাকে দেখিবামাত্র মোহিত হইয়া পরমেশ্বরের অপার প্রেম অনুভব করা যায়। এমত ব্যক্তিকে একপ্রকার পুণ্যবান বলা যাইতে পারে, যেহেতু ঈশ্বরের নিয়ম পালনই পুণ্য ও তাহা ভঙ্গ করিলেই পাপ। যাঁহারা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করতঃ ধর্ম্মোন্নতি সাধন করেন তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত হন এবং তাঁহাদিগকে আংশিক পাপী জ্ঞান করা যাইতে পারে।

সেইরূপ মানসিক বৃত্তি সকলের পক্ষে বক্তব্য। এই বৃত্তি সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। যে সকল বৃত্তির উদ্দেশ্য সাংসারিক বিষয়ে অনুরক্তি, আত্মরক্ষা ও স্বার্থলাভ তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বৃত্তি কহা যায়। যে সকল বৃত্তি দ্বারা পদার্থজ্ঞান ও বিচারশক্তি জন্মে তাহাদিগের নাম বুদ্ধিবৃত্তি, আর যে সকল বৃত্তির কার্য্য সম্পূর্ণরূপ নিঃস্বার্থ ও যাহার উদ্দেশ্য পরের মঙ্গল সাধন তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলা যায়। *

উক্ত বৃত্তি সমূহের মধ্যে কোনটি উপেক্ষণীয় নহে, প্রত্যুত লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সকলগুলিই প্রয়োজনীয়; যথা—প্রতিবিধিৎসা অর্থাৎ প্রতিকার করিবার ইচ্ছা অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি, কিন্তু ঐ বৃত্তি না থাকিলে মনুষ্য বীর্য্যহীন হয় এবং সমাজে কোন উপদ্রব ঘটিলে তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। রাগ অতি মন্দ রিপু বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু উহা এককালে রহিত হইলে পরপীড়ন ইত্যাদি অত্যাচার নিবারণের ইচ্ছা হয় না। আর ইহাও স্মর্ত্তব্য যে কি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলেরই আতিশয্য অনিষ্টকর। ভক্তি অতি পবিত্র বৃত্তি, কিন্তু উহার আতিশয্য হইলে এবং বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ বিবেক দ্বারা নিয়মিত না হইলে কাল্পনিক দেবতা বা নির্জীব পদার্থের পূজা করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়। দয়া একটি উৎকৃষ্ট বৃত্তি, কিন্তু ইহা অতিশয় প্রবল হইলে দানের পাত্রাপাত্রের বিবেচনা থাকে না। অতএব যাহাতে কোন বৃত্তির আতিশয্য না হয় তাহার চেষ্টা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

আরও জানা আবশ্যক যে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, এবং মনুষ্য এই দুই গুণে বিভূষিত হওয়ায় সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অন্যান্য বৃত্তি সকলকে উহাদের বশীভূত রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ

ধর্ম্মনীতি। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।

সকল প্রকার মনোবৃত্তি পরস্পর একমত হইয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে তদনুসারে কার্য্য করা বৈধ ও সৎকার্য্য, এবং তদ্বিপরীত কার্য্যই অবৈধ ও অসৎকার্য্য। কিন্তু নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হইলে শেষোক্ত শ্রেষ্ঠবৃত্তিদিগের আদেশ পালন করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রতীতি হইবেক যে কি শারীরিক কি মানসিক সমস্ত বৃত্তি যথানিয়মে ও সামঞ্জস্যরূপে ব্যবহার করতঃ জ্ঞানেতে ও ধর্ম্মেতে উন্নত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। মনুষ্যকে বহুসংখ্যক তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কারণ যেমন উক্ত যন্ত্রের সমুদায় তার সামঞ্জস্যরূপে প্রতিঘাত হইলে সুমধুর বাদ্য উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার মানব প্রকৃতির সমুদায় বৃত্তি সামঞ্জস্যরূপে সঞ্চালিত হইলে মনুষ্য সমস্ত কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক আত্মপ্রসাদ ও বিশুদ্ধ সুখশান্তি লাভ করে। যদি উক্ত যন্ত্রের একটিমাত্র তার ছিন্ন বা অনাহত হয় তাহা হইলে সে যন্ত্র হইতে বিশুদ্ধ বাদ্য উদ্ভাবিত হয় না। সেইরূপ মনুষ্যের কোন শারীরিক অঙ্গ বা মানসিক বৃত্তি অবিদ্যমান বা নিশ্চল থাকিলে সে জীবনের সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে অপারগ হয় সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতেও পারে না।

এ বিষয় প্রণিধান না করিয়া অনেক অনেক ধর্ম্মপ্রচারক নিকৃষ্টবৃত্তি সকলকে নিতান্ত অনিষ্টকর ও পরিহার্য্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সে উপদেশ কখন ফলদায়ক হয় নাই, যেহেতু পরমেশ্বর মানবপ্রকৃতিতে যে সকল বৃত্তি নিহিত করিয়াছেন, তাহাদের উপযুক্ত ভোগ্য বিষয় সকলও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং যখন যে বৃত্তির উপভোগ্য বিষয় উপস্থিত হয়, তখন সেই বৃত্তির চাঞ্চল্য অবশ্যই হইবে। মনুষ্য উক্ত বৃত্তিকে জ্ঞানদ্বারা শাসিত করিতে পারে, কিন্তু তাহা এককালে উচ্ছেদ করিতে পারে না।

মহাত্মা ঈশা এক স্থলে উপদেশ দিয়াছেন, "তোমরা কি আহার করিবে, কি পান করিবে এবং কি পরিধান করিবে তজ্জন্য ভাবিত হইও না, কেন না এই সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্যক আছে তাহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন" ইত্যাদি। এ বিষয়ে এই বক্তব্য যে ঈশ্বর আমাদের সকল অভাব জানেন ইহা সত্য, কিন্তু আমরা পরিশ্রম দ্বারা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আহরণ করিব ইহাও তাঁহার ইচ্ছা, যেহেতু তিনি আমাদের মনে অর্জ্জনস্পৃহা নামক একটি বৃত্তি নিহিত করিয়াছেন যাহার উত্তেজনায় আমরা ঐরূপ কার্য্য করিব। উক্ত উপদেশের শেষভাগে ঈশা আরও বলিয়াছেন যে,—"তোমরা কল্যকার জন্য ভাবিত হইও না, কল্য আপনার বিষয়ে আপনি ভাবিত হইবে।" এই উপদেশ ঈশ্বর প্রদত্ত সাবধানতা বৃত্তির বিপরীত, কেন না উক্ত বৃত্তির উদ্দেশ্য এই যে ভবিষ্যতে কোন দুঃখ বা কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে উপায় করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। উক্ত নীতিবাক্য সকল প্রায় দুই সহস্র বৎসর প্রচারিত হইয়াছে তত্রাপি এ পর্য্যন্ত কয় ব্যক্তি তাহার অনুগামী হইয়াছে? ইহার

এইমাত্র কারণ উপলব্ধি হয় যে ঐ সকল উপদেশ মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধ সুতরাং তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব নহে।

সেই প্রকার অনেক ধর্ম্মপ্রচারক সংসারকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবার আদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম, কারণ যে সকল বৃত্তির উত্তেজনায় সংসার গঠিত হয় তাহা সমস্ত ঈশ্বর প্রদত্ত, সুতরাং তাঁহারই অভিপ্রেত এবং আমাদের পালনীয়, বরং সংসার পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের সন্নিধানে আমরা অপরাধী হইব এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে। সুতরাং দুই দল সৈন্যের পরস্পর যুদ্ধের ন্যায় এক দিকে সংসার ও এক দিকে ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ না দেখাইয়া এককে কার্য্য ও অপরকে কর্ত্তা রূপে বর্ণনা করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপদেশ দেওয়াই ধর্ম্মপ্রচারকদিগের কর্ত্তব্য।

থিওডোর পার্কারের ধর্ম্ম বিষয়ক মত

ধর্ম্ম বিজ্ঞানের তিনটি প্রধান অঙ্গ—প্রথম, ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান; দ্বিতীয়, মনুষ্যের স্বভাব জ্ঞান; তৃতীয়, ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ জ্ঞান।

ঈশ্বর অনন্ত গুণে পূর্ণ। গুণ সকলের যতদূর পূর্ণতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তৎসমুদায় তাঁহাতে বর্ত্তমান। তিনি সত্তাতে পূর্ণ—অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ; শক্তিতে পূর্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্; জ্ঞানেতে পূর্ণ—সর্ব্বজ্ঞ; ন্যায়েতে পূর্ণ—পরম-ন্যায়বান্; স্নেহেতে পূর্ণ—প্রেমময়; এবং প্রকৃতিতে পূর্ণ—পবিত্রস্বরূপ। সমুদায় সৃষ্টির তিনিই সম্পূর্ণ কারণ; তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পূর্ণ ইচ্ছাতে,—পূর্ণ উপায় দ্বারা,—পূর্ণ ফলের জন্য সৃজন করিয়াছেন;—তিনি পূর্ণ বিধাতা হইয়া সৃষ্টির সমুদায় বস্তু এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন যে চরমে কাহারও কোন প্রকারে প্রকৃত অমঙ্গল ঘটিতে পারেনা। তিনি জড় জগৎকে স্বাধীনতা না দিয়া শুভ ফলেরই জন্য কেবল নিয়মের অধীন করিয়াছেন; এবং মানবমণ্ডলীর স্বাধীনতা দ্বারা যে সকল অনিশ্চিত গতি প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা তিনি সৃষ্টিকালেই জানিতে পারিয়া এরূপে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের সম্পূর্ণ মঙ্গল সাধিত হইবেক।

২য়, মনুষ্যের স্বভাব জ্ঞান।

ঈশ্বর যে কার্য্যের নিমিত্ত মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী শক্তি সকলও তাহাকে দিয়াছেন; মনুষ্যের শরীর ঈশ্বরের ঠিক অভিপ্রায় মতই হইয়াছে; তাহাতে এমন কোন অতিরিক্ত অঙ্গ নাই যাহা ধর্ম্মার্থ ছেদন করিয়া ফেলিবার আবশ্যক হয়; কিম্বা এমন কোন অঙ্গেরও অসদ্ভাব নাই, যাহা

ধর্ম্মার্থ সংযোগ করিবার প্রয়োজন হয়। এইরূপ মনুষ্যের আত্মাও দয়াময় ঈশ্বরের ঠিক অভিপ্রায় মত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কিছুই অতিরিক্ত নাই ও কিছুরই অভাব নাই; ধর্ম্মার্থ কোন পুরাতন বৃত্তির উচ্ছেদ কিম্বা কোন নূতন বৃত্তি অন্যত্র হইতে আনিয়া যোগ করিতে হয় না;—ঈশ্বরের যে কার্য্য সম্পাদন জন্য মনুষ্যের মন, বিবেক, হৃদয় ও আত্মা সৃজন করিয়াছেন, তাহারা ঠিক তদুপযুক্তই হইয়াছে; ঐ সকলের তৃপ্তিকর বিষয় সকলও জগতে বর্ত্তমান; এবং যেমন শরীরের পোষণ জন্য সমুদায় সৃষ্টি যথানিয়মে আহার যোগাইতেছে সেই প্রকার মানসিক বৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত বিষয় সকলও বর্ত্তমান রহিয়াছে; যথা বুদ্ধি বৃত্তির চরিতার্থ জন্য সত্য ও সৌন্দর্য্য, বিবেকের জন্য ন্যায়, স্নেহবৃত্তি সকলের জন্য মানব, কুমার ও কুমারী, স্বামী ও স্ত্রী, আত্মীয় ও কুটুম্ব, বন্ধু ও মিত্র, পিতামাতা ও শিশু, এবং আত্মার নিমিত্ত ঈশ্বর।—মনুষ্য যেমন মানব বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ের বাঞ্ছা পূর্ণ করে, ও অন্ন দ্বারা প্রতিদিন উদরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া সেইরূপ স্বভাবতঃ আত্মার পিপাসা দূর করে;— যেমন গার্হস্থ্য, কৃষি অথবা শিল্পকার্য্য সম্পাদন জন্য মানব জাতির কোন প্রত্যাদেশের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভার্থ কোন অলৌকিক সাহায্যেরও অপেক্ষা করে না; যেহেতু ঈশ্বর অন্যান্য কার্য্য সাধনার্থ যেমন উপযুক্ত বৃত্তি সকল দিয়াছেন ধর্ম্মসাধনের জন্যও তদুপযুক্ত বৃত্তি বিধান করিয়াছেন।

মানবীয় বৃত্তি সমূহের স্ফূর্ত্তি বিষয়ে দেখা যায় যে মনুষ্য যেমন বাহ্য জগতে প্রকৃতির উপর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছেন, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ অধ্যাত্ম জগতে ও ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞান বিষয়ে অনেক পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

ঐ সকল বৃত্তিকে স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে গেলে শারীরিক বৃত্তি সকলকে সর্ব্বনিম্নভাগে রাখিতে হয়; এবং মানসিক বৃত্তি সকলের মধ্যে বুদ্ধি বৃত্তি সর্ব্ব নিম্নে, বিবেক তদূর্দ্ধে, ভাববৃত্তিগণকে তদূর্দ্ধে এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত করা উচিত। অতএব মানবরাজ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই যথার্থ অধিপতি; তথাচ উহাকে যথেচ্ছাচারী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেক কিম্বা স্নেহবৃত্তিদিগের স্বাভাবিক স্বত্ব সকল লোপ করিতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। ফলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন যাত্রা ও সমাজ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য ধর্ম্মাবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক।

স্ত্রীকে পুরুষের তুল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য—অর্থাৎ উভয়েই তুল্য-মূল্য। নারী পুরুষ হইতে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ও কোন কোন বিষয়ে ন্যূন; নিকৃষ্টগুণে,—শরীর ও মস্তিষ্কের পরিমাণে—ন্যূন; কিন্তু উৎকৃষ্ট গুণে অর্থাৎ নৈতিক জ্ঞানে, স্নেহগুণে ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ; অতএব সমুদায় বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে নারীকে পুরুষের তুল্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সুতরাং তিনি সকল প্রকার স্বত্বের তুল্য অধিকারিণী। মন, শরীর এবং সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার যেমন অধিকার, পরিবার, সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজ্যশাসন বিষয়েও তদ্রূপ; কিন্তু নারীজাতি যে এই সকল স্বত্ব হইতে বঞ্চিত আছেন, তাহা কেবল পুরুষের বলের কার্য্য ন্যায়ের নহে; ফলতঃ ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে তাঁহারা ঐ সকল স্বত্ব একদিন নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন। যেহেতু মনুষ্যের স্ফূর্ত্তি বিষয়ে দেখা যায় যে তাহার নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল সর্ব্বাগ্রে উদিত ও প্রস্ফুটিত হয়, এবং সমাজের অভ্যুদয়ে নিকৃষ্টবৃত্তিসম্পন্ন লোকেরাই উচ্চপদে অভিষিক্ত হয়; এইজন্য পুরুষ উৎকৃষ্টগুণের ন্যূনতা প্রযুক্ত পশুর তুল্য বল ও বুদ্ধি পাইয়া পৃথিবীর একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেমন উৎকৃষ্টতর বৃত্তি সকল বিলম্বে স্ফুরিত হয় এবং ঐ সকল গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পরে প্রাধান্য লাভ করে, সেইরূপ নারীজাতি এক সময়ে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়া পরিবার, সমাজ, রাজ্যশাসন এবং ধর্ম্মবিষয়ে উৎকৃষ্টতর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত করিবেন; যদ্দ্বারা আমরা এত অধিক সুখ ভোগ করিব যে তাহা এক্ষণে অতি মহৎ লোকেরাও উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না।

৩য়, ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

প্রথমতঃ ঈশ্বরের পক্ষ।

ঈশ্বর পূর্ণ কারণ ও পূর্ণ বিধাতা, এবং সকল মনুষ্যের পিতা ও মাতা। তিনি প্রত্যেককে আপন সমুদায় আত্মা, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞতা, পূর্ণ ন্যায়, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার সহিত ভালবাসেন। তিনি সৃষ্টির প্রথমেই মানব জাতির ও প্রত্যেক মনুষ্যের ভাবী ঘটনা সকল জানিতেন, এবং সেই সকলের নিমিত্ত এ প্রকার বিধান করিয়া রাখিয়াছেন যে চরমে কার্য্যতঃ প্রত্যেক আত্মার পক্ষে শুভফল দর্শিবে। মানব জগতে ঈশ্বরের কার্য্য সম্পাদন জন্য মনুষ্যকে তদুপযোগী স্বাভাবিক শক্তি বা বৃত্তি সকল দিয়াছেন, ঐ সকল বৃত্তির মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কারের বশীভূত ও কতকগুলি স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয়রূপে

সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে নির্ভর করা যাইতে পারে যে তাঁহার নিয়মানুসারে সকল কার্য্যের অন্তিম ফল শুভই হইবে; কিন্তু মনুষ্যের স্বভাবানুসারে ইহাও স্থির জানা যায় যে তিনি ঈশ্বর হইতে কার্য্য সাধনোপযোগী যে সকল শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারও সদ্ব্যবহার আবশ্যক। ইহাতে এই জানা যায় যে ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন কিন্তু তিনি বিধাতা স্বরূপ হইয়া সকল বিষয়ের এরূপ ব্যবস্থা করেন যে প্রত্যেক মনুষ্যের চরমে নিশ্চয় সম্পূর্ণ শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরের লিখিত যুক্তি দ্বারা প্রতীতি হইবেক, পৃথিবীতে যে কোন ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা ঈশ্বরের অপরিজ্ঞাত নহে;—যুডসের বিশ্বাসঘাতকতা ও ঈশার ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া, সকলই তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। যেমন শিশুর প্রথম হাঁটিবার সময় তাহার পদস্খলন হয়, সেইরূপ মনুষ্যের উন্নতি সোপানে উঠিবার সময় সে ভ্রম ও পাপে পতিত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ সকল ঘটনা আকস্মিক মাত্র তাহা উপযুক্ত কালে নিবারিত হইবে। মাতা যদি নিজ শিশু সন্তানদিগের হাঁটিবার সময় দেখেন যে সুস্থ ও সবল সন্তানটী কদাচিৎ, সুস্থ অথচ দুর্ব্বল শিশুটী কখন কখন, ও যেটী খঞ্জ সে নিয়তই পড়িয়া যায়, তাহা হইলে তিনি ঐ তিনটী সন্তানের কোনটিকে ঘৃণা না করিয়া সকলকেই যথোচিত শিক্ষা ও সাহায্য প্রদান করেন। সেইপ্রকার জগন্মাতা তাঁহার সদ্‌গুণযুক্ত সন্তানকে কখন কখন ও নিকৃষ্ট সন্তানগণকে পুনঃ পুনঃ এবং নিতান্ত নীতিজ্ঞানশূন্য সন্তানকে নিয়তই ভ্রম ও পাপে পতিত হইতে দেখিলে তজ্জন্য কাহাকেও ঘৃণা করেন না। প্রত্যুত অনন্তকালের পথে সকল পাপীকে সংস্কৃত ও সুখী করতঃ নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার অমৃত-নিকেতনে লইয়া যান। অজ্ঞানতঃ বা জ্ঞানতঃ পাপ করিলেই যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা ইহলোক ও পরলোকে আত্মার উন্নতির জন্য ঈশ্বর বিধান করিয়াছেন। কিন্তু এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরের ক্রোধ বা অপর কোন কারণ প্রযুক্ত তিনি দুঃখ প্রেরণ করেন না, বস্তুতঃ তাহা তাঁহার পূর্ণগুণ ও প্রেমের উপযুক্ত কার্য্য সাধন জন্যই ঘটিয়া থাকে, উক্ত দুঃখ ঈশ্বরের প্রেরিত ঔষধ স্বরূপ, তাহা চিরস্থায়ী নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যের পক্ষ।

ঈশ্বর মনুষ্যের নিকট তাহার সমুদায় প্রয়োজনীয় বিধান করিবার জন্য ঋণী আছেন, এবং মনুষ্যও চিরকাল তাঁহার নিকট প্রতিপালিত হইবার সম্পূর্ণ ও অপরিহার্য্য অধিকার

রাখে; সে কোন প্রকার দুষ্কৃতির দ্বারা সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত ও বিনষ্ট হয় না। যদি ইহা অস্বীকার করা যায় তবে ঈশ্বরের মহিমার নিন্দাবাদ হয়; কেননা তাহা হইলে ঈশ্বরের কোন না কোন গুণের পূর্ণতা পক্ষে দোষ স্পর্শে, অর্থাৎ তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, ন্যায়, প্রেম অথবা পবিত্রতা গুণের ন্যূনতা বুঝায়; ইহাতে ঈশ্বর অপরিমিত না হইয়া পরিমিত হইয়া পড়েন। যেমন মনুষ্যের প্রতি তাহার প্রয়োজন সকল বিধান করা ঈশ্বরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সেইরূপ ধর্ম্মাচরণ করা ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই ধর্ম্মের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, যাহাতে মানব জীবনের সমুদায় বাহ্য ও অন্তর প্রদেশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ধর্ম্মের অন্তর্বিভাগের নাম—ভক্তি (Piety) যাহার দ্বারা সামান্যতঃ সমুদায় মন, বিবেক, হৃদয় ও আত্মার সহিত ঈশ্বরকে প্রীতি করা বুঝায়; এবং বিশেষরূপে কহিলে, বুদ্ধির সহিত সত্য ও সৌন্দর্য্যকে, বিবেকের সহিত ন্যায়কে, স্নেহের সহিত মনুষ্যগণকে ও আত্মার সহিত পবিত্রতাকে ভালবাসা প্রকাশ করে। উক্ত সমুদায় বৃত্তির সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইবার স্থল কেবল ঈশ্বরই; কারণ তিনি সম্পূর্ণ সত্য ও সুন্দর, সম্পূর্ণ ন্যায়বান্, সম্পূর্ণ প্রেমময়, এবং সম্পূর্ণ পবিত্র; তিনি সকলের পিতা ও সকলের মাতা।

ধর্ম্মের বহির্ভাগের নাম—নীতি। শরীর ও আত্মা, মন ও বিবেক, হৃদয় ও প্রাণ সম্বন্ধীয় যে সকল স্বাভাবিক নিয়ম ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতিতে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা পালন করা নীতির কার্য্য। ঐ সকল নিয়মের প্রত্যেকটী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ বিবেচনা করিয়া তাহা রক্ষা করা আমাদের যথার্থ ধর্ম্ম। মনুষ্য অন্তর্বোধ দ্বারা ঈশ্বরের নিয়ম সকল জানিতে পারে, সুতরাং সেই নিয়মজ্ঞান প্রকৃতিমূলক। এই নীতিজ্ঞান দ্বারা ইহাও জানা যায় যে শরীরকে আত্মার অধীনে, এবং মানসিক বৃত্তি সমূহের মধ্যে নিকৃষ্টদিগকে উৎকৃষ্টের বশে রাখা কর্ত্তব্য; যাহার দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্নেহবৃত্তির পক্ষপাতিতা, ন্যায়ের নির্দ্দয়তা, বুদ্ধিবৃত্তির অদূরদর্শিতা, নিবারিত ও ইন্দ্রিয়গণ শাসিত হইতে পারে। কিন্তু সাবধান, আত্মা যেন শরীরকে পীড়ন না করে, কেননা আত্মার ন্যায় শরীরও পবিত্র; সুতরাং ইহার স্বাভাবিক ইচ্ছা সকলও পবিত্র, সেইরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে মন, বিবেক ও স্নেহের উপর অত্যাচার করিতে দেওয়াও উচিত নহে। ফলতঃ সমস্ত বৃত্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে এরূপে নিয়োজিত করিতে হইবে যে তদ্দ্বারা একটি মহৎ সামঞ্জস্য সম্পাদিত হয়, যাহাতে সমষ্টির জন্য কোন অংশের অথবা অংশের জন্য সমষ্টির হানি না হয়। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই হয় যে, মনুষ্য শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল এবং জড় ও মনুষ্যের উপর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ যে কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে

তৎসমুদায়ের স্বাভাবিক ব্যবহার, স্ফূর্ত্তি সম্পাদন, ও উপভোগ দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করা তাহার ধর্ম্ম।

উক্ত ধর্ম্মের বিধি এই—অন্তরে পাপের জন্য অনুতাপ ও পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা কর; ঈশ্বরে ও তাঁহার প্রদত্ত বিষয় সকলে পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হও; এবং বাহিরে—গৃহমধ্যে কি রাজপথে, কি শস্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্রেই জীবনের দৈনিক কার্য্য সকল সুসম্পন্ন কর, যাহাতে লোকের শোকাপনয়ন, পীড়া শান্তি ও সুখ সাধন হইতে পারে।

মহাপুরুষ

"মহাপুরুষ" এই কথা লইয়া এক্ষণে অতিশয় আন্দোলন চলিতেছে এবং তদ্বিষয়ে নানা প্রকার মতও প্রকাশিত হইতেছে, অতএব থিওডোর পার্কার এ বিষয়ে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার অনুবাদ সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম বোধ করি তাহা পাঠকবর্গের বিরক্তিকর হইবেক না।

"মহাপুরুষের জন্ম কোন আকস্মিক বা দৈব ঘটনা নহে উহা বহুকালের কারণ পুঞ্জের ফল-স্বরূপ। কোন অলৌকিক কার্য্য দ্বারা ঐ প্রকার মনুষ্যের উৎপত্তি হয় না; অধিকন্তু আমরা কখন বলিতে পারি না যে কোনও মনুষ্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয় নাই কারণ মানব জাতির বর্ত্তমান অবস্থা ও পুরাবৃত্তের সহিত তাঁহার প্রকৃতির ঐক্য স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যে জাতি হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার ভিতরে তাঁহার নিমিত্ত বিশেষ আয়োজন প্রস্তুত হইয়া থাকে।—যে সকল গুণের বীজ বহুকাল পূর্ব্বে বংশ মধ্যে পতিত হইয়াছিল তাহা একত্রিত হইয়া স্বজাতির বিশেষ প্রকৃতি তাঁহাকে লক্ষিত হয়। ক্রিষ্টফর কোলম্বসের তুল্য মনুষ্যগণ কেবল নাবিকজাতি হইতেই উদ্ভব হইতে পারে; তাঁহাদিগের মাতাও সমুদ্রতীরবাসিনী থাকা আবশ্যক। আর্কিমিডিস ও লিবেরিয়র সদৃশ গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল অতি চিন্তাশীল জাতি মধ্যেই জন্মিতে পারেন। আমি বোধ করি সক্রেতিস কেবল গ্রীক্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইতে পারিতেন তাঁহার প্রকৃতি ঠিক আথেন্স নগরবাসীর ন্যায় ছিল। রোমন্ জাতির যে উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ ও রাজ্য শাসনে অভিরুচি, লোকদিগকে দলবন্ধ করিবার প্রবল শক্তি এবং মানব জীবনের প্রতি অত্যন্ত ঔদাসীন্য তাহা রোমের মহাপুরুষ জুলিয়স সীজরে দেদীপ্যমান ছিল। সেইরূপ বেকন শেক্সপিয়ার নিউটন ক্রমওয়েল প্রভৃতি যে সকল শ্রেষ্ঠ ইংরাজ ছিলেন তাঁহারাও মানবপ্রকৃতিবিশিষ্ট এবং ইংরাজি জাতির বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকার একজন মহাপুরুষ ছিলেন তাঁহাতেও স্বজাতির সদসৎগুণ সকল মিলিত হইয়াছিল। নিউ ইংলণ্ডের সেই পূর্ণ উজ্জ্বল কুসুম অন্য কোন দেশে জন্মিতে ও বর্দ্ধিত হইতে পারিত না; সেই মানবীয় সুবর্ণ মুদ্রার পক্ষে কেবল মার্কিন দেশের টঙ্ক শালায় নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভব।

ঈশ্বর সমস্ত মনুষ্যকে এক পরিবার করিয়াও আবার পৃথক পৃথক জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক মনুষ্য স্বজাতির লক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে; সেই হেতু কাফ্রি আপন চর্ম্মের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। যদিও ডনহমবোল্ট পৃথিবীর সকল দেশেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনেক প্রকার ভাষা কহিতে ও লিখিতে পারিতেন; তত্রাপি জর্ম্মনি ভিন্ন অন্য কোন দেশের তাঁহার জন্ম হওয়া অসম্ভব ছিল। তিনি যে সকল পুস্তক ও লিপি রচনা করিয়াছেন, তাহার সমুদায়ের মধ্যেই স্বকীয় জাতির প্রধান লক্ষণ সকল সেইরূপ জাজ্বল্যমান্ যেরূপ তাঁহার মুখশ্রীতে আপন জনক জননীর অবয়ব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। আমরা কেমন সহজে কৃষ্ণ, লোহিত, শ্বেতবর্ণের মনুষ্যগণকে প্রভেদ করিতে পারি; আবার শ্বেতকায়দিগের মধ্যেও ইংরাজ, মার্কিন, জর্ম্মণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতির মনুষ্যকে পৃথকরূপে চিনিত পারি। অতএব যে আদিপুরুষ হইতে যে মনুষ্যের জন্ম হয় সেই পুরুষের গুণ সকলও তাহার প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়। আমাদের সমুদায় কার্য্যেতেও স্বজাতির লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

"এই জাতিতত্ত্বের অনিবার্য্য নিয়ম কি ভয়ানক হইত, যদি তাহা আকস্মিক বা অন্ধনিয়তি দ্বারা উৎপন্ন হইত। কিন্তু যখন আমরা বুঝিতে পারি যে পরমেশ্বর পূর্ব্ব হইতে সকল বিষয় জানেন ও সকল কার্য্যকে মঙ্গলে পরিণত করেন, এবং উক্ত ঘটনা তাঁহার স্বর্গীয় বিধানের ফল স্বরূপ, তখন উহা অতি উপাদেয় ও কল্যাণকর বোধ হয়। আমরা পরস্পরের সাহায্য করিতে পারিব এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর সকল মনুষ্যকে এক প্রকৃতি করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন জাতিত্ব দিয়াছেন। সেইরূপ একটি হস্ত পাঁচটী অঙ্গুলি দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় অধিক নমনশীল ও কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। দেশের জলবায়ু, স্বাভাবিক দৃশ্য, ব্যবসায়, সমাজ ও জাতীয় ইতিবৃত্ত অনুসারে মনুষ্যদিগের প্রকৃতি সংগঠিত হয়, সুতরাং নিয়তির আবরণে আমরা সকলে বেষ্টিত আছি।"

"অসাধারণ জ্ঞানবান মনুষ্য উত্তরকালীয় লোকদিগের সভায় সেই জাতির আদর্শ স্বরূপ প্রতীয়মান হইবেন বলিয়া তাঁহার যোগ্যতার নিদর্শন পত্র অতি বৃহৎ ও বলবান অক্ষরে লিখিত হয়। মহাপুরুষেরা মানবকুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, সুতরাং তাঁহারা নীচ জাতি হইতে কখন উৎপন্ন হয়েন না; যেমন দুর্ব্বল ও অনুপযুক্ত মৃত্তিকাতে বৃহৎ বৃক্ষ কখন জন্মে না, সেইরূপ প্রত্যেক মহাপুরুষ অসাধারণ বংশ ভিন্ন জন্ম পরিগ্রহ করেন না। তন্নিমিত্ত বহুকালাবধি ক্রমাগত কর্ষণ দ্বারা বংশীয় ক্ষেত্র বিশেষরূপে প্রস্তুত হইলে পর তাহাতে তদ্রূপ মহাপুরুষের জন্ম হয়। যদি কোন মহাপুরুষের বংশ বিবরণ অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে এক বা দুই শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃ বা মাতৃকুলের কোন্ পুরুষ বা স্ত্রীতে তাঁহার কিছু না কিছু সাদৃশ্য ছিল। অতএব পরিষ্কার আকাশ হইতে হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় কোন দৈব ঘটনা দ্বারা তাঁহার জন্ম হয় নাই। যেমন আপেল বৃক্ষ হইতে আপেল, ও পদ্ম হইতেই পদ্মই উৎপন্ন হয়,

কিন্তু নিয়মিতরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে যে মূলবৃক্ষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল ও পুষ্প প্রসব করে তাহা কিছুই বিচিত্র নহে, মহাপুরুষও সেইরূপে উদ্ভব হইয়া থাকেন। সচেতন কি অচেতন প্রত্যেক প্রাণী নিজ নিজ জাতীয় সন্তান উৎপাদন করে। যদি কেহ অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের দুইশত বৎসরের পূর্ব্ব পুরুষগণের চরিত্র নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার সাক্ষাৎ কারণ তিনি জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক পশুপালক উক্ত নিয়ম ইতরজন্তু সম্বন্ধে অবগত আছে, কেননা সে যখন একটি গাভী ক্রয় করিতে যায় তখন সে গাভীর কেবল পিতামাতার বিষয় জানিয়া ক্ষান্ত থাকে না সে তাহার পিতামহ ও পিতামহীর অবস্থা জানিতে চাহে। আমাদেরও গুণ সেইরূপ আমাদের পূর্ব্ব বংশের উপর নির্ভর করে, তবে কিনা মহাপুরুষ স্থলেই তাহা অধিকরূপে প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে কেহই নিরবলম্ব নহেন, সকলেই আপন আপন পিতামাতার প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন এবং ইঁহারাও আবার তৎপূর্ব্বে বংশের উপর নির্ভর করিয়াছেন। কেবল এইমাত্র বিশেষ যে মহাপুরুষ আমাদের সকলের অপেক্ষা মহান্ তজ্জন্য তিনি কি অবলম্বন করিয়া সেইরূপ হইয়াছেন তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

"আমি বোধ করি নেজারথের ঈশা ইহুদিজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে উদ্ভব হইতে পারিতেন না। তাঁহার চরিত্রে উক্ত জাতির সদসৎ সমুদায় লক্ষণ দীপ্যমান ছিল। পবিত্র আত্মা তাঁহার জন্মদাতা বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা অলীক কারণ। কথিত মহাত্মার অন্তর্বাহিরে ইহুদির সম্পূর্ণ লক্ষণ ছিল; তাহা তজ্জাতীয় পিতা ও মাতা উভয় ভিন্ন কেবল এক জন হইতে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন অথবা রবার্ট বরন্‌সের ন্যায় তিনিও সম্পূর্ণরূপে স্বজাতীয় লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। লোকে বলে তাঁহার মানবীয় স্বভাব ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল কিন্তু কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে দেখিতে পাইবে যে, তাঁহার মন স্বজাতীয় শাস্ত্র দ্বারা এত রঞ্জিত হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রত্যেক চিন্তা ও বাক্যে সেইরূপ প্রকাশ পাইত। তিনি পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র (Old Testament) এত গাঢ় রূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন যে তাঁহার সমুদায় বাক্যে ঐ শাস্ত্রোক্ত বচন সকল ব্যক্ত হইত। স্বজাতীয় ইতিবৃত্ত হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক মত ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহুদিদিগের "মেসাইয়া" অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা অবতীর্ণ হইবার যে সংস্কার ছিল তাহা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া তাঁহার মানবীয় জ্ঞানকে এক বিশেষ পথে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি যখন ইহুদি ছিলেন তখন সুতরাং মনুষ্যই ছিলেন।

"কোন মহাপুরুষের আগমন হইলে তাঁহা কর্ত্তৃক লোকের অবস্থা গভীর ও বিস্তারিতরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কোলম্বসের সদৃশ প্রত্যেক মহাপুরুষ মানব জাতির জন্য শিল্প; বিজ্ঞান, সাহিত্য, নীতি, ধর্ম্ম ও সর্ব্বজন হিতকর কার্য্যের একটি নূতন রাজ্য প্রস্তুত করিয়া যান। কিন্তু সেই ব্যক্তি যে পরিমাণে মহৎ ও স্বতঃসিদ্ধ হইবেন

ও যে পরিমাণে তিনি মানব জাতির মনের উপর ভবিষ্যতে শত শতবর্ষ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণে প্রথমে তাঁহার প্রতি লোকের অত্যাচার হইবেক এবং সাধারণ লোকের নিকট তাঁহার গুণগ্রাম অপরিচিত থাকিবেক। শেক্সপিয়রের জীবনাবস্থায় কেহ তাঁহাকে কবি বলিয়া বড় জানিত না। বেকন নিজে বিষয়ী এবং স্বতঃসিদ্ধ মহাজ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন, শেক্সপিয়রের নাটক সকলের বিষয় অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন এবং কডওয়ার্থ একজন ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত, অতি পণ্ডিত, প্রকৃত মহৎ, প্রশস্ত বুদ্ধি এবং সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান ও অতীতকালের স্বজাতীয় ও বিজাতীয় নাটকাদি গ্রন্থ সকলের জ্ঞাতা ছিলেন। এই দুই মহা পণ্ডিতের মধ্যে কেহই ইংলণ্ডীয় মহাকবি শেক্সপিয়রের নাম মাত্র উল্লেখ করেন নাই কিন্তু যখন ঐ পণ্ডিতেরা স্বীয় স্বীয় নিভৃত আবাসে বসিয়া তৃণালোকে পাঠ করিতে ছিলেন সেই সময়ে উক্ত কবিরূপ সূর্য্য উচ্চ আকাশে উদিত হইয়া প্রভা বিস্তার করতঃ সমুদায় পৃথিবীতে যে একটি নবদিবসের সৃষ্টি করিলেন তাহা তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

"প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে অতি সামান্য গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন প্রায় অপর লোকে উপাধি (Degree) প্রাপ্ত হয় না। সেণ্টপল্ আপন নামের পরে বড় অক্ষরে ডি, ডি, (D.D.) উপাধি লিখিতে পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহস্থল; যদি পাইয়া থাকেন তবে নিজ নামের পূর্ব্বে ক্ষুদ্র অক্ষরে উহা লিখিত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নূতন যন্ত্রাদি নির্ম্মাতারা কোন বিদ্যালয় হইতে কখনও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই; ইহাতে লোকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করে; এবং জ্ঞানী মনুষ্যেরাও আপনাদের ঐ প্রকার ঘটনাপ্রযুক্ত দুঃখিত হৃদয়ে মৃদুভাবে আক্ষেপ করেন ও নিজ নিজ স্ত্রী কন্যাদির নিকট লোকের অকৃতজ্ঞতা ও গুণীব্যক্তির দুঃসময় বলিয়া পরিচয় দেন; কারণ তাঁহার অসাধারণ গুণ যে কেবল আকাশ পথে ভ্রমণ করিবেন তাহা তিনি চাহেন না, ফলতঃ তিনি নিজে ছয় ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়া রাজপথে গমন করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রত্যাশা। হে দুর্ভাগ্য মনুষ্য! যখন ঈশ্বর সক্রেতিসের ন্যায় জ্ঞানী, শেক্সপিয়রের তুল্য কবি, কিম্বা ঈশার সাদৃশ্য ধার্ম্মিককে প্রেরণ করেন তখন তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে কোন সম্মান দিবার প্রয়োজন হয় না; কারণ তিনি আপন উপাধি কোন বিদ্যালয় বা ধর্ম্মসমাজের নিকট গ্রহণ না করিয়া প্রভুর নিজ হস্ত হইতে প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু যখন তিনি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিকেতনে গমন করেন, যেখানে বিদ্বান বা ধর্ম্ম সমাজের প্রশংসা পত্র অপ্রাপ্তি জন্য খেদ করিতে হয় না, সেই সময়ে লোকদিগের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন।

"অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম দেশস্থ সমুদায় লোকের চেষ্টার সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ। তিনি স্বতঃ পৃথিবীতে আগমন করেন না। ইজিপ্ট দেশে পিরামিড নামক যে বৃহৎ চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, তাহা উক্ত দেশস্থ সমুদায় লোকের সাতিশয়

পরিশ্রম ও যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই প্রকার নেজারথের ঈশা সমস্ত ইহুদি জাতির কার্য্য স্বরূপ জানিবে; উহা উক্ত জাতির সমুদায় জীবনের চরমফল ও শ্রেষ্ঠ পিরামিড এবং প্যালেষ্টাইন দেশের সুমহৎ কীর্ত্তি। যখন মুসা ইহুদি দিগকে ইজিপ্ট দেশ হইতে লইয়া যান সেই সময় হইতে ঈশা জন্মিবার সূত্রপাত হইয়াছিল।

"মহাপুরুষ আপনার ক্ষমতা যে বিষয়ে ও যে পরিমাণে সঞ্চালিত করেন সেই বিষয়ে ও সেই পরিমাণে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত স্বজাতীয় মনুষ্যগণের ভাব ও চিন্তা বিচলিত হইতে থাকে। তিনি লোকান্তরিত হইলে পর তাঁহার গুণ জীবিত থাকে এবং তাঁহার মত ও বীর্য্য দেশস্থ লোকদিগের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি নূতন শক্তি-স্বরূপ হইয়া তাঁহার তুল্য মনুষ্য সকল প্রস্তুত করিতে থাকে। বহুকাল হইল শেক্সপিয়র, বেকন ও নিউটন পরলোক গমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের গুণ সকল অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। যে সকল মানসিক মহতীশক্তি ঘনীভূত হইয়া কাহাকে তত্ত্বদর্শী ও কাহাকে গণিতবিদ্যাবেত্তা করিয়াছিল, এক্ষণে সেই শক্তি সহস্রগুণে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। সেইপ্রকার যদিও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মৃত্যু ও ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরীর কোয়েকর সম্প্রদায়ের গীর্জার প্রাঙ্গণে তাঁহার দেহের সমাধি হইয়াছে, তথাপি এক্ষণে আমেরিকা দেশ মধ্যে তাঁহার সদৃশ গুণবিশিষ্ট এত মনুষ্যকে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বে তত কখন ছিল না; এমন কি তাঁহার সময় অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক হইবেক। ইউনাইটেড ষ্টেটের শতাধিক স্থান তাঁহার নামে পরিচিত হওয়াতে, উক্ত দেশের ভূগোল বৃত্তান্ত মধ্যে তাঁহার নাম যে পরিমাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার মন আমাদিগের মনোমধ্যে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ফলতঃ মহাপুরুষের যে অসাধারণ প্রকৃতি তাহা এক বংশের মধ্যে স্থায়ী হয় না। তাঁহার পূর্ব্ববংশরূপ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকার নীচে দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে অনেক শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকে; পরে উপযুক্ত সময়ে মহাপুরুষরূপে অগুরু পুষ্প প্রসব করিয়া সে বৃক্ষ মৃত হয়। আমি বোধ করি পৃথিবীতে কোন বংশে দুইটি মহাপুরুষ কখন জন্মে না; যথা শেক্সপিয়রের বংশে ঐ নামে একটি ও বরন্‌সের বংশে তন্নামে একটী ভিন্ন দুইটী মহাপুরুষ পাওয়া যায় না। বেকন নামে দুইটী মহাপুরুষ ছিলেন তাঁহারা উভয়ে যদিও ইংরাজ কিন্তু এক বংশজাত নহেন। তেমনি একটী ফ্রাঙ্কলিন এক কৃবিয়র একটী লাইব্‌নিট্‌জ ও একটী ক্যাণ্ট ছিলেন। এই সকল মহাপুরুষদের সহস্র সংখ্যক সন্তান জন্মিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সদৃশ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কাহাকেও দেখা যায় না, যেহেতু উক্তরূপে অগুরুপুষ্প যে বংশবৃক্ষে একবার প্রস্ফুটিত হয় তাহাতে আর দ্বিতীয় জন্মে না। ইহাও অসম্ভব নহে যে প্রত্যেক বংশে কালক্রমে একটি মহাপুরুষ জন্মিতে পারে, কেবল কোন কোন বংশে উক্ত পুষ্প অসময়ে নির্গত হওয়াতে নষ্ট হয়, ও কোন কোন বংশে সহস্র বৎসরে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যখন সেই

পুষ্প প্রসব দ্বারা বৃক্ষভগ্ন হইয়া যায় তখন তাহার ফলবীজ দেশময় ব্যাপ্ত হয়; এবং সেই মহাপুরুষের প্রকৃতিরূপ সম্পত্তি তাঁহার সন্তানের অধিকৃত না হইয়া সমস্ত মানবগণের ভোগ্য হয়। যদিও এক্ষণে ঈশা অবর্ত্তমান কিন্তু তাঁহার গুণসকল কেবল জুড়িয়া দেশমধ্যে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার যে সকল গুণ ছিল তাহা এক্ষণে মানব জাতিতে অর্পিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মধনের মহাধনী, আপন সম্পত্তি মানবমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর সেই সম্পত্তির রক্ষক হইয়া সর্ব্বকালের হিতার্থ তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। উক্তধন "Spreads undivided operates unspent" বিতরণে বিভক্ত হয় না, ব্যবহারে ক্ষয় হয় না, বরং যত বিস্তৃত হয় ততই গাঢ়তা, ও যত ব্যয়িত হয় ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"মহাপুরুষের নির্ম্মাণশক্তির নিকট মানবপ্রকৃতি অতিশয় নমনশীল হইয়া যায়। যখন আমরা কোন মহাজ্ঞানী ও উৎকৃষ্ট বক্তার মুখে অত্যন্ত হিতকর বাক্য সকল শ্রবণ করি তখন তিনি যেদিকে লইয়া যান আমাদিগের মন সেই দিকে ধাবিত হয়। তাঁহার কপোলদেশ বিবর্ণ হইলে আমাদেরও কপোল ম্লান হয় এবং তাঁহার মুখ আরক্ত হইলে আমাদেরও সেইরূপ হয়। এই প্রকারে মহাপুরুষেরা ক্ষণকালের জন্য নয়—যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া মানবগণের মনকে অধিকার করেন।"

পরিশিষ্ট

(১)
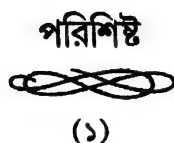
From E. H. Lushington, Esq., Offg. Junior Secretary to the Government of Bengal, To Baboo Shib Chunder Deb, Circular No. 288, Dated Fort William, the 17th June, 1859.

EDUCATION

Sir,

I am directed by the Lieutenant-Governor to request the favor of your furnishing him with your opinion as to the practicability of promoting really cheap Schools for the masses in Bengal like the *Hulkabundee* Schools in the North-Western Provinces.

2. There are not, His Honor desires me to observe, the same available means or agency in Bengal as in the North-Western Provinces for introducing a system similar to the *Hulkabundee* system, but it is not to be assumed that there is no other way of advancing Education among the people at an equally small cost and of an equally good character.

3. His Excellency the Governor General in Council, in remarking upon this question, has observed in Mr. Secretary Grey's Letter No. 1021, dated 17th ultimo, that "there is no *prima facie* reason why, while it is possible to establish Schools in the North-Western Provinces and Behar, at an expense of from 5 to 7 Rupees a month, it should be impossible to establish the same Schools in Bengal for much less than Rupees 20 a month. The wages of labor in the two Provinces are not so unequal as to account for this great difference, and as regards a

popular desire for education, and a supply of masters, the difference, it si believed, is all in favor of Bengal. There is no reason either to suppose that the indigenous Schools of Bengal are upon a much more expensive scale than those of Behar." Again, His Lordship continues, "it is well known that natives of this country will gladly accept service in their own villages for a very small fixed salary. Mr. Harrison, the Inspector of Schools in Behar, in his Report for the 1st Quarter of 1856-57 (paragraph 28) quotes an instance of a man, who being in the receipt of only Rupees 5 a month, declined to leave his village upon a salary of Rupees 30, and it is believed that, among the natives themselves, few if any who are employed in their own villages receive a higher salary than 7 or 8 Rupees a month."

4. The whole subject is one of such vital importance to the interests of the people in Bengal that the Lieutenant-Governor feels assured that it will meet at your hands with the serious consideration it requires, and he trusts to be in possession of your recorded opinion at an early date.

(২)

From the Right Hon'ble Lord Stanley, Secretary of State for India, to His Excellency the Right Hon'ble the Governor-General of India in Council,—(No. 2, dated the 31st December 1858).

My Lord,

Many applications have been recently addressed to the Court of Directors of East India Company and to myself, by persons who, either on behalf of themselves or of Companies which they propose to establish, are desirous of obtaining grants of unoccupied land for the purpose of carrying on the cultivation of cotton and of other exportable products for the supply of Manufacturers in this Country. The replies which have been addressed to these applications have generally been to the effect that, while the Home Authorities desire to extend all proper encouragement to the investment of British capital in the development of the resources of India, it will be necessary that, in regard to grants of land in any particular localities, the applicants should place themselves in communication with the Authorities on the spot. They have been further informed that if it should appear on enquiry that there is land

at the disposal of Government suited for the required purposes, and that the Local Authorities have no objection to offer to its transfer to the persons applying for it, the Home Authorities will be prepared to authorize the grant of such land in perpetuity, on such reasonable terms, and subject to such conditions as may be agreed on between the local Government and the applicants or their agents.

2. The matter having been considered by me in Council, I have now to communicate to you the following observations :—

3. Most of the applicants are anxious to obtain "a grant of land in fee simple", by which term I understand them to mean a grant of land in perpetuity either gratuitously or in consideration of an immediate payment, under which the land should be for ever discharged from all demand on account of land Revenue.

4. I am aware that the extent of land absolutely at the disposal of the Government in India, in which no rights either of proprietorship or of occupancy are known either to exist at present, or to have existed in former times, and consequently liable to be again put forward, is extremely limited. In such Districts as the Dehra Dhoon, Assam, the Sunderbunds, Kumaon, Gurhwal, and others similarly situated, where large tracts of unreclaimed land are to be found absolutely at the disposal of the State, Rules have already been promulgated, under which settlers can obtain allotments on very easy conditions, and for long terms of years; but in no case, I apprehend, extending to a grant in perpetuity. In such cases I desire that you will take such steps as may seem to you expedient for the purpose of permitting grantees to commute the annual payments stipulated for under the Rules (after a specified term of rent-free occupancy) for a fixed sum per acre to be paid on receiving possession of the grant. In all other respects, and particularly in regard to the conditions which provide for a certain proportion of the land to be cleared and brought under cultivation within specified periods, the Rules will of course remain unaltered. You will report to me the course which you propose to follow, in carrying out these instructions.

5. In their Despatch of the 6th May (No. 6) 1857, paragraph 14, the Court of Directors, in reviewing the measures proposed to be adopted on introducing an improved system of Revenue administration into the Districts assigned to us by the Nizam under the Treaty of 1853 informed you that, had the territory been entirely at their disposal, they would have had no objection (considering the large extent of unoccupied land,

to the proprietorship of which there were apparently no claimants) to sanction, as an experiment, "the alienation in perpetuity to any persons of substance and respectability, of land belonging to the Government, upon condition of the application of a certain amount of capital to the cultivation of the most valuable products of the soil," although the Court at the same time expressed an opinion that easy terms of long lease, such as for a period of twenty or thirty years, might be sufficient at present to attract British Capitalists. It does not appear that the Court's suggestion has yet received your attention, and I now desire that you will take it into your consideration.

6. It appears to me that the question of granting unoccupied lands in perpetuity, discharged from all demand for land Revenue on the part of the State, is intimately connected with another question which has of late attracted much attention in this Country, *viz.*, the expediency of permitting the proprietors of Estates, subject to the payment of Revenue, to redeem the land-tax by the immediate payment of a sum of equivalent value. In those parts of India which are under perpetual settlement, such as Bengal and the Northern Circars (so far as the Estates originally permanently settled have not lapsed to Government, and are now under Khas management), the difficulty of arriving at a satisfactory decision will be the least experienced. It is obvious that if a Zemindar, bound to pay in perpetuity a fixed Jumma of a certain amount per annum, is permitted to redeem that obligation by the payment of an immediate equivalent (all existing tenures and rights of occupancy being of course in no way injuriously affected by the transaction) and that the amount so paid is applied to the extinction of debt, the Government remains in precisely the same financial position, the balance of its receipts and charges being unaltered. The process in this case is simply the extinction of a perpetual annuity by the payment of its value in a simple sum; that in estimating that value, it must be borne in mind that, while the perpetual annuity is of fixed amount, liable neither to increase nor diminution, the interest on the public debt, which may be extinguished by the transaction, is of a fluctuating character, and that the charge on the State on its account may hereafter be reduced by judicious financial arrangements.

7. But the political results of such a change cannot be overlooked. The fortunes of the Zemindar, who has bene allowed to extinguish his fixed annual liabilities by a single payment are, from thenceforth, still

more intimately connected than they are at present with those of the British Government. The immunity from taxation which he is enabled under our rule to claim, and which no Native conqueror could be expected to recognize, renders his loyalty a matter of prudence and self-interest. He is attached to the cause of order by a tie similar to, and not less strong than that which binds the fund-holder of a European State. This is not slight advantage, and may fairly be held to counterbalance some inconveniences of detail, which may arise in effecting an arrangement such as is here suggested.

8. In the larger portion of India, where the settlement of the land Revenue is made for limited periods, the difficulties attending such a measure, as the redemption of the land-tax, appear to me to be much less easily encountered. The settlements which have been concluded in the North-West Provinces, and in portions of Bombay, and which are now commenced in the Presidency of Madras, provide for a revision of the money amount payable to the State, in commutation of the Government share of the net proceeds of the land, after the expiration of a period of thirty years, so that if, from whatever cause, the relation between the value of silver and that of agricultural produce should be found to have changed, the opportunity is afforded, from time to time, of re-adjusting the pecuniary demand on the cultivators of the soil, without adding to their burdens, or sacrificing the just dues of the State. This consideration appears to me to be most important, especially in a Country like India, where so large a proportion of the public income has from time immemorial been derived from the share reserved to Government, of the produce of the land. Under such circumstances, the permission to redeem the land-tax can operate only in so far as the people may avail themselves of such permission as a permanent settlement of the land-tax at its present amount. The basis of calculation for the redemption can only be the rate of assessment now actually paid; and the redemption being once effected, the State is for ever precluded, whatever change of circumstances may hereafter take place, from participating in the advantages which, there is every reason to hope and anticipate, will follow the measures which are now in active progress for improving the administration, and for developing the material resources of the Country. Weighing these difficulties on the one hand, but remembering, on the other the importance of affording all possible encouragement to the employment of British capital, skill, and enterprise,

in the development of the material resources of India, I commend to your earnest and early consideration the important questions treated in this Despatch; but I particularly request that in any suggestions or recommendations which you may submit to me, you will be especially careful not to confine them to such as may be calculated for the exclusive advantage of European settlers, and which cannot be equally participated in by the agricultural community generally.

(৩)

From W. Grey, Esq.. Secretary to the Government of India, Home Department, to A. R. Young, Esq., Secretary to the Government of Bengal, — (No. 1518, dated the 1st August 1859.)

Sir,

I am directed to transmit, for the consideration of the Hon'ble the Lieutenant-Governor, a copy of the Secretary of State's Despatch in the Revenue Department noted in the margin, and to request that the Governor-General in Council may be favored with an early communication of the opinions of His Honor on the questions discussed in the Despatch. If it should appear to His Honor desirable to consult any of the Officers of His Government upon the Despatch, the Governor-General in Council sees no objection to that course being taken, but the great importance and difficulty of the questions submitted for consideration would seem to suggest *the expediency of selecting for the purpose of few Officers of mark, rather than of circulating the Despatch for the opinions of the Officers of the Revenue Department generally.*

No 2, dated 31st Dec 1858

2. With regard to the instructions which are conveyed in the 4th paragraph of the Despatch, and which may be at once acted upon, I am directed to state that those instructions are not understood by the Governor-General in Council as dealing with the question of granting lands *in perpetuity*, discharged for ever from all demand on account of land Revenue, but merely as directing that, under the existing rules for the grant of waste lands, grantees shall be permitted to commute the annual payments stipulated for under those rules, by a single payment at the time of receiving possession of the grant. The question of disposing of waste lands in perpetuity, free of all prospective charge

and land Revenue, is understood to be left for consideration as a part of the great general question of permitting the land-tax of India to be redeemed. If there were any doubt as to this being the correct construction of the orders contained in the Despatch now forwarded, it would be removed, I am desired to observe, by the tenor of the 4th paragraph of Lord Stanley's subsequent Despatch No. 1, dated the 16th of March, a copy of which was forwarded to you with my letter No. 866, dated the 27th April. I am to add, that the Governor-General in Council perceives no objection to extending to existing grantees the permission to commute the annual payments, for which they have agreed.

(৪)

From E. H. Lushington, Esq., Offg. Secretary to the Government of Bengla, To Baboo Seeb Chunder Deb, Deputy Collector, Railway Dept., — (No. 2844, dated Fort William, the 23rd November 1859).

REVENUE

Sir,

I am directed to forward herewith, a copy of a letter No. 1518, dated the 1st August last, from the Secretary to the Government of India in the Home Department, together with a copy of Despatch No. 2, dated 31st December last, from the Right Hon'ble the Secretary of State for India, and to request that you will be good enough to favor the Lieutenant-Governor with your opinion on the subjects therein discussed.

2. I am desired to state that your opinion should be submitted with the least practicable delay.

(৫)

From Baboo Shib Chunder Deb, Railway Deputy Collector, To E. H. Lushington, Esq., Offg. Secretary to the Government of Bengal.

Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter No. 2844, dated 23rd ultimo, together with a copy of a letter from the Secretary to the Government of India in the Home Department No. 1518, dated

1st August 1859 and of a Despatch from the Right Hon'ble the Secretary of State for India No. 2., dated 31st December 1858. In reply I beg leave to submit my humble opinion on the important subjects mooted in the communication under acknowledgment.

2. The principal question discussed in the Despatch seems to me to be this, whether it is expedient to permit the land-tax of India to be redeemed by the immediate payment of a sum of equivalent value.

3. In the case of permanently settled Estates the redemption of land-tax, though apparently disadvantageous to the State inasmuch as a large portion of the annual income will be diminished, will, both from financial and political considerations, be found on the whole beneficial. Firstly, because it will reduce the public debt and expenditure, and thus improve the financial position of the country generally. Secondly, because it will hold out a greater incentive to the development of the agricultural and mineral resources of the country, and lead to the amelioration of the condition of the rural community. Thirdly, because it will place the loyalty and attachment of the land-owners to the British Government on a firmer basis.

4. With regard to the rate at which the land revenue should be commuted, I beg to say that although the interest on the public debt varies yet I think 5 per cent may be assumed as the average rate, and therefore 20 years' purchase of the annual revenue of an estate may be considered as a fair value for its redemption.

5. The next question is whether the measure of redemption of land revenue ought to be introduced into the estates which are temporarily settled, or in which the Government demand is adjusted from time to time according to the relation subsisting between the value of silver and that of the agricultural produce.

6. I feel no doubt that it is an admitted principle with the Government that the development of the material resources of the country and the improvement of the condition of the people are objects of paramount importance. In my humble opinion nothing is so much calculated to achieve those objects as the limitation of the Government demand. So long as this demand remains unlimited, that is, liable to increase or decrease, there can be but little incentive to the improvement of the productive resources of the land. When the land-holder knows that if the produce of his land is increased, Government demand is sure to be enhanced, can he have a strong motive to lay out his capital in the improvement of his land?

7. For the above reason I am of opinion that in the temporarily settled estates the Government revenue should, as far as practicable, be limited for ever at an average of 10 years' collections.

8. If the advisability of limiting the land revenue in the estates not permanently settled be admitted, the question of redemption of that revenue by the immediate payment of an equivalent sum becomes easy of solution, and may be treated in the same manner as in the case of the permanently settled mehals.

9. Respecting the question of granting waste lands in perpetuity, discharged for ever from all demand on account of land revenue, I beg to observe that as the rates at which Capitalists would be willing to take waste lands in the first instance, will necessarily be very inadequate with reference to the future capabilities of the soil, I do not consider it advisable to dispose of such lands in perpetuity free of all prospective charge of land revenue. These lands may however be granted on easy terms under the existing Rules for long periods say 100 years, and the grantees be permitted to commute the annual payments, agreed to by them for a fixed sum to be paid on receiving possession of the grant.

FORT WILLIAM
Railway Deputy Collector's Office
The 14th December 1859

(৬)

To

The Magistrate of Serampore

The humble Petition of the Inhabitants of Konnagar.

Most humbly Sheweth,

That your Petitioners beg most respectfully to state that formerly there was not a single shop in this village for the sale of liquor or intoxicating drugs, and that only a limited number of the inhabitants, who were accustomed to the use of the debasing narcotics, used to resort to a shop existing at Rishra a village at a distance of about a mile from this place.

That within the last 6 or 8 years no less than 3 licensed shops, namely 2 of liquor and 1 of Ganja and Opium, have been established in the most conspicuous part of this village.

That your Petitioners believe that these shops have had the most baneful effects on the morals of the people of this village, and regret to observe that a great number of the young men, who, prior to the existence of the above shops, where averse to intemperance, have now decidedly acquired bad habits.

That your Petitioners with due deference beg to remark that the deceptive argument, so often brought forward, that these shops are established to meet the wants of the people, should hold good, were they opened on their application or in compliance with the wishes of the village community; but the fact is too well known to require any proof, that these shops are invariably opened, without the consent of the people and often against their remonstrances.

That authorizing a person to manufacture and sell liquor by paying a certain duty is one thing, and the forced establishment of retail shops in the most tempting places under the direct authority of Government is another. Your Petitioners feel confident that were the innumerable evils resulting from the establishment of such debasing shops, and the horror with which their influence on the habits of the people is viewed both by the Hindoo and the Mahomedan population, known to Government to the fullest extent, an immediate change would be the consequence, because they can never believe that it is the intention of Government to deteriorate the morals of its subjects by persevering in a system, which yields comparatively a little more revenue, than the less objectionable mode observed in England and other civilized countries. For if the argument stated in the preceding paragraph should justify the establishment of deleterious liquor and drug shops all over the country, it would equally hold good in respect to the establishment and support of gambling shops under authority of Government. But the paternal care with which the British Government is known to watch over the interest of its subjects induces your Petitioners to hope that the evils of the Abkaree system, when properly brought to light, will be remedied as those of gambling and similar vices have been.

That your Petitioners beg to urge that irregular habits of living bring on improvident expenses, to meet which, people are not infrequently led to the perpetration of crimes, which, had the temptations that are so abundantly thrown in their way by public houses, not existed, would undoubtedly have never been resorted to.

That in proof of what they have advanced, your Petitioners would beg to represent that gambling, theft and other concomitant vices have of late vastly increased in their village to the great apprehension and loss of your Petitioners.

Under these considerations your Petitioners have been induced to lay this Petition before you in the hope that you will kindly interest yourself in the matter, and, by recommending the closing of the shops, save a thriving and respectable village from ruin, which, considering the rate at which crime and immorality have progressed since the objectionable shops were established, must in a few years more be inevitable.

In conclusion your Petitioners pray that you will be pleased to consider the concession they ask for on special grounds, and as they are not without a precedent, 2 liquor shops having been under nearly similar circumstances removed from the Town of Uttarpara — they beg respectfully that their prayer may be brought to the notice of the higher authorities for their favorable consideration.

And your Petitioners as in duty bound shall ever pray.

KONNAGAR
The 25th June 1853

(৭)

To

The Abkaree Superintendent of Hooghly

The Humble Petition of the Inhabitants of Konnagar,
Zillah Hooghly.

Sheweth,

The your Petitioners beg respectfully to submit herewith their Petition in original to the Joint Magistrate of Serampore dated 25th ultimo with copies of correspondence noted in the margin; from which it will be perceived that your Petitioners had applied to the Police Authorities for the removal of the Abkaree shops, established at Konnagar, and that they have been directed to bring the matter to your notice.

From Joint Magistrate of Serampore to Magte. of Hooghly, No. 170, dated 28th June 1853

From Magte. of Hooghly to Joint Magte. of Serampore, No. 483, dated 1st July 1853.

From the Joint Magte. to the Petitioners No. 176 dated 2nd Idem.

Your Petitioners beg therefore to present this their Petition to you in the hope that you will take it into due consideration and adopt prompt measures for the removal of the shops complained of. As the grounds on which they ask this concession are fully stated in the Petition to the Joint Magistrate of Serampore, your Petitioners think it unnecessary to repeat them here, but would only beg to refer you respectfully to that document.

With reference to Para 2nd of the Hooghly Magistrate's letter to the Joint Magistrate of Serampore, your Petitioners beg to state that all the Abkaree shops at Konnagar have been recently established, and their entire removal is the object your Petitioners have in view.

Your Petitioners perceive however that a slight error crept into their former Petition, which it is proper to correct. They find that there are now in the village two shops instead of three, as stated in that Petition, namely one of liquor and another of Ganja and Opium, the third shop being lately incorporated with the former.

Your Petitioners do not hesitate to declare that they are fully persuaded of the pernicious effects produced by the establishment of the above shops, and their statements have in some measure been borne out by the remarks made by the Joint Magistrate of Serampore in the concluding part of his letter to the Magistrate of Hooghly. Your Petitioners therefore trust that you will be pleased to take a correct view of the matter, and submit it to the favorable consideration of the Abkaree Commissioner.

And your Petitioners as in duty bound shall ever pray.

KONNAGAR,
The 25th July 1853.

(৮)

To

C. K. Dove Esqr.,

Abkaree Supt. of Hooghly

The humble Petition of the Inhabitants of Konnagar,
Zillah Hooghly.

Sheweth,

That with reference to your report to the Abkaree Commissioner, 1st Division, N. 450 dated 12 August last, in which you have been

pleased to declare that you "cannot possibly support the petition of the inhabitants of Konnagar" presented to you on the 10th Idem, requesting the removal of certain Abkaree shops recently established in that village, your Petitioners beg respectfully to urge upon your further consideration that the boon they applied for was solicited on special grounds, they not having presumed to question the justice or contest the legality of a tax, which forms a considerable portion of the public revenue.

That your Petitioners extremely regret that their respectful prayer for the withdrawal of the aforesaid shops, which they consider injurious to public morality, should have been construed into an ebullition of private feeling, which they beg to assure you is not the case, as will appear from the explanations given below.

With regard to the 5th Para, of your Report above quoted, your petitioners beg to state that the majority of the higher classes of the village community, who could alone take steps for the redress of their grievances, being obliged by their occupations to remain at Calcutta during business days and business hours, your periodical visits to the village were either wholly unknown to them, or known only after the opportunity for making any representations had passed away. Moreover, there did not, until lately, exist that unity amongst the inhabitants, the want of which, you will please admit, is a bar to the accomplishment of even the most common municipal objects. This want has however been recently supplied by the establishment, about 12 months ago, of an association, entitled the Konnagar (Hitaishinee Sabha) Benevolent Society, the object of which is to promote by every lawful means the welfare of the community. These circumstances will, your petitioners trust, fully account for the indifference with which they are alleged to have hitherto viewed the establishment of Abkaree shops in the village.

Your petitioners further beg to say that the word "recent" was used in their Petition in a relative sense, as previous to 1841, there did not exist any such shops in their village — the subsequent change in this respect being, your Petitioners humbly submit, not warranted by either the wishes of the community, or their altered necessities.

Your Petitioners do not quite appreciate the force of the argument adduced by you, that as the high price of Europe wines and spirits retailed in the recently established liquor shop at Konnagar precludes the poorer portion of the community (which you assume to

be the class that generally commit crimes against property) from using those beverages, your Petitioners' objections are not applicable to that shop. But your Petitioners believe that the wealthiest, when addicted to drinking and ruined in fame and fortune by a life of profligacy and sin, is as liable to commit such crimes as the poorest inhabitant in the village.

Referring to the 6th Para of your report, your Petitioners beg to state that they cannot admit the argument that because Messrs. Wauchope, Belli, Young, Buckland and Bright, did not record any opinion regarding the increase of crime in their village since the establishment of the Abkaree shops above adverted to, therefore crimes have not actually increased. But on the contrary your Petitioners have found that the evil effects of Abkaree institutions do not exhibit themselves until after sufficient time has elapsed to make those institutions generally popular with the degraded portion of the community, and that therefore the opinion of the latest Magistrate is of more weight in this matter than that of his predecessors.

With respect to paras 7, 8, 9 and 10 of your report, your Petitioners beg respectfully to affirm that Baboo Joy Kissen Mookerjea, whom you have unnecessarily dragged into this question, had no hand in the getting up of their Petition. The subject was discussed at a monthly meeting of the Konnagar Benevolent Society, held on the 14th February last, when Baboo Joykissen Mookerjea had no connection whatsoever with that institution and it was there unanimously resolved that the public authorities be memoralized for the removal of the shops. It was not until after the Petition had been drafted, that the Baboo was made acquaint with it. Your Petitioners further beg to declare that they had not, until they received your reply to their Petition, the least knowledge of the recommendation made by Baboo Joykissen in favor of Bissonath Saha, and consequently the rejection by you of that recommendation could not by the remotest possibility have led them to the course they have adopted.

As to the circumstance of Baboo Joykissen Mookerjee's quoting largely from their Petition in his speech delivered at the Town-Hall, your Petitioners beg to submit, that at the date of that event their Petition was in the hands of the public authorities, and was consequently a public document, which any man having the inclination to inspect, might easily do so. If Baboo Joykissen have availed himself of the information

contained in the petition, surely the just prayers of the people of Konnagar cannot be rejected on that account.

With reference to the last Para of your Report, your Petitioners beg to assert that their case is analogous to that of Ootterparah; because Konnagar has a Government Vernacular School situated not far from those abkaree shops, and an English School is about to be established on the same spot the young alumni of which institutions are and will be as much liable to temptation as those of the Ootterparah School.

Under these circumstances your Petitioners earnestly hope that their prayer will, on the special grounds above represented, move the Abkaree Commissioner to comply with their request, the reconsideration of which he was pleased to promise in the concluding sentence of the 7th Para of his letter to your address No. 1405 dated 16th August last.

Konnagar
The 2nd Nov. 1853

And your Petitioners as in duty bound shall ever pray.
(Sd.) Calachand Bose for self & others.
Inhabitants of Konnagar.

(৯)

To

The Managing Director of the East Indian Railway Company.

Sir,

We, the undersigned inhabitants of Konnagar and its vicinity, beg respectfully to return our sincere thanks to the Railway Company for the establishment of a station in that village, but at the same time we beg leave to bring to your notice that a great number of the people, who would otherwise avail themselves of the daily trains, are excluded from the benefits of the measures for the following reasons.

In the first place, the up and down *through day trains* do not stop at this station. Permit us to inform you that Hooghly being the seat of the Civil, Criminal and Fiscal courts of the District, to which Konnagar and the adjacent villages belong, people have almost as much business

to transact in Hooghly as they have in Calcutta. But owing to the non-stoppage of the above trains at Konnagar, they are unable to profit by this convenient and speedy mode of travelling.

Secondly, the bad state of the Road from the Station to the River is another cause of the small number of passengers daily coming to Calcutta by the train. The village being situated on the bank of the Hooghly, which is nearly a mile from the station, people do not like to walk this distance through a road as muddy as possible, when they can easily come down to Calcutta in country boats, particularly in this season of the year when the current is very strong downwards. If the Road from the River to the Station be therefore a little widened and metalled, there is every reason to hope that all the people, who now proceed to Calcutta in boats on account of the bad state of the road, would gladly avail themselves of the train.

Thirdly, the rate of fare for the third class passengers is rather too high for the majority of the inhabitants. If the case had been otherwise, the inconvenience, arising from the bad road above adverted to, would long have ceased to exist. The present rate is two anas for a single journey from Konnagar to Howrah, and as double journey Tickets for this class of carriage are not issued, the expense of the journey from the village to the town, and thence back to the village is four anas per day, besides one pice for the crossing of the River at Howrah. So that deducting 6 days in each month for Sundays and Holidays, the total cost to the traveller would amount to Rs. 6-8 nearly per month. This, we beg to say, is too much for the greater part of the villagers, whose monthly income does not exceed Rs. 15 or 20, and who can perform the same journey in boats at an expense of Rs. 2 or 3 a month. If double journey tickets are issued to this class of passengers, an immense number of people would be able to avail themselves of the train.

In conclusion, we feel assured that the same liberal spirit which has characterized. the Railway Company in the extension of this good work in Bengal will now actuate them in dealing with this our respectful representation.

Konnagar,
The 21st July 1856.

(১০)

বিজ্ঞাপন।

আমেরিকার সুবিখ্যাত অধ্যাত্মবাদিনী (Spiritual medium) এমা হার্ডিঞ্জ আমেরিকা ও ইংলণ্ড দেশের নানা স্থানে অসংখ্য ব্যক্তির সাক্ষাতে জ্ঞান ও নীতিগর্ভ বহুবিধ বক্তৃতা করিয়া অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ১৮৭১ অব্দের ৩০শে এপ্রেল দিবসে ইংলণ্ডের ক্লিব্‌লণ্ড প্রদেশে 'ক্লিব্‌লণ্ড হল্‌' নামক প্রাসাদে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের প্রভাব বিষয়ে এক দৈবজ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাহা হইতে "আধ্যাত্মিক দশ আদেশ" ও "কর্ত্তব্যের দশ বিধি" উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত মুদ্রিত হইল। এই সকল উপদেশ ও বিধি পরলোকবাসী আত্মাদিগের উক্তি বলিয়া প্রচারিত। অনেকে একথা স্বীকার করিবেন না; কিন্তু এই নিয়মগুলিকে ধর্ম্মনীতি ও কর্ত্তব্যের মূল সত্য বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সত্য যে স্থান হইতে লব্ধ হউক আদরণীয় এবং তাহা যত প্রচারিত ও অবলম্বিত হইবে ততই সমাজের কল্যাণ হইবে, এই বিবেচনায় উক্ত নীতি সূত্র সকল প্রকাশিত হইল।

TEN SPIRITUAL COMMANDMENTS

I. Thou shalt search for *Truth* in every department of being— test, prove, and try if what thou deemest is *Truth* and then accept it as the *Word of God.*

II. Thou salt continue the search for *Truth* all thy life, and never cease to test, prove, and try all that thou deemest to be *truth.*

III. Thou shalt search by every attainable means for the laws that underlie all life and being; thou shalt strive to comprehend these laws, live in harmony with them, and make them the laws of thine

আধ্যাত্মিক দশ আদেশ।

১। সৃষ্টির প্রত্যেক অংশে **সত্যের** অনুসন্ধান করিবে—যাহা তোমার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, অগ্রে তাহা পরীক্ষা কর, সপ্রমাণ কর, বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত কর, পশ্চাৎ তাহা **ঈশ্বরের বাক্য** বলিয়া গ্রহণ কর।

২। যাবজ্জীবন সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিবে, যাহা তোমার নিকট **সত্য** বলিয়া প্রতীত হয় তাহা পরীক্ষা, সপ্রমাণ এবং বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিবে না।

৩। সর্ব্বপ্রকার জীবন এবং পদার্থের অভ্যন্তরে যে নিয়মাবলী সংস্থাপিত আছে, যথাসাধ্য উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার অন্বেষণ করিবে; সেই সকল নিয়ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে, তদনুসারে

own life, thy rule and guide in all thine actions.

IV. Thou shalt not follow the example of any man or set of men, nor obey any teaching or accept of any theory as thy rule of life that is not in strict accordance with thy highest sense of right.

V. Thou shalt remember that a *wrong* done to the least of thy fellow- creatures is a wrong done to all; and thou shalt never commit a wrong wilfully and consciously to any of thy fellow-men, nor connive at wrong done by others without striving to prevent or protesting against it.

VI. Thou shalt acknowledge all men's *right* to do, think, or speak, to be exactly equal to thine own; and all right whatsoever that thou dost demand, thou shalt ever accord to others.

VII. Thou shalt not hold thyself bound to *love* or associate with those that are distasteful or repulsive to thee, but thou shalt be held bound to treat such objects of dislike with gentleness, courtesy, and justice and never suffer thy antipathies to make thee ungentle or unjust to any living creature.

জীবন নির্ব্বাহ করিবে এবং তোমার সকল কার্য্যে ঐ সকলকে তোমার জীবনের নিয়ম, তোমার শাসন ও নেতা করিবে।

৪। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের দৃষ্টান্ত, কোন উপদেশ অথবা মত তোমার উচ্চতম কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণরূপে না মিলিলে, তুমি তাহা জীবনের নিয়ামক বলিয়া অনুসরণ করিবে না।

৫। তুমি জানিবে যে অতি ক্ষুদ্রতম জীবের কোন অনিষ্ট করিলে তদ্দ্বারা সমুদায় জীবের অনিষ্ট করা হয়; ইচ্ছা ও জ্ঞান পূর্ব্বক কোন মনুষ্যেরই অনিষ্ট করিবে না, অন্যে যদি কাহার অনিষ্ট করে, তাহার নিবারণ বা প্রতিবাদের চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না।

৬। তোমার নিজের যদ্রূপ অন্যেরও ঠিক্ তদ্রূপ করিবার, ভাবিবার এবং বলিবার অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করিবে; এবং নিজে যে কিছু অধিকার চাও, অপরকেও তাহা সর্ব্বদা দান করিবে।

৭। যাহারা তোমার অপ্রিয় বা ঘৃণার্হ তাহাদিগকে ভালবাসিতে এবং তাহাদের সহবাস করিতে তুমি আপনাকে বাধ্য মনে করিবে না, কিন্তু সে প্রকার লোকদিগের প্রতি কোমল, শিষ্ট, এবং ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিতে আপনাকে বাধ্য জানিবে, অপ্রীতিবশতঃ কখন কোন জীবের প্রতি অভদ্র বা অন্যায় আচরণ করিবে না।

VIII. Thou shalt ever regard the rights, interests, and welfare of the many as superior to those of the one or the few; and in cases where thy welfare or that of thy friend is to be balanced against that of society, thou shalt sacrifice thyself or friend to the welfare of the many.

IX. Thou shalt be obedient to the *laws* of the land in which thou dost reside, in all things which do not conflict with thy highest sense of right.

X. Thy first and last duty upon earth, and all through thy life, shall be to seek for the principles of *right,* and to live them out to the utmost of thy power; and whatever creed, precept or example conflicts with those principles thou shalt shun and reject, ever remembering that the laws of right are—in morals, *Justice;* in science, *Harmony;* in religion. *The Fatherhood of God, The Brotherhood of Man, the immortality of the human soul,* and *compensation* and *retribution* for the *good or evil* done on earth.

৮। এক অথবা অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অপেক্ষা অধিকাংশ ব্যক্তির স্বত্ব, লভা ও মঙ্গল শ্রেষ্ঠতর জানিবে; এবং যে সকল স্থলে সমাজের স্বার্থের সহিত তোমার নিজের বা স্বজনের স্বার্থের বিরোধ হইবে, সে সকল স্থলে অধিকাংশের কল্যাণার্থ আপনার বা স্বজনের স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে।

৯। যে সকল বিষয় তোমার উচ্চতম কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিরোধী না হয়, সে সকল বিষয়ে তুমি স্বদেশীয় **নিয়ম** সকল রক্ষা করিয়া চলিবে।

১০। এই পৃথিবীতে যাবজ্জীবন ন্যায়ের মূল সত্য সকল অনুসন্ধান এবং যত দূর সাধ্য তাহা প্রতিপালন করা তোমার প্রথম ও শেষ কর্ত্তব্য; এবং যে কোন শাস্ত্র, উপদেশ অথবা দৃষ্টান্ত সেই মূল সত্য সকলের বিরোধী হইবে, তাহা পরিত্যাগ ও অগ্রাহ্য করিবে—এইটি চিরকাল মনে রাখিবে যে নীতি বিষয়ে **ন্যায়াচরণ**, বিজ্ঞান বিষয়ে **সামঞ্জস্য**, ধর্ম্ম বিষয়ে **ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব, মানবাত্মার অনশ্বরত্ব** এবং ইহলোক কৃত পাপ ও **পুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার** এইগুলি কর্ত্তব্যের সার নিয়ম।

TEN RULES OF RIGHT

I. *Temperance* in all things, whether physical, mental, moral, affectional, or religious.

II. *Justice* to all creatures that be—justice being the exercise of

কর্ত্তব্যের দশ বিধি।

১। **মিতাচার**—শরীর, মন, নীতি, ভাব এবং ধর্ম্ম সকল বিষয়ে মিতাচারী হওয়া।

২। **ন্যায়**—সকল জীবের প্রতিই ন্যায়াচরণ করা। জীবন, চরিত্র, চিন্তা এবং

precisely the same rules of life, conduct, thought or speech that we would desire to receive from others.

বাক্য সম্বন্ধে আমরা অন্যের নিকট যেরূপ আচরণের প্রত্যাশা করি, ঠিক্ তদনুষ্ঠানই ন্যায়াচরণ।

III. *Gentleness* in speech and act —never needlessly wounding the feelings of others by harsh words or deeds; never hurting or destroying aught that breathes, save for the purposes of sustenance or self-defence.

৩। , **ধীরতা**—বাক্যে এবং কার্য্যে ধীরতা অবলম্বন করা—কঠোর বাক্য বা ব্যবহার দ্বারা অকারণে কাহাকে মর্ম্মপীড়া না দেওয়া; আহার এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায়ে কোন প্রাণীকে বধ বা আঘাত না করা।

IV. *Truth* in every word or though spoken or acted; but reservation of harsh or unpleasing truths where they would needlessly wound the feeling of others.

৪। **সত্য**—যে কোন বাক্য কহিবে বা যে কোন কার্য্য করিবে তাহা যেন সত্য হয়, কিন্তু যেখানে কঠোর বা অপ্রিয় সত্য দ্বারা অকারণ অন্যকে মর্ম্মপীড়া দেওয়া হয়, সেখানে তাহা সংযম রাখা।

V. *Charity*—charity in thought striving to excuse the failings of others; charity in speech, veiling the failings of others, charity in deeds, wherever whenever, and to whomsoever the opportunity offers.

৫। **উদারতা**—চিন্তাতে উদারতা অর্থাৎ অন্যের দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিতে চেষ্টা করা; বাক্যে উদারতা—অর্থাৎ অন্যের দুর্ব্বলতা গোপন করা; কার্য্যে উদারতা অর্থাৎ যে কোন স্থানে যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তির প্রতি উদার ব্যবহারের সুযোগ হয় তাহা করা।

VI. *Alms-giving*—visiting the sick and comforting the afflicted in every shape that our means admit of and the necessities of our fellow-creatures demand.

৬। **দয়া**—পীড়িত ব্যক্তিদিগের পরিদর্শন করা এবং বিপন্নব্যক্তিগণকে সান্ত্বনা দান ও ঐ সকলের যে প্রকার প্রয়োজন ও আপনাদিগের যতদূর ক্ষমতা তদনুসারে তাহাদিগের সাহায্য করা।

VII. *Self-sacrifice*, whereever the interests of others are to be benefited by our endurance.

৭। **ত্যাগস্বীকাব**—যে কোন স্থলে আপনার কষ্ট স্বীকার দ্বারা অন্যের উপকার হয় তাহা করা।

VIII. *Temperate* yet firm defence of our views of right, and protest against wrong, whether for ourselves or others.

৮। **দৃঢ়তা**—আপনাদিগের মতে যাহা ন্যায়, ধীরতা অথচ দৃঢ়তা সহকারে তাহার সমর্থন করা, এবং নিজের বা অন্যের সম্বন্ধে যাহা অন্যায় তাহার প্রতিবাদ করা।

IX. *Industry* in following any calling we may be engaged in, or in devoting some portion of our time, when otherwise not obliged to do so, to the service and benefit of others.

৯। **পরিশ্রম**---আমরা যে কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হই, পরিশ্রম সহকারে তাহা নির্ব্বাহ করা, অথবা সে প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে অন্যের সেবা এবং উপকারার্থ কিয়ৎ পরিমাণে সময় ব্যয় করা।

X. *Love*—above and beyond all, seeking to cultivate in our own families, kindred, friends, and amongst all mankind generally the spirit of that true and tender love which can think, speak, and act no wrong to any creature living; remembering always, that where love is, all the other principles of right are fulfilled beneath its influence and embodied in its monitions.

১০। **প্রীতি**—যে প্রকৃত কোমল প্রীতিভাব চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্যে কোন জীবের অনিষ্ট করিতে না পারে, আপনাদিগের পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু এবং সাধারণতঃ সকল মনুষ্যের মধ্যে সেই প্রীতি বর্দ্ধন করা, এইটী সর্ব্বোপরি এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; যেখানে প্রীতি আছে সেখানে তৎপ্রভাবে অন্যান্য সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় এবং তাহার উপদেশে সেই সকল কর্ত্তব্য সংগঠিত হয় ইহা স্মরণ রাখিবে।

We should ever hold the above-stated *principles of right* to be obligatory upon all men as, they are the deductions evolved from the laws of beings, and therefore in strict harmony with the divine order of creation. All views of *science* are dependent on human intelligence and unfoldments of intellectual knowledge. All views of *theology* are dependent upon intuitive perceptions, faith, or testimony derived from varying sources—hence, man's opinions concerning science and theology are subject to change, and dependent on the circumstances of nationality,

উল্লিখিত কর্ত্তব্যবিধি সকল আত্মার প্রকৃতি হইতে বিনিঃসৃত, সুতরাং সৃষ্টির ঐশ্বরিক শৃঙ্খলার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গত, অতএব ঐ সকল বিধি তাবৎ মনুষ্যেরই অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। **বিজ্ঞান** শাস্ত্রের মত সকল মনুষ্যের বুদ্ধি ও মানসিক জ্ঞানের স্ফূর্ত্তির উপর নির্ভর করে। **পরমার্থ** বিষয়ক মত সকল সহজ জ্ঞান, বিশ্বাস অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রমাণের উপর সংস্থাপিত হয়—এই কারণে মনুষ্যের বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ক মত সকল পরিবর্ত্তনশীল এবং জাতীয় ভাব, মানসিক শিক্ষা অথবা বিভিন্ন প্রকার

intellectual training, or incidents peculiar to personal experiences; but the *religion* of *right, morality,* and *love,* and the commandments of *life-duty*, originating from the fundamental principles inherent in life and being, can never change until man ceases to be, or the harmonies of the universe are themselves changed or annihilated.

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে, কিন্তু মনুষ্য জাতি বিনষ্ট অথবা লয়প্রাপ্ত না হইলে **কর্ত্তব্য, নীতি** ও **প্রীতির ধর্ম্ম** এবং জীবন ও আত্মার প্রকৃতিগত মূল সত্যসমুৎপন্ন জীবনের কর্ত্তব্য বিধি সকল কদাপি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না।

(১১)

THE CREED OF THE SPIRITS

I believe in God; for I know that spirit, matter, and motion are eternal existences, co-equal, co-eternal, co-existent ever. As I believe in matter, then so do I believe in spirit; and the totality of that spirit, that master-mind that was even before form—that moved upon the chaos and void and evolved therefrom order, harmony, and form—is God. Finite as I am, I can never comprehend his infinity; temporal pilgrim as I am now, and ever passing on in temporality, I cannot master his eternity It is enough for me to know that He is allwise, for the majesty, order, and beauty of creation prove it; He is all-good, for the beneficence disclosed in that creation proves it; He is all-powerful, for its stupendous Strength, its glorious and majestic permanence prove it.

I believe in the immortality of the human soul, for I have been taught to analyse and search until I discover that that which is must have existed for ever; and though, on this earth I am only possessed of such memory as carries me back to the beginning of my own temporal existence, and such prophecy as proves to me that I shall live beyond the grave, I still recognise that lives infinite one way cannot be finite another, and that if there is infinity around me I am a part of it—I am infinite also. And since I question and since I doubt, even the chemist that scoffs at me proves my position, and shows me that nothing can be annihilated. My soul is something, the functions of my soul are something, my self-consciousness is something, my sense of individuality is something that cannot be annihilated. The strong psychology of

another mind mightier than mine would impose upon me the dark fatal belief of annihilation for my soul, and eternal existence for everything else. My spirit-friend comes to my side, grasps my hand and whispers in my ear, in the voice of the loved and those I have deemed the lost—"I live for ever, and thou shalt live for ever." I believe in right and wrong, for I do find the penalties of the wrong and the compensation of the right impressed on all things, on all forms of life. When I doubt this, the sophist would come and preach to me of circumstances of surroundings, of impulses and forces; and when he would try in the tones of sophistry to mask me from the light which the penalty is perpetually bringing me, my spirit-friend appeals to me, and with the glory of the immortal spheres on his glittering brow, or the darkness of the dweller on the threshold hanging around him, gives me to understand that the second stage of existence is absolute judgment for the deeds done in the body.

I believe in the communion of spirits as ministering angels. I not only realise this from the truths that are demonstrated around me, but from the reason which assures me that the love which animates the form that I loved so well, as it still subsists must still find exercise; that to live, to love, and yet to be unable to manifest that love to the objects that need it, must be a condition of existence far worse than that in which we live, and love, and minister to each other.

(১২)

সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা।

যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া সমস্ত প্রাণিপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, যাঁহা হইতে আমরা ধন প্রাণ মন সর্ব্বস্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার প্রসাদে আমরা জীবিত থাকিয়া অশেষ প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতেছি এবং যিনি আমাদিগকে নানা প্রকার বিপদ্ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন; সেই করুণাময় পরম দেবতার উপাসনা অর্থাৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ করা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য!

নির্জনে সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া পরমাত্মার উপাসনা উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করা যাইতে পারে, এবং প্রতিদিন মনুষ্য মাত্রেরই সেইরূপে উপাসনা করা

অত্যাবশক। কিন্তু সময়ে সময়ে স্বজন বান্ধবগণ একত্র মিলিত হইয়া প্রকাশ্য উপাসনা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রথমতঃ যে সকল ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া পরমেশ্বরের চিন্তা হইতে বিরত থাকেন, তাঁহারা যদি সামাজিক উপাসনাকালে একবার উপস্থিত হইয়া ক্ষণমাত্র পরমাত্মার প্রতি মনঃসংযোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পরমার্থ সাধনে উৎসাহী হইয়া ধর্ম্মপথাবলম্বী হইতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যে তাঁহারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে বাঞ্ছা করেন, কিন্তু কিরূপে সেই উপাসনা করা কর্ত্তব্য তাহার যথার্থ জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ঐ সকল ব্যক্তি সামাজিক উপাসনা দ্বারা উক্ত বিষয়ে প্রকৃত উপদেশ পাইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ আমাদিগের অন্তঃকরণে যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে তাহা যে পরিমাণে চালিত হয় সেই পরিমাণে আমরা নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিতে পারি। কিন্তু সামাজিক উপাসনা উক্ত বৃত্তির যথোচিত স্ফূর্ত্তি সম্পাদনের এক উৎকৃষ্ট উপায়।

চতুর্থতঃ সকল মনুষ্য এক পরমেশ্বরের সন্তান, অতএব সকলের সহিত পরস্পর ভ্রাতৃবৎ সৌহার্দ্দ্য নিবন্ধ করা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সকলে একত্র হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে যেমন সেই ভ্রাতৃভাব উদিত হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। প্রকাশ্য উপাসনা স্থলে কি ধনী কি দরিদ্র কি রাজা কি প্রজা সকলেই সমানরূপে সমাদৃত হন, সুতরাং কাহার মনে দ্বেষ, হিংসা বা অভিমান জন্মিতে পারে না।

পঞ্চমতঃ আমাদিগের সন্তান সন্ততিকে ধর্ম্মনীতি শিখান অত্যন্ত আবশ্যক; কিন্তু এখানকার বিদ্যামন্দিরে যে প্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহাতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিরই পরিচালনা হইয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির তাদৃশ শিক্ষা হয় না। অতএব প্রকাশ্য উপাসনাকালে বালক ও যুবাদিগের ধর্ম্মনীতি শিক্ষা বিষয়ে অনেক সদুপায় হইতে পারে।

উল্লিখিত সংক্ষেপ বিবরণের প্রতি মনোযোগ করিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনার্থ স্থানে স্থানে সমাজ থাকা আবশ্যক। তদনুসারে এস্থানেও একটি সমাজ সংস্থাপন নিতান্ত কর্ত্তব্য; সেই অভিপ্রায়ে আপনারা অদ্য এখানে আহূত হইয়াছেন। ভরসা করি যে আপনারা বিনাপত্তিতে ও হৃষ্টচিত্তে আমার অভিপ্রায়ের পোষকতা করিবেন। আর ইহাও সকলকে বিদিত করা যাইতেছে যে এই সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা কার্য্য সমাধা হইবেক, এবং যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন সকলেই সভায় উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে পারিবেন। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি আমাদিগের দ্বেষ বা হিংসা নাই, সুতরাং কোন ধর্ম্মের নিন্দাসূচক কোন কথা এই সভায় উল্লেখিত হইবেক

না। ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহারই প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইবেক। আর ইহাও বক্তব্য যে আপাততঃ পক্ষে পক্ষে এই সভার অধিবেশন হইবেক অর্থাৎ এক রবিবার অন্তর অন্য রবিবার সন্ধ্যার সময়ে সামাজিক উপাসনাদি কার্য্য সম্পাদন হইবেক।

হে পরমাত্মন্! আমি অতি দুর্ব্বল মতি, কিন্তু আমার এই অভিলাষটী অতি উচ্চতর, কেবল তোমার উদার করুণার উপর নির্ভর করিয়া তোমারই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। আমার এই উদ্যোগ সফল কর, যেন এই সমাজ ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হয়, আর যাহাতে সকলে ঐকমত্য হইয়া তোমার উপাসনা কার্য্যে উৎসাহী হই, আমাদিগকে এই প্রকার জ্ঞান ও ধর্ম্মবল দেও। হে নাথ! তুমিই আমাদিগের সর্ব্বস্ব, আমরা যেন বিষয় সুখে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে প্রীতি করিতে ও তোমার প্রিয়াকার্য্য সাধন করিতে পরাঙ্মুখ না হই। হে মঙ্গলময়! তুমি আমাদিগের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিয়া আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর এই আমার প্রার্থনা।

কোন্নগর
১৫ই জ্যৈষ্ঠ
১৭৮৫ শক।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।

(১৩)

কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজ

১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৬ শক।

অদ্য এই সমাজের বয়ঃক্রম এক বৎসর পূর্ণ হইল। করুণাময় পরমেশ্বরের অনুকম্পাতে যে এতৎকাল পর্য্যন্ত সমাজের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে ইহাতে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই মঙ্গলময় পুরুষকে বার বার নমস্কার করি। যদিচ এই সংক্ষেপ কাল মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই, তথাচ যে কয়েকটি যুবা ব্রাহ্ম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অকপটভাব ও ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে বিশেষ তৃপ্তিকর হইয়াছে। আর ইহাও আমাদিগের স্মরণ করা উচিত, ভূমিতে বীজ বপন করিবামাত্র ফললাভ করা যাইতে পারে না; প্রত্যুত কালকে প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। কাল সহকারে সেই বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, পশ্চাৎ তাহা ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া থাকে। অতএব গতবর্ষে আমাদিগের উদ্যোগ যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে

তজ্জন্য সেই স্নেহময় পরম পিতাকে ধন্যবাদ করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা কিছু নূতন ধর্ম্ম নহে—অতি প্রাচীন কাল অবধি—সৃষ্টির আরম্ভ অবধি—এই ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে যে ইহা সমুদায় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। এই সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি সাধনই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং সেই ধর্ম্মের মূল হইতেছে পরমেশ্বরে প্রীতি ও সর্ব্ব লোকের হিতসাধন। এই ধর্ম্মবীজকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের সকলের ঐক্যতা ও যত্নসহকারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। সমাজস্থ লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য না করিয়া সমাজের মূল উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করাই বিধেয়; কারণ এই অবনীমণ্ডলে কোন দুইটি বস্তু পরস্পর অভিন্ন দেখা যায় না, দুইটি বৃক্ষ বা দুইটি জীব কখন সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সেইরূপ দুইটি মনুষ্যের আকার ও মনোবৃত্তি সর্ব্বপ্রকারে সমান পাওয়া যায় না; ফলতঃ পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রিয়াই এইপ্রকার বিচিত্র, ইহাতে সমাজস্থ সকল ব্যক্তির মত সকল বিষয়ে যে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হইবে তাহা কদাচ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

উল্লিখিত মানসিক গুণের বিভিন্নতা প্রযুক্ত স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে সত্যানুসন্ধান পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, এই স্বাধীনভাব নষ্ট করা আমাদিগের কখন উচিত নহে। কেন না তাহা হইলে সত্য আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইতে পারে না, এবং যে পরিমাণে স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইবেক সেই পরিমাণে অসত্যকে আশ্রয় দেওয়া হইবেক। পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ. সত্যই পরমেশ্বরের জ্যোতি, সেই সত্য অবলম্বন করিলে মঙ্গলের আলয়ে উপনীত হওয়া যায়। সত্য মঙ্গলের বীজ, তাহার একটি বীজ রোপণ করিলে বহু প্রকার মঙ্গল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব হে ব্রাহ্মভ্রাতাগণ! আইস সকলে মিলিয়া সত্যকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে যত্নশীল হই। আমাদের মধ্যে যদি কোন কোন বিষয়ে মতের আংশিক বিভিন্নতা থাকে তজ্জন্য পরস্পর বিরোধ ও বিসম্বাদ না করিয়া আমাদের সকলের উদ্দেশ্য যে ধর্ম্মোন্নতি তদ্বিষয়ে ঐক্যতা অবলম্বন করি। ঐক্যতা ব্যতিরেকে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না, এবং দুর্ব্বল মনুষ্যেরাও ঐক্যতাগুণে অতি গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। অতএব ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে সকল ব্রাহ্মেরই দৃঢ় ঐক্যতা অবলম্বন করা অত্যন্ত আবশ্যক। যাহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও জ্ঞানের জ্যোতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়, দেশের কুৎসিত আচার ব্যবহার সকল তিরোহিত হয়, এবং লোকের দুঃখ বিমোচন ও সুখ বর্দ্ধন হয় কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

হে পরমাত্মন্! তোমার সহায় ভিন্ন আমরা কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি না; কেবল তোমারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে এরূপ ধর্ম্মবল প্রেরণ কর, যদ্দ্বারা আমরা সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভন ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামী হই। আমরা যেন দিন দিন তোমার প্রতি অধিকতর প্রীতি স্থাপন করি, তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে যত্নশীল হই এবং সকল মনুষ্যের হিত চিন্তাতে জীবন অবসান করি। এই আমার প্রার্থনা।

(১৪)

মান্যবর শ্রীযুক্ত ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

রবিবারের মিরার শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন বাবুর পত্রের উত্তরে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে।

আমি আপনাদিগের মধ্যে একজন ছিলাম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনাবধি আমি দেখিয়া আসিয়াছি যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, ব্রাহ্মদিগের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, কেশববাবু যাহা করেন তাহাই হয়। সাধারণের নিকট প্রকৃত ঘটনা গোপন রাখিবার প্রয়োজন কি? যাহা সত্য তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেবল কেশববাবুর আধিপত্যে পরিচালিত হইয়া থাকে, একথা কি অস্বীকার করা যায়? সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি যদি কেশববাবুর স্নেহ মমতা থাকিত তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া রাখিতেন না। বিশেষতঃ নিঃস্ব ব্রাহ্মদিগকে যে অবজ্ঞা করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এক দিন কোন কার্য্যোপলক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে, "কেশব সেন আবার তেলী মালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করিবে?" অধিক কি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যদি যথার্থই অনুরাগ থাকিত তাহা হইলে স্বীয় পদমর্য্যাদার জন্য ব্রাহ্মদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও সৃষ্টি হইত না। তিনি দোষ স্বীকার করিলেই সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত।

আদেশ সম্বন্ধে আমাদিগকে উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাও ঠিক নহে। ব্রাহ্ম মাত্রেই ঈশ্বরের আদেশে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মদিগের কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র নাই। সহজজ্ঞান, এবং বিবেক কর্ণে পরমেশ্বর যে আদেশ করেন তাহাই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। আদেশ সম্বন্ধে চিরকালই আমাদিগের এক প্রকার মত। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করাকে আমরা জঘন্য পাপ এবং ঈশ্বরের অপমান মনে করি।

আবদুল্লা, জজ্ নর্ম্মাণ্ সাহেবকে বধ করিয়া বলিয়াছিল যে, সে খোদার হুকুমে কাফেরের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। মহম্মদ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে যাহারা কোরাণে বিশ্বাস না করিবে তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা বধ কর, ইহা ঈশ্বরের আদেশ। আমাদিগের দেশের প্রাচীন দস্যুগণ তাহাদিগের উপাস্য দেবতা কালীর আদেশে ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হত। কেশব বাবু পৌত্তলিক মতে কন্যার বাল্য বিবাহ দিলেন, এবং সেই কার্য্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিতেছেন। আমরা এরূপ আদেশবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই ভয়ানক জঘন্য কলুষিত মত ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষা হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি,ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদিগের কিছুমাত্র স্নেহ মমতা আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে অপবিত্র হইতে দেখিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

পাপকার্য্যকে ঈশ্বরাদেশ বলিলে যেরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি অপ্রেমও প্রকাশিত হয়। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন তিনি কি, নিজের দোষ উপাস্য দেবতার উপরে স্থাপন করিতে পারেন? কখনই না।

ঈশ্বরের আদেশ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহা তাঁহারা কোন কালে অস্বীকার করিতে পারেন না, যথার্থ ঈশ্বরাদেশকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকি।

ঈশ্বর সত্য, পবিত্র, অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁহার আদেশও সত্য, পবিত্র এবং অপরিবর্ত্তনীয় হইবে। আদেশ অসত্য, অপবিত্র এবং পরিবর্ত্তনীয় বলিলে আমরা ঘৃণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিব।

কেশব বাবু, ব্রাহ্মবিবাহ বিধিববন্ধ হইলে, ব্রহ্মমন্দির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই বিধি কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের বিধি, তাঁহার আদেশেই সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় কন্যার বিবাহে কেশব বাবু সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এক নূতন আদেশ প্রচার করিলেন, যাহাতে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে। অতএব আমার নিবেদন, প্রকৃত ঈশ্বরাদেশ ব্রাহ্মসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুক। দূষিত আদেশ শব্দ ব্রাহ্মসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হউক, দয়াময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল করুন।

নিবেদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(১৫)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সমীপেষু—

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়!

আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে কুচবিহারের রাজার সহিত ত্বরায় আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সাধারণতঃ পুত্ত্র কন্যার বিবাহ

পিতা মাতারই বিবেচ্য বিষয় এবং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপরের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চামাত্র, কিন্তু আপনার অবিদিত নাই যে আপনার কার্য্যের উপর আমাদের সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের শুভাশুভ বহুপরিমাণে নির্ভর করে; সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের মৌনী থাকা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। আমরা নিতান্ত বিষণ্ণ, ব্যাকুল ও ক্ষুব্ধচিত্তে আপনাকে আমাদের কতিপয় অভিপ্রায় জানাইতেছি; আশা করি আপনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সেগুলি বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন। এই বিবাহে আমাদের অনেকগুলি আপত্তি আছে।

প্রথমতঃ—আমরা বাল্যবিবাহকে পাপ মনে করি; প্রকৃত বিচার করিলে, কন্যার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং পতিমর্য্যাদাবোধ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আপনি নিজে যখন এ বিষয়ে প্রধান প্রধান চিকিৎসকের মত জিজ্ঞাসা করেন তখন তাঁহাদের অনেকে অষ্টাদশ বা তদধিক বর্ষকে বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কিন্তু দেশকাল বোধে ১৮৭২ সালের ৩ আইনে ন্যূনকল্পে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষকে কন্যার পক্ষে বিবাহকাল বলিয়া নিয়ম করা হয়। আপনি সে সময়ে এই নিয়মটী সন্নিবেশিত করিবার পক্ষে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন; এবং আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে আপনি রাজবিধির নিরূপিত ন্যূনকল্প বয়সের মুখাপেক্ষা না করিয়া বরং তদপেক্ষা অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিত রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজে সৎদৃষ্টান্ত দেখাইবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আপনার কন্যার চতুর্দ্দশ বর্ষও পূর্ণ না হইতে আপনি বিবাহ দিতে অগ্রসর হইতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ—আপনারই পরামর্শানুসারে উক্ত আইনে পুরুষের পক্ষে ন্যূনকল্পে পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষকে বিবাহকাল বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে ইহাকেও একপ্রকার বাল্যবিবাহ বলা উচিত; কিন্তু আমরা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে আপনি উক্ত রাজার ষোড়শ বর্ষও পূর্ণ না হইতে হইতেই, তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। যদি এরূপ বলা হয় যে বিবাহের পর দম্পতী কিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকিবেন এ প্রকার কোন নিয়ম পূর্ব্বক বিবাহ দিলে বাল্য-বিবাহ-জনিত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না; তাহা হইলে ইহার উত্তরে আর কিছু না বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আদি সমাজ সংসৃষ্ট কোন ব্রাহ্মের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঠিক এইরূপ নিয়মের কথা বলায় তৎকালে ইণ্ডিয়ান মিরার তাহার উত্তরে যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

তৃতীয়তঃ—আপনি এতদিন উপদেশে ও প্রকাশ্যপত্রে বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া আসিয়াছেন, তদনুসারে যাহাদের অদ্যাপি বিবাহের দায়িত্ব বোধের শক্তি জন্মে নাই তাহাদের বিবাহকে বিবাহই বলা যায় না; অথচ আপনি এক শিশুর হস্তে আর একটি শিশু অর্পণ করিতেছেন।

চতুর্থতঃ—কেবলমাত্র উপাসনাপূর্ব্বক বিবাহ দিলে বৈধ হয় কি না এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমাদের সমাজের অনেকে এবং বিশেষরূপে আপনি ঘোরতর আন্দোলন ও পরিশ্রম করিয়া একটি রাজবিধি প্রণয়ন করাইয়া লন। তদবধি অনেক স্ত্রী ও পুরুষ এবং অনেক পরিবার এই রাজ-বিধি অনুসারে বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইয়াছেন। উক্ত রাজবিধির কোন কোন অংশের প্রতি অনেকের আপত্তি আছে, এরূপ স্থলে কোথায় আপনি উক্ত রাজ-বিধিতে যাহাতে লোকের রুচি জন্মে তাহার চেষ্টা করিবেন না আমাদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনি যে উদ্দেশ্যেই একার্য্যে প্রবৃত্ত হউন না কেন আপনার দৃষ্টান্তে অনেক ব্রাহ্ম পাত্রের পদ সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া উক্ত রাজ-বিধি অতিক্রম করিবে।

পঞ্চমতঃ—উক্ত রাজবিধি অনুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ; কিন্তু সেই বিধি অতিক্রম করিয়া আপনি যে রাজবংশে কন্যা দিতেছেন, বহুবিবাহ তাঁহাদের বংশে কৌলিক প্রথা। বর্ত্তমান রাজা ইংরাজদিগের দ্বারা শিক্ষিত, ঈশ্বর করুন তাঁহার সেরূপ দুর্ম্মতি না হউক, কিন্তু রাজা এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তাঁহার চরিত্র আজিও সংগঠিত হয় নাই; এরূপ অবস্থাতে এই শিক্ষার ফল অবশেষে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই; সুতরাং এই বিবাহ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে আপনি জামাতার ধনে এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে কন্যার দাম্পত্য সুখের ব্যাঘাত হওয়াকেও আশঙ্কার কারণ মনে করেন না। বলা বাহুল্য যে আপনার সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ হওয়াও আমাদের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক।

ষষ্ঠতঃ—আমরা কি অপর কেহ এতদিন উক্ত রাজাকে কি রাজ পরিবারকে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে উৎসাহী বলিয়া জানি নাই, শুনিও নাই। বরং কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষে তাঁহার যে বিবাহের কথা হয় তাহাতে পৌত্তলিক মতেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এরূপ স্থলে কিরূপে "ব্রহ্ম পরায়ণ ব্রাহ্ম" বলিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করা হইবে? আর আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনার কন্যার সহিত বিবাহ ঘটনা না হইত, তাহা হইলে রাজা ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতেন কি না? যদি তাহা না হয়, এরূপে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে এখন ব্রাহ্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা কিরূপে কর্ত্তব্য হইতে পারে?

সপ্তমতঃ—ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে কন্যার ভাবী ধন মান অপেক্ষা ধর্ম্মই পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য বিষয়। কিন্তু রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তিনি জ্ঞাত-চরিত্র ব্রাহ্ম নন; বিদ্যা সম্বন্ধে যদি দেখা যায় এখনও প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্তও দেন নাই। বিশেষত পাত্র যদি রাজা না হইয়া

মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান হইতেন তাহা হইলে বোধ হয়, এরূপ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দিতেও আপনি কখনই সম্মত হইতেন না। এরূপ স্থলে তাঁহাকে কন্যা দান করিলে লোকে সহজে মনে করিবে যে আপনি কন্যার ভাবী ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাত্রের বিদ্যা বুদ্ধি দেখা অপেক্ষা কন্যার রাজরাণী হওয়া অধিক প্রার্থনীয় মনে করেন. এরূপ মনে করিবার অবসর দেওয়াও কি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে শোচনীয় নহে?

আমরা আবার বলিতেছি—এবং এই ভাবী ঘটনার সংবাদ আমাদের মর্ম্মে আঘাত দিয়াছে বলিয়াই বার বার বলিতেছি,—আমরা বাল্যবিবাহকে অত্যন্ত জঘন্য প্রথা, এবং পিতা মাতার পক্ষে তাহাতে লিপ্ত হওয়া পাপ মনে করি! এতদ্ভিন্ন আরও যে সকল আপত্তি আছে, তাহাও বলা হইল। অবশেষে আমাদের এই অনুরোধ যে আপনি উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের ভাবী মহৎ অনিষ্টের আশঙ্কা নিবারণ করিবেন।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
শ্রীদুর্গামোহন দাস।
শ্রীআনন্দমোহন বসু।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীকালীনাথ দত্ত।
শ্রীকিশোরীলাল মৈত্রেয়।
শ্রীদুকড়ি ঘোষ।
শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত।
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীরাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীহরকুমার চৌধুরী।
শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মৈত্র।
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।
শ্রীরজনীকান্ত নিয়োগী।
শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীসত্যপ্রিয় দেব।
শ্রীভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীপ্রসন্নকুমার চৌধুরী।
শ্রীরূপচাঁদ মল্লিক।

(১৬)

মান্যবর শ্রীযুক্ত মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজের সমূহের সম্পাদকগণ সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয় মহাশয়!

আগামী ৬ই মার্চ্চ দিবসে কুচবিহারে অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার সহিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ হইবে এরূপ স্থির হইয়াছে। রাজার বয়স এখন ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই; কন্যারও চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। যে বাল্যবিবাহ গর্হিত বলিয়া আমরা সমগ্র সমাজের লোক বক্তৃতা, উপদেশ ও প্রবন্ধে এতদিন ঘোষণা করিয়া আসিতেছি, যে বাল্যবিবাহ দেশের মহা অনিষ্টের মূল, সমাজের দুর্গতির প্রধান কারণ, ব্রাহ্মের পক্ষে বিশেষ নিন্দনীয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক—সংস্কারকদলের অগ্রণী—ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য স্বয়ং সেই কুপ্রথার প্রশ্রয় দিতে অগ্রসর হইতেছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক আপত্তি আছে তাহা এতৎসংলগ্ন পত্রে দেখিবেন। এসময় কি আপনারা মৌনী থাকা শ্রেয় বা কর্ত্তব্য মনে করেন, না আমাদের অভিপ্রায় তাঁহাকে জানান উচিত? মৌনী থাকা অকর্ত্তব্য বোধে এতৎসংলগ্ন পত্রে আমরা তাঁহাকে আমাদের অভিপ্রায় জানাইলাম। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পত্রে প্রতিবাদ করিতেছেন। আশা করি মফঃস্বলের প্রত্যেক সমাজ হইতে এ বিবাহের প্রতিবাদ হইবে অতএব অনুরোধ যে আপনি এবং আপনার ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ এই পত্রে কিম্বা এইরূপ অন্য কোন পত্রে স্বাক্ষর করিয়া অবিলম্বে পাঠাইয়া দিবেন। এবং এ বিষয়ে আপনাদের সমাজের অভিপ্রায়ও আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। আপনাদের পত্র ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেবের নামে প্রেরিত হইলেই আমাদের হস্তগত হইবে।

৯৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২৮ মাঘ, ১২৮৪

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
শ্রীদুর্গামোহন দাস।
শ্রীআনন্দমোহন বসু, প্রভৃতি।

(১৭)

মান্যবর শ্রীযুক্ত মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ সমূহের সম্পাদকগণ সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ৬ই মার্চ্চ দিবসে কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার সহিত কেশববাবুর ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হইতেছে; তাহা আপনাদিগকে পূর্ব্বেই পত্রদ্বারা জ্ঞাত করা গিয়াছে। এইজন্য কলিকাতার ব্রাহ্মগণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে মত প্রকাশার্থ আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারি শনিবার ব্রাহ্মদিগের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা স্থির হইয়াছে। এই বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের গৌরবের হানি হইবে সুতরাং ইহা নিন্দনীয়, এই মর্ম্মের একটি প্রস্তাব উক্ত সভায় উত্থাপন করা হইবে।

আমাদিগের বিবেচনায় এইরূপ প্রকাশ্যভাবে এই বিবাহের প্রতিবাদ না করিলে সমুদায় সমাজ লোকের নিকট দোষী হইবে; আমরাও ঈশ্বরের চক্ষে অপরাধী হইব। কিন্তু আপনাদিগকে না বলিয়া কোন কাজ করা উচিত বোধ হয় না। সেইজন্য ব্যগ্রতার সহিত আপনাদের পরামর্শ এবং সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের গৌরব রক্ষার ভার আপনাদের হস্তে এ কথাটি বিস্মৃত হইবেন না। অতএব পত্র প্রাপ্তি মাত্র দুই এক দিনের মধ্যে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের সভা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনাদের সমাজের কি মত তাহা আমাদিগকে বিদিত করিবেন। অনুগ্রহ করিয়া কালবিলম্ব করিবেন না। কারণ আপনাদের পত্র ২৩শে ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হওয়া কর্ত্তব্য। আপনাদের পত্র ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় শিবচন্দ্র দেবের নামে পাঠাইবেন।

সাময়িক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ—

শ্রীশিবচন্দ্র দেব—সম্পাদক	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীদুর্গামোহন দাস	শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীআনন্দমোহন বসু	শ্রীকালীনাথ দত্ত
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮।
কলিকাতা

(১৮)

মান্যবর শ্রীযুক্ত মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজের সমূহের সম্পাদকগণ সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আমরা আপনাদিগকে প্রকাশ্য সভা করিবার সংকল্প জানাইয়াছিলাম সুতরাং আপনারা নিশ্চয় উদ্বিগ্ন আছেন। সে সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা হইয়াছে তাহা আপনাদিগকে জানান কর্ত্তব্য জ্ঞানে জানাইতেছি ইণ্ডিয়ান মিরার যাহা লিখিয়াছেন তাহা এক পক্ষের উক্তি সুতরাং অপর পক্ষের বক্তব্যও আপনাদিগকে শুনান উচিত।

২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করা স্থির করিয়া আমরা ১৫ই তারিখে কেশব বাবুর নিকট উক্ত দিবসের সভার জন্য আলবার্ট হল প্রার্থনা করি। তদুত্তরে তিনি পত্র দ্বারা হল ব্যবহারের অনুমতি দেন। তৎপরে ২২শে শুক্রবার আমাদের একজন গিয়া উক্ত হলের তত্ত্বাবধায়ক বাবু রামচন্দ্র সিংহের সহিত গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত করেন। পরদিন প্রাতে আমাদের আরও কয়েকজন গিয়া রাম বাবুকে কেশব বাবুর অনুমতি পত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক সমুদায় প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলেন। পরে ৩টার পরে আমাদের লোকেরা গিয়া চেয়ার প্রভৃতি সাজাইতে আরম্ভ করিল। বেলা অনুমান ৪॥০টার সময় রাম বাবু আমাদের মধ্যে দুইজনের সাক্ষাতে উক্ত হলের ভৃত্যকে যথাসময়ে গ্যাস জ্বালিবার আদেশ করিলেন এবং আমাদের একজনের নিকট হইতে তুলা প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য দুইটী পয়সাও চাহিয়া লওয়া হইল, গ্যাস জ্বালিবার আদেশ করার পর তিনি বোধ হয় কেশব বাবুর বাড়ীতে গমন করেন। সেখান হইতে প্রায় ৫॥০টার সময় আসিয়া বলিলেন যে গ্যাস জ্বালা হইবে না। উক্ত হলে দেয়ালগিরি প্রভৃতি বসাইবার কোন উপায় নাই সুতরাং আমরা মহা বিপদে পড়িলাম। আমাদের দুইজন ব্যস্তসমস্ত হইয়া কেশব বাবুর বাড়িতে গমন করিলেন এদিকে হল লোকের পূর্ণ ও অন্ধকারময় হইয়া আসিল ক্রমে আমাদের সভার সময় অতীত হইয়া গেল। ওদিকে কেশববাবু অনেক বিলম্ব করিয়া অবশেষে অনুমতি দিলেন। তাঁহার জনৈক প্রচারক আমাদের প্রেরিত ভদ্র লোকদিগকে কেশব বাবুর সাক্ষাতে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সে দিনের সভা বন্ধ করিতে হইল। বন্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থান করিলে দেখা গেল কতকগুলি বালক সভাতে গোলযোগ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল; তাহারা সভা বন্ধ করাতে মনোরথ সিদ্ধ হইল না দেখিয়া গোলযোগ আরম্ভ করিল। আবার আগামী বৃহস্পতিবার ২৮শে টাউন হলে সভা হইবে।

(১৯)

AN ADDRESS TO THE BRAHMA PUBLIC OF INDIA

[*Translated from Bengali*]

For some months past, there has been very great agitation in this country on the subject of the marriage between the eldest daughter of the Minister of the Brahma Mandir and the Maharaja of Kuch Behar. The opponents of Babu Keshub Chunder Sen, acting under ungenerous impulses, have published endless calumnies against his character; and there are even many amongst his friends who, not being able to comprehend the exact position of affairs, are full of anxiety and embarrassment. If, however, instead of trying to spread calumnious reports, any of the present agitators, in the name of public good and brotherly love, and in a truly dispassionate spirit, had applied to the Minister for the actual facts of the case, we believe he would have satisfied their curiosity. Nevertheless we find at length a number of such applications have been addressed to him. Certain letters have been written to the Minister himself, to the Assistant-Secretary of the Brahma Samaj of India, as well as to some of our Missionary brethren, requesting publication of the actual facts of the case. We, therefore, have thought it our duty to lay such facts before you after due inquiry as we have gathered. This we do with the sanction and under the direction of the Minister and for the benefit of the public. It is to be hoped that the perusal of this explanation will remove the doubts of many if not all, and conduce to the welfare of the Brahma Samaj. On the one hand, the delay which has occurred in submitting this statement may, it is true, have caused some uncertainty and harm, but, on the other hand, it is equally clear that when men's minds are in a state of excitement they are seldom in a position to ascertain the truth of any subject, but as gradually the irritation of their feelings subsides, they are better fitted to form a sound and sober judgment.

We are thoroughly assured that it is not the object of the Minister to justify all the circumstances that have transpired in connection with the marriage of his daughter, or completely to vindicate his own conduct in the matter. There are certain things in relation to the marriage which, if they have pained any body, have pained him much more than others. The marriage has not been entirely in accordance with his own wishes, and he has never made a secret of his dissatisfaction on this point. If

any wrong has been committed in the course of the proceedings under review, he is prepared to protest against that wrong as openly and as loudly as any other Brahma. But to assert that he has been influenced by the love of money to encourage idolatry and early marriage, or with a view to reenter the fold of Hindu Society, is an infamous accusation which we most indignantly repel.

We must in the first place declare that the Minister consented to take the initiative in this matter under the pure dictates of conscience. We are aware that he was always exceedingly indifferent to the subject of his daughter's marriage, and, important as that subject was, he felt always free from anxiety about it. Not for a single day did he attempt to find out a suitable match for his child. When by unforeseen course of events the proposal for the present marriage was presented before him. he took the circumstance as providential, and without hesitation dealt with it as such. Not being a utilitarian, he did not care to calculate the consequence of his step. Whether this alliance would lead to the political and religious welfare of the Kuch Behar State, whether a better match was or was not available among the Brahma community if due search had been made, whether such match, if available, would not be better, on the whole, than the one proposed, were thoughts which never entered into his mind at the time. Is this thing right or is it wrong?—this was the only question he put to himself. His heart said it was right, and circumstances proved that his daughter's future husband was brought before him providentially. Thus without regard of future consequences, with dependence only upon the impulses of his conscience, and with implicit faith in the will of Providence, he put his hand into the affair. He has always believed that his daily meals, and the government of his household are in the hands of Providence. He thinks that if he had not undertaken to celebrate this marriage, he would have been guilty before his conscience. And if all the men of this world had been arrayed against him in opposition, he still could not have refrained from it. Because the believes that God is greater than man, and the will of God than the will of man.

The negotiations of the late marriage were carried on and settled between the Minister on one side and Government on the other. The Maharaja of Kuch Behar is a minor, and so long as he does not come of age the Government is his lawful guardian. Therefore, in the matter of the Raja's marriage, the entire direction of affairs lay in the hands of the Government authorities. As Babu Keshub Chunder had never

so much as even dreamt that he would have to give his daughter in marriage to a Maharaja, he had never made any application, far less any effort for such an alliance. And if the Government had not been concerned and if it had not made special exertions for the marriage, the proposal of this marriage would never have been entertained. Six months ago, the Deputy-Commissioner of Kuch Behar personally come to Calcutta, and having called to see the daughter of Babu Keshub Chunder Sen, expressed himself fully satisfied with her. After a few days he wrote to him to the effect that the Commissioner, Lord Ulick Browne, had warmly approved of the match. Babu Keshub Chunder Sen was requested to say on what points he required a deviation from the ordinary usages of orthodox Hindu marriage. It was further pointed out in this letter that the proposed marriage was calculated to do a great deal of good to the country, and suggested, therefore, that both parties should, so far as possible, facilitate arrangements for its consummation. In the beginning of October, the Minister expressed his views on the proposal in a letter to the authorities, wherein he laid down thirteen conditions, the principal of which are given below :—

(1) The Raja must acknowledge in writing that he is a Brahma or Theist.

(2) The marriage must be celebrated according to the ritual of the Brahma Samaj, that is, Hindu rites divested of idolatry, though such local customs might be supplemented as were unidolatrous.

(3) The marriage ought to be celebrated when the bridegroom and the bride attain their full majority. But if it could not be deferred till then, for the present there might be a formal betrothal only, the due consummation of the marriage being put off until the return of the Maharaja from Europe.

(4) All the Theistic conditions as to marriage rites must be strictly observed; but on other points, where local usages of a simply unreasonable or absurd nature were insisted upon, these might be tolerated.

Later on, however, in the same month, a communication was unexpectedly received from the Deputy-Commissioner, stating that the Lieutenant-Governor had discountenanced the match, because of its prematureness, an the Maharaja himself had expressed his unwillingness, for which reasons the negotiations must be put a stop to. The match, therefore, was broken off, and there was no reasonable chance of the proposal being renewed. Three months later, again, another letter came

from the same authority, which said that the Lieutenant-Governor had given his consent to the marriage, but that the Maharaja must leave for Europe immediately after the celebration of the wedding. The new proposal came in this shape. The Raja must under any circumstance proceed to Europe. But as it was thought highly undesirable that he should make this distant tour while he remained unmarried, the proposed marriage could not take place later than the 6th March, though it was to be a marriage in name only. With a view that Keshub Babu might not object to this fresh arrangement, it was argued in the letter of the Deputy-Commissioner that though he (Babu K. C. Sen) might feel it exceedingly unpleasant to consent to the marriage taking place so early as the 6th of March, on account of his daughter not having completed her 14th year, he ought to consider that this marriage was in no sense to be a marriage in the usual acceptation of the word, but it was to be a betrothal only.

When the proposal was received in its present form, it was the season of the anniversary festival of the Brahma Samaj; a delay of some days, therefore, necessarily took place before any definite reply could be given. But after urgent telegrams and repeated consultations, it was decided that the marriage could take place on the 6th March if it were to be viewed by all parties as a betrothal only, and if Government undertook to guarantee that this relation was to be strictly maintained. The authorities consented to this condition, and other matters connected with the marriage proceeded towards settlement. As regards the Raja's faith it is a fact that in point of character he is a Brahma, and on enquiry it was ascertained that his faith in the religion of the Brahma Samaj had been formed a long time ago. He was prepared to give a written statement of this fact. The first condition of the marriage being thus answered, it remained to settle the rites according to which it was to take place. On this subject Babu Keshub Chunder Sen had proposed that a competent Pundit should be deputed from Kuch Behar to Calcutta, and that both parties should decide this important matter in such a way as to prevent all misunderstanding in future. Accordingly, the principal Pundit of the Maharaja was sent to Calcutta by Government and he after occasional consultations extending over a week with Pundit Gour Gobind Roy Upadhaya the *puriohit* (priest) of the bride's party, and after long controversies, in a manner settled the rites of marriage which, according to conditions previously laid down, consisted of the Brahma ritual as well as local customs devoid of idolatry. The rites were divided

under the following heads :— (1) On the day previous to marriage, *Adhibas*, (2) Brahma Divine Service at the time of marriage, (3) *Bagdan*, (4) *Stri-achar*, (5) *Svastivachana*, (6) *Barana*, (7) *Kshama-grahana*, (8) *Sammati*, consent, (9) *Sampradan*, (10) *Vara-dakshina*, (11) *Udvaha Pratijna*, (12) *Prarthana*. It was settled that these marriage rites should be printed both in the Bengali and Sanskrit languages, in elegant type on *tulat* paper, to be read at the time of marriage by the *purohits* (priests) of both parties. The printing of the ritual was entrusted to the manager of the *Indian Mirror* Press. While these arrangements were in progress, the agent of the Government started with the young Raja for Kuch Behar on the 22nd February, taking with him a copy of the said rites in manuscript, to which was attached a supplementary sheet of paper containing the following special conditions :— (1) Neither the bridegroom nor the bride was to take part in any kind of idolatrous ceremony before, during or after the marriage. (2) At the place of marriage no image of any god or goddess, no fire, no *ghats*, &c., should be kept. (3) Only those *mantras* which were to be printed in the marriage ritual could be read, and the utterance of no other *mantras* was to be allowed. (4) No part of the *mantras* could be omitted, or in any manner modified. To ensure still more fully the observance of these rites, it was proposed that the signature of the Deputy-Commissioner or his representative should be affixed to the document containing the order and description of rites.

After the settlement of these conditions, the bride's party began to make preparations to leave for Kuch Behar. There appeared to be no further fear of any difficulty, specially as Keshub Babu had this sent a telegram to the authorities informing them that in matters of religion not the least compromise of his principles could in any sense be expected. In reply to this he had been distinctly assured that he need not apprehend any further difficulty, and that Hindu rites *minus* idolatry were to be observed. Such clear assurances on the part of Government removed all fear and anxiety as to the fundamental conditions of marriage, and it was thought that if any difference of views arose on minor matters, such differences could be easily arranged at Kuch Behar. On Monday, the 25th February, the bride's party was to start by special train from Calcutta. And while they were busy making arrangements for the trip, a message by wire reached them to the effect that the marriage rites had not yet been examined, and must not be printed. On Saturday night another message came, stating that Brahma ceremonies had been introduced into the ritual and that this could not be allowed. A protest

against this message was quickly despatched on Sunday, and attention was drawn to the marriage conditions before submitted. Difficulties also arose at this time on the subject of *nautches,* and it was suggested to the authorities to postpone the special train by which the Calcutta party was to go. They replied that the train had been already engaged. times had bene appointed and no postponement was now possible. Thus Babu K. C. Sen was obliged to leave Calcutta on Monday by the 11 O'Clock train in great haste, and he reached Kuch Behar with his family and friends on the 27th instant nearly at midnight. Immediately on arrival, information reached them that no preparations for formal reception had been made, and they were expected to enter the town very quietly. Every one was mortified at this intelligence, and suspected that there must be deep reasons for it. Until Sunday no difficulties arose, and all went on happily. The subject of the ritual was repeatedly introduced for settlement, but no one seemed to pay any attention to the matter. The ceremony of *gatraharidra* or anointing with turmeric passed off on Sunday. But on Monday a number of highly respectable gentlemen representing the Maharanis, accompanied by the chief Pundit of the Kuch Behar Court, arrived at the residence of the bridal party and brought forward many new proposals. They said that Babu Keshub Chunder was not to be admitted into the *bibaha mandap* or the place of marriage, that no Brahmin priest who had renounced his sacred thread, and no other man who was not a Brahmin could officiate at the ceremony, that no Brahma Divine Service could be allowed on the occasion, that the bridegroom and bride were to make no marriage vows at all, and that both parties were to perform that *homa.* Keshub Babu and his friends were wonder-struck at this. There was now but one day remaining to the marriage, how could these new difficulties be got rid of within that short time? After long controversies the Raj Pundit went away disgusted, and though some of the points raised were set at rest by the discussion, there were other matters in which differences became serious. On Tuesday the *adhibas* was appointed to take place; the bride was to proceed to the palace in the evening with much solemnity and pomp; every arrangement had been made and every one was in expectation for it. But agitation and controversy on the subject of the ritual raged high till three o'clock in the morning. At length the dispute reached its crisis, and fears were entertained that the match might break off. On the very day of the marriage, that is Wednesday. the controversy on the subject of the *homa* was warm and animated. On one side there

was the Government; on another side there was the mother of the Maharaja; on another side again there were the Brahmin priests; and lastly there were Babu Keshub Chunder Sen and his friends. Each side did its best to maintain its own ground. Gradually however the wrangling ceased. The agitation developed itself into the formidable question whether the marriage was or was not to take place. The Maharaja was dependent on Government, which therefore could make any ruling it chose in his case, and outsiders might or might not have any right of interference in the subject : but how could the representatives of the bride lend the least countenance to idolatry? It was determined, therefore, that according to previous conditions the bridal party was to keep no connection with any idolatrous observance, and that unless this concession was made the match must be broken off. The concession was at last made at 11 O'clock in the night, and everyone felt somewhat reassured. On proceeding, however, to the scene of marriage, it was observed that within a small enclosure called the *mandapa* there were a number of plantain trees and *ghats* nine or ten in number, and besides some object measuring about half a yard in height was wrapped in a piece of red cloth. Some amongst us felt a suspicion that perhaps certain Hindu deities such as Hara, Gouri etc., were placed there for the purpose of worship. The Deputy Commissioner being immediately appealed to denied this fact, and after due enquiry amongst the Pandits, distinctly said that among the objects alluded to, there was no idol or object of worship, no Hindu deity had been placed there. From what he and the Chief Pundit said it was evident that within the *mandapa* there was no idolatry, but that according to local and' ancient usages, certain objects were arranged to lend as auspicious appearance to the whole scene. The ceremonies then commenced. After *bagdan* (pledging of word) *stri-achar* (rites performed by female relatives) and *sammati* (mutual consent) the bridegroom presented himself within the marriage *mandapa* and the Minister with the Brahmas present held divine service in the midst of the assembly. After a short time the bride was brought, and Babu Keshub Chudner and his brother, and the priest of the bridegroom and the priest of the bride, Pundit Gour Gobind Roy Upadhya, entered the marriage *mandapa* and took their seats. All current Hindu *mantras* shorn of the names of idolatrous deities and duly amended were recited, after which the bride retired to the inner apartments. Then according to Brahma practice, the marriage vows and prayers were read by the married couple, and the Minister gave the

prescribed precepts. These observances were held at a separate place in the presence of a number of Brahmas.

After perusing the statement given above, you will be able to judge whether or not those who have preferred the charge of encouraging (1) idolatry and (2) early marriage against the Minister have done so erroneously. It ought to be borne in mind that the Government and Keshub Babu, both equally opposed to early marriage, have undertaken to effect this alliance, and that the promises and arrangements of the former, made before as well as after the marriage, amply justify the reliance which the latter has always placed on their word of honour. It has been said that Keshub Babu has violated the limits of age as set down in the Marriage Law which he was chiefly instrumental in getting passed, and that he has acted contrary to his previous faith and principles. But a good deal can be said to repel this unfounded charge. In the first place, Kuch Behar is an independent State, where the said Act is not in force. Even if the marriage had bene celebrated under the Act in Calcutta, as was proposed at one time, the Maharaja, after his return to his own territories, could have been held under no obligation to respect the provisions of the Act. Under such circumstances, then, Act III of 1872 was useless, unavailing and inapplicable to the present case. It was therefore set aside. If the Maharaja had been subject to the British law there is not the least doubt but that this marriage would have taken place according to the provisions of the enactment; and the marriage had taken place under the Act, the limits of age would have been observed by both parties. It may be further urged that if Keshub Babu did not avail himself of the Marriage Act for reasons specified above, why did he not stick to the conditions of age as laid down by himself and insisted upon in his own lectures and precepts. He enforces strict rules when the marriages of other people are concerned; but in the case of his own daughter he relaxes the rules and becomes exceedingly indulgent. Why this in consistency between his previous conduct and present practice? It ought to be remembered that the Minister has on various occasions solemnized Brahma marriage in which the ages of the gilts ranged between 11 and 13 years. He certainly had objection to such marriages, but he overcame his scruples on the score that formal precautions had been adopted to prevent the evils of early marriage. In the *Udichya Karma* (ceremonies subsequent of Brahma marriages) it was clearly laid down that unless the bride arrived at the age of adolescence the ordinary relations of a wife to her husband could

not be established in her case, and marriage in such instances meant no more than betrothal. Before the commencement of youth, marriage in its actual sense could not be recognised. It was held by the Brahmas, long before the Marriage Act was passed, that the real marriage of a girl before the commencement of youth, in the sense of becoming a wife, is objectionable. When the Act was passed by the legislature, the principle of marriageable age above alluded to, current in the Brahma Samaj,.was formulated into law. It was attempted to ascertain the exact age at which the constitution of girls in this country develops into the physical peculiarities of womanhood, with a view to set down that age as the minimum marriageable age for girls. Dr. Charles gave it as his opinion that the youth of Hindu girls commences at 14. The principle was recognised in the Act. Indeed the real spirit of the law is that the commencement of adolescence is the right age of marriage for girls. In the present marriage *this* conditions has been fulfilled. Consequently Keshub Babu can not be charged with having acted contrary to his principles in the case of his daughter. Secondly, the charge of idolatry is equally unfounded. We can confidently affirm that on the side of the bride and her father there was not a tittle of idolatrous observance. We have been surprised to hear all this talk about *prayaschitta*. Far from consenting to such a ceremony, there was not even a proposal of it *at any time*. The charge is as false as it is painful. Having just investigated into the truth of the matter, all that we discover is this. A gold mohur was one day brought by the Maharaja's grand-mother, who touched with it the back of the bride's palm, laid it on the ground. The girl knew nothing more about it than this. Is this *prayaschitta*? In fact, as we have said above, there was not a particle of idolatry on the side of the bride's party. About the bridegroom it may be said that he himself has no faith in idolatry; but under the direction and orders of Government, who tried to keep infact the legality of the marriage, he had to be present at the ceremony of *homa*. If, however, his relations, his priests, or his mother can be found to have indulged in idolatrous practices, surely the Brahmas cannot be held responsible for the same. The more specially as distinct assurances about the exclusion of idolatry had been obtained on our side before any initiative was taken in the matter. The first intimation about the retention of idolatrous observances on the part of the bridegroom was received after every arrangement for the marriage had been completed, and there remained only one day for the marriage. On

Friday, the 8th February, after the Raj-Pandit had promised the exclusion of every form of idolatry from the marriage rites, and Divine Service was held in due form at Keshub Babu's house, the Maharaja was allowed to pay his first formal visit to his future wife. Two days later that is on the 10th February (*jurani*) presents were received. On the day next to that, after an imposing Brahma Service, the bond of betrothal was written and signed on both sides. In this document Keshub Babu declares distinctly that "this marriage is to be celebrated in the holy presence of the God of Truth." On the 19th instant all the most distinguished men of Calcutta Society were invited at Keshub Babu's house, and the Maharaja was introduced to them. Besides all this, the youthful couple often met with one another, in the presence of their guardians and elders, in the midst of the Brahma family, and felt in their hearts the beginning of mutual affection and love. If such attachment be the basis of all true marriage, then it must be admitted that before the bridegroom and bride had left Calcutta, the preliminary stages of Brahma matrimony had already set in, and that they had in spirit actually entered into the relationship of a Brahma family. After the progress of arrangements so far, to introduce any new proposal with a view to retain idolatry was, to say the least, quite inconsistent. But we must here observe that we do not venture to construe such unreasonable proposals into misconduct or malice on the part of Government Officials. If in trying to discharge their duty they have in any way acted in opposition to our wishes, we have no complaint to make. The worthy Deputy-Commissioner in the midst of many difficulties tried to be true to his word to the end, and when we felt that we were in real danger, he acted towards us faithfully and as a friend. For all this we have to offer him our sincere gratitude.

In conclusion, our humble request to the Brahma Public is, that they should in the spirit of kindness and calmness read our statement from beginning to end. When all this dispute and bitterness will have ended, they will find that their Minister has been at all times opposed to the sins of idolatry and early marriage, and whatever his enemies may choose to say, his life has been ever devoted to the unselfish preaching and practice of truth. Let the whole world know that in this grand alliance he did not seek a farthing's worth of pecuniary advantage, nor made a moment's effort to seek readmission into that Hindu society which has cast him out. Let all the world know that in celebrating this intermarriage with the Sankocha caste, he has more than

ever incurred the penalty and odium of excommunication. According to the will and commandment of his God he has, indeed, given his daughter in marriage to a royal house; but so far as he himself is concerned, he remains free as ever from the love of gain and the stain of worldliness.

Protap Chunder Mozoomdar,
Assistant Secretary, Brahma Samaj of India
Gour Gobind Roy,
Secretary, Brahma Missionary Conference.

(২০)

From Babu Protap Chunder Mozoomdar,
Assistant Secretary, Brahma Samaj of India,
To Babu Shib Chunder Deb.
Dated Calcutta, 14th May, 1878

Sir,—My attention has been drawn to an advertisement in the papers convening a meeting at the Town Hall to organize the Brahma Samaj on a reformed and constitutional basis.

As the subject of the proposed organization is one of the great importance to the Brahma Community and affects the position and prospects of the Brahma Samaj of India, I beg you will allow me to make the following observations for the consideration of the meeting to be held tomorrow.

It is my duty on behalf of the Brahma Samaj of India, to assert most solemnly that this church is not capable of schismatic division, and that it cannot, therefore, look upon the present disagreement in the Brahma community as a schism. Constituted as the Brahma Samaj of India is, its integrity is indivisible, its unity inviolable. Its religion is catholic Theism, which means unsectarian and absolute religion. Its constitution is such that all who have faith in only the fundamental doctrines of religion are eligible as members. So long as there is identity of faith in essential matters no division is tolerated. The Brahma Samaj of India is an all-inclusive church, which excludes none because of immaterial differences of opinion. Even the "conservative" section of the Brahma community belonging to the Calcutta Samaj is included in its wider organization. It comprises in its comprehensive membership the widest diversities of opinion and belief, extreme conservations [conservatism?]

and extreme radicalism, the Hindu monotheist and the English Theist. Should any body of its members on any plea, however, plausible, attempt to secede and form a sect, they will nevertheless be regarded by the parent Samaj, as still forming a part of the body corporate, and their differences will be toler ated without reservation and their independence fully respected. Such being the constitution of the Brahma Samaj of India, we cannot for one moment regard the present division in our church as a doctrinal schism. Nor will you, I believe, contend that it is so. That there is a serious difference of opinion among us in connection with the recent marriage I fully admit. Nor would I deny that among the more excited classes in either of the two parties it has grown into positive antagonism, almost as bitter, as violent and as inveterate as sectarianism. Yet the division is by no means of a sectarian character. Both parties uphold the essential principles of Brahmaism; there is no doctrinal dispute. Even in regard to the questions of idolatry, caste and early marriage, which have been the subject of the present controversy, there is an essential identity of conviction and faith, as both parties are equally averse to these evils. Where then is the ground for a schismatic rupture? Nowhere.

As schism, in the true sense of the word, in the sense of sectarian exclusiveness, in the sense of doctrinal disunion, is a moral impossibility in the present case.

If, then, the idea of organizing a new Brahma Sect with a distinctive and hostile creed is altogether out of place in the present controversy, and utterly incompatible with the established principles of our sacred and catholic Church, the question remains to be decided, whether in the matter of church government there is any room or necessity for a sectarian movement. It will not be denied that the Brahma Samaj of India has always been governed by constitutional means, and not by arbitrary authority. Its office-bearers are selected and are subject to re-election or removal at the end of each year. There are regular annual meetings for the election of office-bearers, the revision of rules and bye-laws, if necessary, and the consideration of all matters affecting the welfare of the community. However great the *moral* influence exercised by the present Secretary, he has no constitutional power or authority beyond what is vested in him by the community, and he cannot hold office longer than is their wish. If the majority of the members desire to appoint some other person in his place, they are quite at liberty to do so. Nor does he, as the public are well aware, seem averse to such

a course, he having already announced his intention to that effect. The affairs of the Brahma Mandir are managed by persons appointed by the Congregational Society, duly established sometime ago at the instance of the leading gentlemen of the "protest" party. In consequence of the present agitation the Minister withdrew from the Vedi, but resumed work lately at the request of the majority of the congregation. The charge of arbitrary and single-handed proceedings often preferred against the present Secretary of the Samaj has been as often practically refuted, and there is evidence enough to prove that he was never slow to make reasonable concessions in obedience to the voice of the community. In reserving seats for ladies outside the screen, in organizing the Congregational Society above alluded to with a view to control the affairs of the Mandir, and lastly in helping the establishment of the Representative Assembly for the better control of the affairs of the entire Brahma community, in making these several concessions to the leader of the protest party, who in each case got up a strong agitation with a view to protest against and curtail his authority, he was doubtless guided by a conciliatory spirit. If the gentlemen who readily obtained power whenever they demanded it failed to use it, it was their fault, not his. In fact there has never been a lack of constitutionalism in the Brahma Samaj of India, but certainly a sad want of active interest on the part of the malcontent section in the affairs of the church. Their repeated absence at meetings and indifference to existing management often lead them to suspect unconstitutional conduct which they cannot prove. In the present case the whole controversy hinges on the question of the propriety or otherwise of convening a public meeting for the purpose proposed by you in your letter dated the 8th [9th] ultimo. You will admit that we have no objection to the meeting being called, and have never raised any objection. The Secretary and the Assistant Secretary are bound to convene public meetings, whenever they are requested to do so by an important section of the community, for important public purposes. They have no option in the matter. But in every association such office-bearers are vested with some degree of discretionary power in fixing the time of such meetings. I believe we were justified in not acceding to your request to call an early meeting after the unpleasant and unwarrantable scenes which occurred in the Mandir on two occasions, and which actually necessitated the interposition of the Police. It was chiefly in consequence of the present extremely excited state of the pubic mind that we had to adjourn a

meeting already announced and delay to convene the meeting you proposed. I have already assured you, and I again repeat, the meeting you and your friends wish me to convene, shall be convened as soon as the present excitement subsides, six months hence or earlier [when] the chances of disorderly behaviour are reduced, and, the public are in a position to judge calmly and dispassionately. The whole controversy is thus narrowed to a mere question of time—an immaterial difference of opinion as to whether the proposed meeting should be held three weeks hence or six months hence. Upon so slender a plea would the protest party be justified in attempting a hostile organization? I beg they will seriously consider this question, and do all in their power to prevent a rupture which would be unpleasant to both parties. All the reforms you wish to carry out, all the remedies you seek are within your reach in the present constitution of the Brahma Samaj of India. This Samaj in its catholic capacity gives each of the numerous parties that have taken shelter in it free scope for its operations, and has never hindered any reform movement. Any reasonable proposals that may be adopted at the meeting tomorrow with a view to the amendment of the existing organization of the Samaj without breaking its integrity, or the more effective furtherance of the welfare of our community, will receive, I can assure you, full and fair sympathy and consideration at our hands. It is not meant to put any obstacles in the way of your giving effect to your proposals, so far as condemning particular individuals and actions is concerned. It is not meant to obstruct any extended schemes of devotional development and missionary operation that you may contemplate. It is not meant to check your independence, and to interfere with any honest and honourable difference of opinion that you may happen to entertain. Fully, fairly, and like men do your duty to your Church. But I beg you and your co-adjutors to merge all personal questions in public interest, and in the progress of Theism, and unite with us in preserving the unity and purity of our common and beloved home, our Church, the house of our God.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Protap Chunder Mozoomdar,
Assistant Secretary

(২১)

From Babu Shib Chunder Deb,
To Babu Protap Chunder Mozoomdar,
Assistant Secretary, Brahma Samaj of India,
Dated Konnagar, the 18th May 1878

Sir,

I beg to acknowledge the receipt of your letter, dated 14th May instant, and in reply thereto I hope you will allow me to make the following observations, and beg you will give as much publicity to these lines as you have given to your letter to me.

I am sorry I do not at all see why the Brahma Samaj is not at all "capable of schismatic division," constituted as it at present is. I must confess that when I entered the Brahma Samaj of India, I thought with you and never for one moment dreamt there would be any occasion for another organization. But as years rolled by and yet no attempt at having a constitution was made, but on the other hand every attempt to place the Samaj on a constitutional basis was shifted and set at naught, my *worst* fears were aroused, and the persistency with which you baffled all endeavours at a constitution has now landed us at this sad pass.

You say "*constituted* as the Brahma Samaj of India is, its integrity is indivisible, its unity inviolable." I wish it were so. Nothing has grieved me so much as the necessity of organizing another sister organization. I tried my best to avoid a separation. I felt most strongly that *division* meant *weakness*; and in order to avoid this division, I and my colleagues in the Brahma Samaj Committee tried out best to give the Brahma Samaj of India a *constitution*, but you would not allow it. I cannot see, excuse me for my ignorance, if so it is, how, constituted as the Samaj is, without a Council of Brahmas to guide it, without consulting the opinions of the majority of the Brahmas in the absence of representatives from the Mofussil Samajes, in the absence of a fixed code of rules and bye-laws to go by, managed as it at present is by two men only, the Brahma Samaj could possibly be "indivisible" and its unity "inviolable". The only strength of an organization is in the unity in the voice of its members; but here the voice of the members found no place, was not even *consulted*, and far less *respected*.

"Its religion," you say, "is Catholic Theism, which means unsectarian and absolute religion." I must admit, *theoretically* speaking, what you

say is correct, but *practically*, it rends my heart to say, it is not so. Catholic Theism, in my humble judgment, cannot sanction idolatry and early marriage. It cannot include that form of *Adesh* which you have appealed to, to support your conduct in the Kuch Behar marriage. In the name of Catholic Theism, questionable doctrines not assented to by a majority of Brahmas, and asceticism, seem to have been promulgated as cardinal principles of the Samaj. Pure and Catholic Theism, in my opinion, is not consistent with direct revelation of the kind of which your Minister on Sunday before last spoke. The Theistic Church cannot admit of an "anointed son." Although you *theoretically* deny that Popery and Priestcraft have taken possession of your Church, yet *in practice*, I find both these evils existing. The article in the *Sunday Mirror* sometime ago on Roman Catholicism opened my eyes to the direction in which the wind blows. In my opinion (I may be mistaken, but I honestly believe that) during the last four or five years, the ideal of pure Theism has been considerably lowered, and this is chiefly owing to the opinions of certain persons being published as the opinions of the Brahma Samaj. You yourself may not believe in the infallibility of the particular individual, but I do not think you can deny that there are persons who do so, and this I cannot but attribute to the conduct of those who lead the Brahma Samaj, by, if not actually countenancing, certainly winking at certain abject pseudo-religious conduct of their followers. I believe the Church has lost its pure catholicity and that sectarianism has entered its precincts. On the other hand, if you mean by catholicity to include un-Brahmic and idolatrous ceremonies and objectionable principles, such as that of God indirectly sanctioning an early marriage with idolatrous rites, then no doubt, the Church is still catholic; but such catholicity I most heartily and sincerely deplore. I am sorry I cannot agree with you in thinking that there are no doctrinal differences. Since your article in the *Sunday Mirror* maintaining that the Kuch Behar marriage fulfilled the *essential* principles of Brahma marriage, considerable doubt has arisen in my own mind as to whether we do not differ in the essential principles of Brahmoism.

I cannot dismiss the subject of doctrinal differences without making one observation. You say "even in regard to the questions of idolatry, caste and early marriage in connection with the recent marriage, which have been the subject of the present controversy, there is an *essential identity of conviction and faith, as both parties are equally adverse to these evils*." Excuse me if I say, I have grave doubts whether you

practically are "adverse to these evils." I never thought pressure from the authorities could make any difference. As a matter of *principle* you at first proposed that the marriage should be solemnized when the parties arrived at their proper ages. That very attempt is an index to the *principle* which regulates Brahma marriage; but then you yielded to pressure from the authorities, and having yielded, you tried to establish in the *Sunday Mirror* that you had violated no *principle*, and that as matter of *principle* the Brahma Samaj had always "preferred to marry Brahma girls at as early an age as possible," subject to certain physical changes taking place in the girl. According to the feeble light which is within me, I could not but consider this submission to pressure from authorities, as deliberately sacrificing a *principle.* Then as regards *caste,* no doubt the marriage took place between parties of different castes; but then did you not indirectly sanction caste distinctions by allowing a Brahmin priest of orthodox Hindu convictions and faith to officiate at the marriage? In the statement which you published sometime ago in the *Sunday Mirror* and *Dharma-Tattva*, you did not even suggest that you were *compelled* to yield about the priest at Kuch Behar. On the other hand, you wrote for and the priest came to Calcutta, and you consented to the priest presiding at the ceremony from the beginning. I hope you have not forgotten the cause of your seceding from the Calcutta Samaj. The most prominent cause was Babu Debendra Nath Tagore's permitting certain ministers with their holy threads on preaching from the *Vedi.* I hope you have not forgotten that those ministers, although they wore this symbol of idolatry, were Brahmas in their faith and convictions, whereas the priests who you agreed should preside at this marriage, were orthodox, idolatrous Hindus by profession as well as by practice. Did you not also indirectly sanction caste prejudices by Keshub Babu agreeing not to give away his daughter in consequence of his visit to England, and submitting to his brother's doing the same? This was done deliberately before leaving for Kuch Behar, and therefore there can be no pretext for saying that you were coerced to do this at Kuch Behar.

How can I, after all these, say, "both parties are equally adverse to these evils." How can I say there are no doctrinal differences, "no ground for a schismatic rupture." May I beg to ask you here whether at the time that you separated from the Calcutta Samaj, there were really any doctrinal difference existing? Were there any doctrinal differences which separated the Free Church party from the general Assembly? As in the one, so in the other, there were differences about the government

of the Church, and this brings me to the other part of your letter, *viz.*, the constitution of the Brahma Samaj of India.

You say, "it will not be denied that the Brahma Samaj of India has always been governed by constitutional means, and not by arbitrary authority." I have always had the highest regard for your character and the sincerity of your opinions, but I regret here I cannot agree with you. No I regret here I cannot agree with you. No doubt you honestly believe so, but allow me to say, I honestly believe the contrary. You will readily admit I have seen more of the world than you have, being senior in age (although junior in ability). I entered the Brahma Samaj when you were a child, or perhaps not born. My ideas of a constitutional Church Government are somewhat different from yours. The government of a Church consisting of members scattered throughout the country cannot safely vest in one or two persons, and these two persons, in my opinion, cannot act without the assent of all the members. There ought to be a representative Council in which all the provincial Samajes should be represented, and nothing ought to be done without consulting their voice. No rules or bye-laws ought to be passed to which all Brahmas, members of the Samaj, do not agree. No doctrine ought to be promulgated as a doctrine of the Samaj which is not consented to by a majority of Brahmas. Nothing should pass as an act or deed, or opinion of the Samaj until a majority of the members sanction it. I am an old man, and my ideas may be crude, but this is my idea of a constitution. Can you lay your hand on your heart and say you have such a constitution in the Brahma Samaj of India? Let me point out one or two instances which I think smack more of "arbitrary authority" than of constitutionalism. When Babu Keshub Chunder voted an address to Lord Lawrence on behalf of the Brahma community, did he consult all Brahmas? If not, should he not have done so? Can the Secretary of a constitutional body do so without consulting all the members if there be no committee of management, or if there be such a committee, without consulting such committee? Another instance of "arbitrary authority" is your letter to me of Bysach 29th, 1800 Shak. You say "the two chief accusations brought by you against the Secretary have been answered by me in a formal statement on *behalf of the Brahma Samaj of India*." ...And further on, "and therefore when this matter has been once disposed of *in the name of the Samaj*, I feel I am unable to enter into them again." Are you the Brahma Samaj of India? Are you the representative, duly appointed, of all the members of the Brahma Samaj of India? Did you

consult all the members of the Brahma Samaj of India when you published that "*formal statement*"? What were the accusations and who were the accused? The Secretary was the accused and the Assistant Secretary his judge! The letter to which your's was a reply, asked the Secretary to call a meeting of his co-religionist to try him, but you as the Assistant Secretary, sat on judgment upon him, and you ask the public to accept your judgment as the judgment of all those who form the Brahma Samaj of India, without even asking for the opinions of those members. You had been to England and have travelled over the continent, I ask you, therefore, whether you acted constitutionally in this matter. May I beg to ask you to point out to me the rule or bye-law (for you say there are rules and bye-laws of the Samaj) by which the Secretary had the discretion of not calling a meeting when requested by certain members, although certain other members may not wish such a meeting to be called? May I beg to know at what "regular annual meeting" such a rule or bye-law was passed? My experiences of corporate bodies tell me, when office-bearers are re-elected there is always a proceeding recorded, as well of the fact of such a re-election as of those who were present at such a meeting. Will you be good enough to show me the proceedings of any one of such meetings? Where is then the *constitution* of which you speak? About 12 or 13 years have elapsed since the foundation of the Brahma Mandir. Have you taken any steps to appoint Trustees for the buildings? Was not the building built out of public funds, the lands purchased out of such funds? Then, why was the title deed created, as I hear but am not yet certain, in the name of Babu K. C. Sen alone? Why have you not since transferred the title to a body of Trustees? Am I to understand that you could not make time during these 12 or 13 years to accomplish this and do your duty to your Church and to those who subscribed to the building fund? Yet you say you have a constitution sufficient for all practical purposes.

You say the Secretary "has no constitutional power or authority beyond what is vested in him by the community." Have the community ever vested in him any power or authority whatsoever? If so, when and how? I for one, though connected with your Church from the beginning, do not know of any power being *constitutionally* vested in him. You also say "the Secretary does not seem adverse to being removed, and that he had already announced his intention to that effect." Here I am puzzled a little. If the Secretary intended to resign, why did he not do so? Nothing would have been easier than to send in his resignation.

(২২)

Presidential Address dated 24th January 1881

Ladies and Gentlemen! The annual report just now read fills me with endless gratitude to the Heavenly Father. When I look around me congenial minds—when I see their faces beaming with spiritual joy, I feel I have not lived in vain. When I remember the days when as a young man I knelt beside the great founder of the Brahma Samaj when there was no regular organised church, nay not even a single house of prayer dedicated to the one true God in the whole country, and when I look upon this beautiful Hall and these happy faces of fellow worshippers around me, my feelings are some thing that I cannot sufficiently express. The progress of the last half century is before me, and my thankfulness to Heaven knows no bounds. Though weak in body, and laden with years, the thought of the holy cause we have at heart, the thought of diffusing a knowledge of the God of infinite perfection, and the fact of there being so many earnest coadjutors, impart to me an internal strength which I cannot describe. It is not for me to enter into a lengthy notice of the various important matters embraced in the Report. They speak for themselves. When we first thought of establishing the Sadharan Brahma Samaj for the people at large, many no doubt imagined that it was a visionary project. But the secret of spiritual philosophy is to think of God and not of the difficulties. While we were in a state of anxiety, thanks be to God, a man who is aiming to lead the life of an angel, comes forward with a large sum of money for the building of the Samaj, which startled every one. The individual I allude to is Maharshi Debendra Nath Tagore, to whom Bengal—nay India, is indebted for the promotion of spiritual culture, and the multiplication of the Samajes established in different parts of the country, which has created a revolution by checking atheism and creedil religion, and extending the love of the infinite God of our souls.

Our grateful thanks are also due to the other donors whatever their donations may be. Every pice given from a pious heart is most gratefully acknowledged. I think it right to allude to this point, because we have liabilities to meet in respect to the building which will amount to a pretty large sum. If every member tries to raise, in his circle what he could raise, it will be a material help to us.

It is not the local habitation that we only rejoice at. The work done during the past year is a convincing proof of the vitality of the Samaj. History shows that the aid of the females is the most powerful aid. The females are the pioneers of our improvement, social, moral and spiritual. To me it is a source of sincere congratulation that we have a number of lady members who take deep interest in the progress of the Samaj. May their number continue to increase and May God bless them in making this Samaj instrumental in the attainment of the object for which it is established.

Permit me to draw your attention to the labours of the different Committees and Sub-Committees, and of the missionaries in view to the promotion of spiritual culture. All honour be due to the ministers and fellow labourers. In the work of God they have the help from Him. While I admire and feel grateful to my colleagues I regret that I have not the physical strength to work with them as I wish to do.

As the objects of the Samaj may not be clearly understood, I feel called upon to submit to you that this Society ignores hero-worship. We believe God in every soul and it is by devoutness and purity of the life and by the guidance of the Divine light within, that we gain true knowledge of God, and not by blindly following and worshipping a man as an inspired teacher. Let us look upon each other as brothers and sisters, equal in the sight of God. Let us never forget that we are not under the leadership of any mortal. It is possible that we may not be equally advanced. Let us consider what our deficiencies are, and do our best to make up the deficiencies by the acquisition of the light from within. I cannot conclude better than quote the emphatic words of Theodore Parker, "Religion is the service of God by the normal use, development and enjoyment of every limb of the body, every faculty of the spirit and every power we are born to or have acquired."

I entreat your indulgence for the imperfect manner in which I have performed my duties as your President. In retiring from the office permit me to offer you my most sincere congratulations on your continued success, and it is my most earnest prayer that you, ladies and gentlemen, may continue in spiritual facility, and soon advance the holy cause of this Samaj.

(২৩)

Presidential Address dated 26th January 1882

Dear Sisters and Brethren! I thank God for permitting me to enjoy this day the pleasure of greeting you again. You are aware that last year owing to age, physical infirmity, and deficiency in practically carrying on the Divine work of progress, I was unwilling to be re-elected your President. I was however obliged to yield to your request, and I owe a duty to God in publicly acknowledging that the more I made this Samaj the subject of my thought, the more strength I received from above, and in the rise, progress and working of the Samaj I have unmistakable proofs of Providence speaking through our souls—"go on, you shall succeed in spreading Divine truths." This Samaj owes its origin to a difference of opinion which at one time was thought of seriously, but "all evil is undeveloped good." We may continue to differ and disagree, but all seekers of God have our best wishes and sympathy. I have said that the hand of Providence is visible in the working of our Samaj. The providence of God is ensured by your earnestness in His work, and devotion to Him in spirit.

Before I recapitulate the work done by the Sahdaran Brahma Samaj during the past year I deem it my duty to impress on you that Brahmoism has progressed considerably in different parts of India as is evidenced by the existence of 155 Samajes, connected with which there are about 100 social, educational, religious and charitable institutions under Brahma management. There are also 30 periodical Journals in Bengali, English, Urdu, Mahratti and Guzrati languages, conducted by Brahmos. Of the above 155 Samajes, 15 were newly established in Bengal, Behar, Assam and Madras during the past year, mostly through the influence of our Samaj. Little did Ram Mohun Ray, dream when he established the Samaj in this city, that Brahmoism in 52 years would spread so far and wide!

From a list just published by our Samaj, it will appear that there are about six hundred *Anushthanik* Brahmos and Brahmikas, who have left off all connection with Idolatry, and perform all domestic ceremonies according to Brahmic rites. During the past year 14 Marriages were solemnized, of which four were widow marriages and two intermarriages. All the marriages were contracted by mutual consent of the bride and bridegroom at their proper marriageable age, and excepting one, all were

registered under Act III of 1872. This clearly shows how much social progress has been brought about by the spread of religious culture.

Now regarding the work performed by the Sadharan Brahma Samaj during the past year, permit me to refer you to the Report of the Secretary, to be read to you now, for full information, I will however solicit your attention to some of the principal points.

1. *The Missionary Operations*—This is an extensive field, in which the labourers were few. Still with the aid of four earnest Missionaries, the Samaj has been able to propagate the truths of Brahmoism in the provinces of Bengal, Behar, Assam, Chota-Nagpur, North-Western Provinces, Punjab and Madras.

2. *The Prayer Hall*—This Hall was completed and consecrated in the commencement of the last year. In it upwards of 500 persons meet weekly for Divine worship. No regular Minister has yet been appointed, and the subject, together with certain rules framed by the Executive Committee, is therefore submitted for the consideration of this Meeting. The service has hitherto been conducted by some of the ordained Missionaries and by Babu Umes Chandra Datta. From the last quarterly report of the Executive Committee it appears that there is a debt of about Rs. 7000 on account of the Building. Besides, a sum of about Rs. 3000, is required for the frontal veranda, railing, etcetera. I beg most earnestly to appeal to this meeting and all friends of the Samaj to come forward and help us in wiping off the debt and meeting the additional expense.

3. The Theistic Library established by the Samaj has received considerable addition, and is proving useful to Brahma readers.

4. The establishment of the *Hita Sadhini Sabha*. a Theistic Philanthropic Society in connection with our Samaj, is engaged in providing education for the working classes, and raising funds for helping poor and indigent pupils. The *Sabha* has also opened a Night School for working men.

5. Another element of our progress is the co-operation of the fair sex. The Brahmika Samaj and the Bengal Ladies' Association in connection with our Samaj, are doing good service for the spiritual, moral and social elevation of our country-women.

You must have heard with sincere pleasure at the last Anniversary meeting of the Ladies' Association, held on the 21st instant, the excellent Report read by the Secretary Miss Kadambini Bose, and the judicious remarks made by the President of the Association Mrs. A. M. Bose.

I cannot conclude this address without expressing my grateful acknowledgments to the Missionaries and the General and Executive Committees, for the valuable services they have rendered to the Samaj. Our deepest gratitude is due to Miss Collet for the most lively interest she continues to take in the success of the Samaj. Our thanks are also due to the muffasil samajes for their sympathy and co-operation with out movement.

The more I think on this Samaj, the more I feel impressed that if we make our lives purer and intensify our devotion to God, we shall have aid from Him, and our work will be "a work of true delight."

(২৪)

Presidential Address dated 25th January 1883

After another year I have again the pleasure of greeting you on this happy occasion, and I thank God for granting me the privilege. Being advanced in age and humble in ability, I feel proud that I have been associated with you in this good work, the credit of which entirely belongs to you.

The report of the Secretary just read is so elaborate and so fraught with interesting matters that we can only take from it the salient points.

The chief work of the Samaj, as you all know, is the diffusion of the spiritual worship of God, and of all the principles leading to that object : For this purpose the missionaries and a few zealous members of the Samaj visited during the past year upwards of 50 towns scattered over the Provinces of Bengal, Behar, Chota-Nagpur and the Punjab; and I cannot sufficiently admire their energy and zeal for their devotion to our cause.

Besides the above, a great deal of spiritual, moral and social culture was effected at Calcutta by means of the following institutions in connection with the Samaj :—

The Students' Weekly Service.
The Students' Prayer Meeting.
The Sangat Sabha.
The Bráhmiká Samáj.
The Bengal Ladie's Association.
The Theological Institution.
The Sunday School.
The Sunday gathering of children in the Prayer Hall.

Among these, the Bráhmiká Samáj and the Bengal Ladies' Association I look upon as the most powerful means of furthering the elevation of the female mind, and without the aid of our sisters Brahmoism can never fructify itself in this long-benighted land.

A good number of books and tracts were issued, during the year, on religious and moral subjects. The fortnightly Bengali Journal, called *Tattwa Kaumudi*, which is the organ of the Samaj, has been the means of disseminating religious, social and moral truths.

As the Samaj is progressing, and the activity and zeal of its members continue unabated, I trust that the balance of Rs. 4292, which the Samaj owes on account of the Prayer Hall Building, will no longer be kept unpaid.

For all that has been done by our brethren and sisters to extend the Kingdom of God, the glory of which belongs to Him only, I, holding the office of President unworthily, cannot but feel really grateful : and may God Almighty bless you for your good acts which will fructify and show in time that you have not worked in vain. Once more, brethren and sisters! persevere,—faint not and you will continue to be of Heavenly joy.

(২৫)

Presidential Address dated 25th January 1884

Dear Brethren and Sisters,

It is to be extremely regretted that our joyful festival should have been overcast with a gloom of sorrow by the untimely death of Babu Keshab Chandra Sen. Although latterly we differed much from his acts and opinions, yet I do not hesitate to say that the Brahma Samaj owes a deep debt of gratitude to him for the great progress it made in all its departments through his powerful influence. Let us console ourselves with the thought that the part which he had to play in this world was finished, and that the merciful Father has in his wise Providence considered it proper to remove him to a higher and better sphere. May his soul rest in peace.

Now you are all aware that according to a rule of the Sadharan Brahma Samaj, it is my duty as its President to deliver an address at this annual meeting relating to the work done during the past year. But the full and elaborate report of the Secretary just read leaves me very

little to say on the subject I will merely make such remarks, as may be necessary on the principal points treated in that report.

The four energetic Missionaries and a few zealous members of the Samaj, whose names are given in the report, visited during the year a vast number of places scattered over Bengal, Behar, Chota-Nagpur, Assam, N. W. Provinces, Punjab and Sindh, preaching the truths of Brahmoism, and delivering lectures on social, moral and religious subjects. All these workers in the cause of Brahmoism are entitled to the best thanks of the Samaj.

The demand of Mofussil Samajes for the services of the Missionaries was so great that in many cases the Samaj regretted its inability to comply with their requests owing to the small number of hands at its disposal.

It is a matter for congratulation that two earnest members of the Samaj have pledged themselves to devote their lives to the propagation of the truths of Brahmoism, and one of them has made over to the Samaj, his whole properties. For these acts of devotion they deserve high commendation. Some young men in the Mofussil have also determined to labor in the cause of the Brahma Samaj. This is no doubt very hopeful.

The several institutions noted in the margin, in connection with the Samaj for intellectual, social, moral and religious culture have been maintained in working order. Endeavours are being made for organising a Fund for helping poor boys on a satisfactory basis.

The Theological Institution.
The Sangat Sabha.
The Students' weekly Prayer Meeting.
The Brahmika Samaj and the Banga Mahila Samaj &c.

We are thankful to the Government of India for having, with reference to our Memorial, issued instructions to the local Governments for allowing leave to Brahmas on the 11th Magh and, if convenient, a day preceding and a day following it.

On the application of the Sadharan Brahma Samaj, some additional marriage Registrars have been appointed by the Bengal Government for Calcutta and the 24-Parganas. This measure will remove much inconvenience felt in the registration of marriages under the Act.

A memorial is also going to be submitted to the India Government for certain modifications in the Marriage Act, III of 1872.

A new weekly religious Journal under the designation of "The Indian Messenger" has lately been started, which promises to be very beneficial to the Brahma community. This paper as well as the fortnightly Journal, the Tattva Kaumudi, are so well conducted as likely to become self-supporting undertaking.

Some improvement has been made in the Prayer Hall by erecting a Musical Gallery on the west side of the pulpit. This will produce great effect on the audience by making the singing of hymns more audible to the whole congregation.

A great portion of the tank on the west of the Prayer Hall has been filled up, thereby extending the land of the Mandir Compound.

A house for the Missionaries has been built and consecrated on this occasion.

A portion of the debt on account of the Prayer Hall building was liquidated during the last year, but still there remains a balance of about Rs. 3000 unpaid, which I trust will soon be cleared off by the help expected from the Brahma public.

From the above particulars, you will, I hope, admit that the work done by the Sadharan Brahma Samaj during the past year is satisfactory. As a mark of general appreciation of the merits of this Samaj, I may mention that on a circular being issued to the Mofussil Samajes to know their feeling on the subject, the greater portion of those Samajes have expressed their sympathy with this Samaj. I may also add that through the kindness of Mr. Tyssen we have obtained a list of 45 Ministers of Unitarian and Theistic Churches in England who are in sympathy with our Samaj.

I regret to observe that much delay has taken place this year in the issue of the Brahma Pocket almanack, owing to difficulties experienced in getting the work through the Press. On a reference to this publication it will be perceived that the progress of the Brahma Dharma in India during the past year was equally satisfactory. Fourteen new Samajes were established viz., 8 in Bengal, 1 in Behar, 1 in Orissa, 1 in N. W. Provinces, 1 in the Punjab, 1 in Central India and 1 in British Burma. The total number of Samajes shown in the list given in the Almanack is 180 against 168 of the preceding year. In illustration of the practical effect of Brahmaism on social life, I may mention that no less than 14 marriages and numerous other household ceremonies were performed during the year under review according to the reformed forms prescribed by the Brahma Samaj.

In conclusion, I beg to tender our grateful thanks to all the donors, supporters and sympathisers of our church and specially to Miss S. D. Collet for her unremitting labours in the interests of the Brahma Samaj, and to Mr. Tyssen for his kind offices in behalf of our Samaj. My thanks are due to the members of the Executive Committee for the regular attention to their duties and the indulgence with which they have viewed my shortcomings.

I pray to God that His good will as manifested in the human reason and conscience may be the guiding principle of the followers of Brahma Dharma.

(২৬)

Presidential Address dated 21st January 1887

Dear Brethren and Sisters! On this great and happy occasion, when I have the honour of meeting the members of the Samaj from different parts of the country, my first duty is to thank Almighty God for permitting me to appear before you, for, every month, nay almost every day, the infirmities of age are increasing upon me, and I doubted when I accepted office last year, whether my health would permit me to stand before you at this meeting. But the Divine Father has graciously allowed me another year of this mortal life, and has granted me health and strength enough to serve my church. After having served as President of the Sadharan Brahma Samaj for full five years, I had retired from the office the year before last without the least expectation of being again called upon to take charge of that important post, but I had to give way to the earnest entreaties of my Brahma friends, who obliged me to reaccept the office. I had some misgivings at the time, as to my ability to discharge the important duties of the office, to the satisfaction of my own conscience and also of those who conferred on me that honour. I trust, however, that looking to my advanced age and the consequent loss of energy, my friends will kindly overlook my shortcomings and release me from the duties of the President, for which I am no longer competent.

The next duty I have to perform is to allude to some sad events that occurred during the past year. First I have to allude, with heartfelt sorrow, to the untimely death of a number of zealous members of the Samaj during the year. Some of them have been cut off in the very

prime of the life. But ours is not to complain but to submit to the dispensations of Providence.

Another matter for regret is the severance of the connection of Pandit Bijay Krishna Goswami as a missionary of the Samaj. Difference of opinion on some matters of doctrine and practice have led him to resign his post. Whilst yielding to none in personal regard for the revered Pandit, I do yet feel that the course adopted by the Executive Committed in accepting his resignation was the right one. It is a matter of deep satisfaction to me, however, that after this formal separation, there has been no disturbance of the old relationship of love and friendship between him and the members of the Samaj.

For sometime past I have noticed with deep regret a certain want of harmony and concord amongst the members of the Samaj. There has been much conflict of opinion amongst the members, which has seriously interfered with their co-operating with each other in carrying on the work of the Samaj. Honest difference of opinion is a healthy sign and is a natural outcome of the constitutional mode of government which we have adopted for our church. But I must confess with regret, that in some cases, these differences have been carried to an extreme, to the detriment of the general work of the Samaj. But latterly there has been a general disposition in the minds of the members for settling their points of difference by holding conferences and friendly meetings. This is as it should be. I hope this disposition will be further strengthened in the year to come. Unity of spirit in the midst of differences of opinion, should be our guiding principle.

As a happy result of some of these conferences held in Calcutta, two important societies have been inaugurated,—the first the ব্রাহ্মবন্ধু সভা, the second the Theological Society. The first is intended to furnish a common ground to all the members, both men and women to discuss all religious and social questions of importance in which they are concerned. And it is the aim of the second to promote the scientific investigation of religious truth. Both these institutions, as far as I am able to judge from the short reports of their preliminary meetings, are calculated to confer much substantial benefit on the community, and I doubt not they will find support from all quarters. I take this opportunity to accord my cordial sympathy to these two projects, and hope that their promoters will work with redoubled energy in the year to come.

From the Secretary's report just read, you will perceive that the several institutions in connection with our Samaj have been maintained

in working order. Besides, the periodicals of the Samaj were conducted satisfactorily, and endeavours were made for a Permanent Mission Fund. Our missionaries and a few zealous members of our Samaj have done well in visiting the various parts of the country, and propagating the truths of Brahma Dharma, besides discharging important duties at Calcutta. They are all entitled to our best thanks for their disinterested services.

In addition to the regular work of the Samaj, a public meeting of all sections of the Calcutta community was convened on the 27th September last with the view of raising some permanent memorial in honour of Raja Ram Mohun Roy. This matter is still under consideration.

The Students' Service showed great activity in having lectures delivered on religious, social and political subjects and in entertaining the delegates of the National Congress.

A proposition was brought before the Executive Committee for definiting the principles of Brahmoism, and adopting certain rules for the guidance of missionaries; and opinions of some of the Muffasil Samajes on the subject were received. But after a great deal of discussion at a special meeting of the Alochana Sabha, the matter was dropped on the ground that some of the principles and rules were already included in the published rules of the Samaj, and further instructions were communicated to the missionaries at the time of their ordination. This question, however, has been left open for consideration at the Maghotsab Conference.

A Sub-Committee was appointed to inquire and report on the practicability of establishing an asylum for widows and orphans : but its labours have not yet been successful. I would earnestly commend this important subject to the favourable consideration of the Brahma Public.

There are still some debts of the Samaj on account of the Prayer Hall Building, the Missionary Home and the Indian Messenger. To relieve the Samaj from these liabilities requires sympathy and aid from all the members of our Church and it is earnestly hoped they will respond to our call for assistance.

In conclusion I have to accord my fraternal greetings to all far and near on this happy occasion, and let us all combine in praying to the Most High to grant our Samaj a prosperous and useful existence in the future.